আমেরিকার ডায়েরী

দেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ :
অগ্রহায়ণ ১৩৭০
নভেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশক :
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
নিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
কানাই পাল
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস

সাড়ে সাত টাকা

ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, রাশিয়া এবং জাপান কিরূপে এত অল্প সময়ে এত অদ্ভুত উন্নতি করিল তাহা পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ঐ সব দেশ হইতে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতাম। কোন কোন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘ আলাপ করিতাম। এখনও ইহা করিয়া থাকি এবং এরূপ সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়ি না। এরূপ আলোচনাতে বুঝিতে পারিয়াছি পুঁথিগত জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ।

এই কারণে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য যখন ডাঃ নরমান পামারের চিঠি পাইলাম তখন আনন্দ হইল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা কেমন করিয়া এত উন্নতি করিতে পারিল তাহার মুল কারণ অনুসন্ধান সে দেশে না গেলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না, ইহা জানি। সেই জন্য আমেরিকা অবস্থান কালে প্রতিটি মুহূর্ত্ত সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়াছি। বহু আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের মায়া এই কারণেই ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি।

আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী এবং জাপানের উন্নতির মুল সূত্র কি তাহা আমেরিকা পরিদর্শনের ফলে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। একই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। সকলেরই লক্ষ্য দারিদ্র্য হইতে মুক্তি, শোষণের অবসান। কেহ বলে ক্যাপিটালিজম, কেহ বলে সোসালিজম কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। আমেরিকায় দেখিয়াছি রাষ্ট্রশক্তির উর্দ্ধে সমাজ শক্তি প্রতিষ্ঠার যে শাশ্বত নীতি প্রাচীন ভারত অনুসরণ করিয়াছে সেই পথেই উহারা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থাবলীর ইংরেজি অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রচার ব্যর্থ হয় নাই। প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করিয়াছি সে দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের সত্য জ্ঞান আহরণে এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার বাহিরে সেই জ্ঞান

বিতরণে অসামান্য আগ্রহ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্যের উপর স্থাপিত করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এই নীতি তাহারা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, এবং জাপান সম্বন্ধে যতটুকু পড়িয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি উহারাও শিক্ষাকে সকল প্রকার শৃঙ্খলমুক্ত রাখিয়াছে এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে শোষণ দূর করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনিতে পারিয়াছে। রাশিয়াও এই একই উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইতেছে কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাহার অনেকটা তফাৎ আছে। আত্মরক্ষার তাগিদে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অস্ত্রসজ্জায় এত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে যে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পে সে বেশী মন দিতে পারে নাই। এখন সে দিকে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষার উপর আদর্শগত সঙ্কোচ কিছুটা থাকিতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে কোন কৃপণতা সে করে নাই। শোষণ মুক্তির যে নূতন পথ রাশিয়া অবলম্বন করিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে তার নিজেরই এখন সন্দেহ জাগিয়াছে।

আমেরিকার উন্নতির ধারা হইতে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করিতে পারি তার কথাই এই বইয়ে লিখিয়াছি। যদি কখনও ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, রাশিয়া এবং জাপান ভ্রমণের সুযোগ পাই তবে তাহাদের কথাও ঠিক এই ভাবেই লিখিব।

খুব শুনিয়াছিলাম এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল নাকি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এরোপ্লেন সার্ভিস। দক্ষতা এবং ব্যবহার উভয় বিষয়েই নাকি তাহাদের তুলনা নাই। প্রথম অভিজ্ঞতা হইল একেবারে বিপরীত। সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে দমদম হইতে এয়ার ইণ্ডিয়া জেট বোয়িং ছাড়িবে, ৬-৩৫ মিনিটে দমদমে উপস্থিত হইতে হইবে। প্লেন আসিবে ব্যাঙ্কক হইতে। সন্ধ্যা ৬-১০ মিনিটে বাড়ী হইতে টেলিফোন করা হইল—প্লেন ঠিক সময়ে আসিতেছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—একেবারে রাইট টাইমে আসিতেছে। দেরী না করিয়া রওনা হইয়া গেলাম। দশ মিনিটে দমদম পৌঁছিলাম। পৌঁছিবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সংবাদ মিলিল—প্লেন দুই ঘণ্টা লেট। ব্যাঙ্কক হইতে প্লেন দুই ঘণ্টা দেরীতে ছাড়িয়াছে এবং এই খবরটা তাহাদের অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক আগে পাওয়া উচিত ছিল।

রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ডাক পড়িল। গেলাম। মাংস দেখিয়া চক্ষু স্থির। মুরগী, পাঁঠা, ভেড়ার মাংস চিনি এবং খাই। গরুর মাংস চিনি, কিন্তু খাই না। বয়ের চোখে তাকাইলাম। চুপ করিয়া রহিল। দৃষ্টি একটু কড়া করিতে প্লেট তুলিয়া নিয়া গেল। আর যা আনে সবই মিষ্টি, আমার অখাদ্য। না খাইয়া যাত্রা সুরু করিতে হইল। এরোড্রোমে কিছু বলিতে পারিলাম না। সঙ্গে মেয়েরা আছে। না খাইয়া যাইতেছি জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।

রাত বারোটায় বোম্বাই। সেখানে জানা গেল ইঞ্জিন গোলযোগের জন্য দেরী হইয়াছে। ঐ প্লেন বোম্বাইয়ে বাতিল হইল। আবার নূতন প্লেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার যাত্রা আরম্ভের কথা। প্লেন ছাড়িল আড়াই ঘণ্টা বাদে।

বোম্বাই হইতে বেইরুট পাঁচ ঘণ্টা। প্লেন চলিয়াছে সূর্য্যের পিছু পিছু সুতরাং রাত আর ফুরোয় না। না খাওয়ার তাৎপর্য্য আরও ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। বেইরুট পৌঁছিল তাদের রাত চারটা, আমাদের সকাল সাড়ে

সাতটা। প্লেনের সামনে গাড়ী দাঁড়ানো। আমাদের উঠিতে বলিল। শুনিলাম রেস্তোর াঁয় যাইবে, চা খাওয়াইবে। ভাবিতে লাগিলাম—সঙ্গে যেন টা থাকে।

রেস্তোর াঁর গেটে বসিয়া আছে এক বিশালদেহ আরব। সকলকে একটি করিয়া কার্ড দিয়াছে। তার উপর ধপাস করিয়া ছাপ মারিয়া দিতেছে।

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চাকচিক্যের অন্ত নাই। চা আসিল, টা আর নাই। ভোর রাত্রি। বেশ একটু শীত করিতেছে। আর এক কাপ চা মিলিলেও ভাল হইত। তাও জুটিল না। আবার গাড়ীতে ওঠার তাড়া। গাড়ী হইতে প্লেন। তার পর শূন্য মার্গে ভোঁ।

আরও সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটিল। স্থানীয় সকাল সাড়ে সাতটা হইলে ব্রেক ফাষ্ট আসিল। আমাদের তখন বেলা এগারোটার বেশী। আগের দিন দুপুরের আহারের পর এই প্রথম খাদ্য জুটিল। এয়ার হোষ্টেস একজন, উত্তর প্রদেশিনী বলিয়া মনে হইল। ১০৮ জন যাত্রী, সকলের জন্য এই একজন। বেইরুট ছাড়িবার ঘণ্টা দেড়েক বাদে একবার মনে হইল চা কফি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিলাম, বাছিয়া বাছিয়া আগে মেম সাহেবদের দিতেছে। আমাদের পার হইয়া গেল। মনে হইল—ভালই, আগে মেয়েদের দিক। তারপর সুরু হইল সাহেবদের সেবা। তখনও ভাবিলাম—ভাল, বিদেশীদের আগে যত্ন করুক। তাদের পালা শেষ হইল, সুন্দরীর কাজও মনে হইল শেষ হইয়াছে। তখন আমি, আমার দেখাদেখি আর দুই-একজন ভারতীয় একটু কঠোর স্বরেই চা চাহিলাম। জবাব মিলিল—চা নাই, কফি আছে। বলিলাম—তাই দাও।

বেইরুট হইতে রওনা হইতে না হইতে এয়ার ইণ্ডিয়ার কেরামতির আর এক পরিচয় মিলিল। প্লেনে ওঠার আগে প্রত্যেককে সিট নম্বর সহ একটি কার্ড দেয়। তদনুসারে বসিতে হয়। কলিকাতা হইতে একটি তরুণী লণ্ডন যাইতেছিলেন। এত দূর পথ এই প্রথম তার যাওয়া এবং সঙ্গে কেহ নাই। বেইরুটে চা খাইয়া প্লেনে ফিরিয়া দেখা গেল তার আসনে এক শ্বেতাঙ্গ বসিয়াছে। এক ছটফটদার কর্ম্মকর্ত্তাকে ডাকিয়া দেখাইলাম। তিনি দুজনের কার্ড দেখিয়া টুপি চুলকাইয়া তরুণীটিকে অন্য এক আসনে বসিতে দিলেন। সাহেবকে উঠিতে বলিতে সাহসে কুলাইল না। বুঝা গেল, ইহাদের খাতির নারীজাতির প্রতি নহে, শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতি গোলামী মনোভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তরুণীটি ভাল সিট হারাইয়া খারাপ সিটে বসিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে সেই ছটফটদার

আর এক শ্বেতাঙ্গকে সঙ্গে আনিয়া তরুণীটিকে এক ধমক—আপনি এখানে কেন বসিয়াছেন ?

কাছেই ছিলাম। তাড়া করিলাম—ব্যাপারখানা কি ? এর সিট দমদম হইতে লণ্ডন রিজার্ভ করা সত্ত্বেও একে তুলিয়া অন্য লোক বসাইয়াছ, এই সিটে তুমিই একে বসিতে বলিয়াছ।

কুইনাইন গেলা মুখ করিয়া লোকটা তখন সাহেবকে নিয়া অন্য জায়গায় বসাইল।

এই তো এয়ার ইণ্ডিয়ার সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেশে সমদৃষ্টি এবং দক্ষতার প্রথম নমুনা। দ্বিতীয় নমুনা আরও চমৎকার।

ফ্রাঙ্কফুর্টে আধ ঘণ্টা থামিয়া প্লেন ছুটিল প্যারিস। প্যারিসের উপরে আসিলে ঘোষণা হইল – অত্যধিক কুয়াশার জন্য প্লেন নামিবে না, সোজা লণ্ডন যাইবে। লণ্ডনে প্লেন নামিল তাদের বেলা দশটার কিছু পরে। আমাদের প্রায় বিকাল সাড়ে তিনটা।

১লা অক্টোবর হইতে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক যাইবে না। বি. ও. এ. সি. প্লেনে তাদের যাত্রী তুলিয়া দিবে। একথা কলিকাতায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের প্লেনে আমার টিকিট বুক করা আছে। লণ্ডন এয়ার পোর্টে নামিলে এয়ার ইণ্ডিয়ার মেমসাহেব বলিলেন—আমাকে ৪টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, চারটের প্লেনে আমার সিট হইয়াছে। এদিকে সুটকেস গিয়াছে কাষ্টমসে। কাষ্টমস বলিতেছে—সুটকেস খোল। বলিলাম—আমার সুটকেস নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত বুক করা আছে, এখানে খুলিলে আবার বুক করিতে অসুবিধা হইবে। টমি নন্দন কাষ্টমস অফিসার বলিল—এখানেই সুটকেস খুলিতে হইবে, শুল্কযোগ্য মাল আছে কি না দেখিব। বলিলাম—এয়ার ইণ্ডিয়াকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সুটকেস খুলিব না, তাদের অফিস কোন্ দিকে ? কাষ্টমস অফিসার বলিল—Are you not in London ? বলিলাম—No, I am not yet in London, I am in London airport on my way to New York. পাশে একটি ভদ্র ইংরেজ দাঁড়ানো ছিল। সে এয়ার ইণ্ডিয়া অফিস দেখাইয়া দিল।

এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারে হন্তদন্ত হইয়া এক এক মূর্ত্তিমানের আবির্ভাব হয় আবার মুহূর্ত্তে পাশের ঘরে তার তিরোভাব ঘটে। অবশেষে এক মেমসাহেবকে

কাউণ্টারে ধরিলাম—আমার পজিসনটা কি ? মিহি সুরে জবাব—বি. ও. এ. সি. কাউণ্টারে যাও। গেলাম। সেখানে জবাব পাইলাম—এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারে যাও।

আবার ছুটিলাম। এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারে কেহ নাই। সামনে দুজন ভদ্রলোক, চেহারা ভারতীয়ের মত। একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি ভারতীয় ?

—হাঁ।

—কোথা হইতে আসিতেছেন ?

—কলিকাতা।

—ও, আপনি বাঙ্গালী ? কলকাতায় কোথায় থাকেন ?

—কলকাতায় থাকি না। সহর থেকে দূরে একটা গ্রামে থাকি।

—কোন্ গ্রামে ?

—শ্যামবাজারের একটু উত্তরে মধ্যমগ্রাম বলে একটা—

—আরে আমি দত্তপুকুরের ছেলে, মধ্যমগ্রাম চিনি না ?

এবার এয়ার ইণ্ডিয়ার ব্যাজধারী এক ভারতীয়ের সন্ধান পাইয়া কথার মাঝখানেই তাহাকে ধরিলাম—আমার এবং আমার সুটকেসের গতি কি হইবে ?

ইনি সুটকেস বুকিং-এর নম্বরটি দেখিয়া ছুট দিলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বি. ও. এ. সি.র এক মহিলা এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করিলেন—মিঃ বর্ম্মণ কোথায় ?

লক্ষ্য করিলাম, কেউ কোন জবাব দিল না। তখন নিজেই গিয়া পরিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন—আমার সঙ্গে আসুন।

এতক্ষণে হদিস মিলিল—শুনিলাম, আমার সুটকেস ১১-১৫ মিনিটের প্লেনে নিউইয়র্ক রওনা হইয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার জন্য আমি রহিয়া গিয়াছি।

ঐ দিন বেলা দুইটায় আর একটি স্পেশাল প্লেন নিউইয়র্ক ছাড়িবে। আমাকে চারটা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া না রাখিয়া মহিলা ঐ প্লেনে সিট ঠিক করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবার মনে পড়িল। খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় আছে জানিতে চাহিলে বলিলেন—এই একটি কুপন দিতেছি, রেস্তোরাঁয় দিলে খাবার দিবে। সামান্য কিছু খাওয়াই ভাল। কারণ প্লেন ছাড়িলে ভাল লাঞ্চ দিবে।

পরণে ছিল মোটা খদ্দরের স্যুট। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ব্যানার্জি-চৌধুরীর কথায় ভরসা করিয়া ঐটি পরিয়া রওনা হইয়াছিলাম। মোটেই ভুল হয় নাই। মহিলা বলিলেন—এটা কি কাপড়, বেশ সুন্দর তো, সূতী অথচ টুইডের মত দেখতে।

—এটা খদ্দর। মেয়েরা হাতে সুতা কাটে, পুরুষরা হাতের তাঁতে বুনে দেয়।

—ও, এই তবে সেই খাদি? এর কথা শুনেছি কিন্তু দেখি নাই।

বি. ও. এ. সি. প্লেন ছাড়িল। যাত্রী জনা চল্লিশেক। এয়ার হোস্টেস দুজন, তাদের পুরুষ সহকারী একজন। সারা প্লেনে আমি একা ভারতীয়। সারাটা রাস্তা যে কি যত্ন এবং কি ভদ্র ব্যবহার করিল বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রত্যেক কথায়—স্যর। আমি যে কলেজের স্যর তা তাদের জানার কথা নয়। ভারতীয় বলিয়া এই সম্মান দিতেছে—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইউরোপীয়দের কাহাকেও স্যর বলিতে শুনিলাম না।

ক্রমাগত ঠায় বসিয়া আসিয়া শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সিটের হাতল তোলা যায়। দুইটি হাতল তুলিয়া তিনটি সিট একত্র করিয়া টান হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে ভয়ও আছে, লণ্ডনের সেই টমি পুঙ্গবের মত কেউ আসিয়া আবার ভেটকি না লাগায়। চোখ বুজিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। একটু বাদেই অনুভব করিলাম, একজন এয়ার হোস্টেস মাথার নীচে দুইটি বালিশ দিল এবং পায়ের উপর একটি কম্বল চাপা দিয়া গেল। কোথায় আমাদের উত্তর প্রদেশিনী আর কোথায় বিদেশিনী!

ক্যাপটেন মাইক্রোফোন মারফৎ জানাইয়া দিলেন—আমরা আটলান্টিকের উপর দিয়া চলিয়াছি। খুব ঠাণ্ডা ঝড় বহিতেছে বলিয়া একটু ঘুরিয়া যাইতে হইতেছে। বাহিরে টেম্পারেচার —৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মাইনাস ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডা বস্তুটি কি অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। ভিতরে অতি সুন্দর আরাম। আটলান্টিক পার হইতে পৌণে আট ঘণ্টা লাগিবে—তাহাও ক্যাপটেন জানাইয়া দিলেন।

লণ্ডন হইতে প্লেন ছাড়িল বেলা দুইটা। খুব ভাল লাঞ্চ দিল। এবার চলিয়াছে সূর্য্যের বিপরীত দিকে। চার ঘণ্টা প্লেন চলিবার পরেও স্থানীয় সময় দুইটাই রহিল। এয়ার ইণ্ডিয়ার নিয়মমতে চায়ের সময় হয় নাই কিন্তু বি. ও.

অফ এডমিশন। গ্রেনভিল পরিচয় করাইয়া বলিলেন—আরে, এ বড় মজার লোক, সকলের আগে আমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হল দেখতে চায়।

ক্রীম্যান একটু ধীর এবং শান্ত প্রকৃতি। তিনজনে সোজা গেলাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হল। দুশো বছর আগের পুরাণো ধাঁচের বাড়ী। অনেক জায়গা ভাঙ্গিয়া নূতন করিতে হইয়াছে কিন্তু প্যাটার্ণ, রং প্রভৃতি হুবহু ঠিক রাখিয়াছে। ভিতরে মেরামত চলিতেছে। একটি ছোট হলে সংবিধান প্রস্তুত হইয়াছিল। তার চেয়ার, টেবিল সব সংরক্ষিত আছে। অতি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং সরু ঠ্যাং ও সরু হাতলওয়ালা অতি সাধারণ চেয়ার। কেবলমাত্র জর্জ্জ ওয়াশিংটনের চেয়ারের পিছন দিকটা একটু বেশী উঁচু। পালকের কলম দিয়া লেখা হইয়াছিল, তাই প্রত্যেক টেবিলে পালকের কলম এবং সেই পুরাণো ধাঁচের দোয়াত রাখা আছে। যে সংবিধান বিশ্বের এক বৃহত্তম শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছে সেটি প্রস্তুত করিতে ছোট ঘর, শক্ত গদীহীন কাঠের চেয়ার টেবিল এবং পালকের কলমই যথেষ্ট ছিল। আমাদের মহাপ্রভুরা মানুষডোবা গদীতে বসিয়া সুদৃশ্য এবং বহু মূল্য টেবিলে বহু মূল্য ঝরণা কলম দিয়া সংবিধান নামক যে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র প্রসব করিয়াছেন তার কথা মনে পড়িতে লাগিল। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সংবিধানের মূল কপিটি কাঁচের শো কেসে বাঁধাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। লিবার্টি বেলটিতে একটি প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শালের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সময় এই ঘণ্টা বাজানো হইয়াছিল। তখনই উহা ফাটিয়া যায়। ঘণ্টা এবং তার কাঠের ফ্রেম পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিয়াছে।

বাহিরে আসিয়া গ্রেনভিনের প্রশ্ন—তোমাদের স্বাধীনতা কি ইংরেজরা স্বেচ্ছায় দিয়েছে না তোমাদেরও লড়াই করে আদায় করতে হয়েছে? আমরা তো শুনেছি ওরা নাকি ইচ্ছে করে তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেশে চলে গেছে।

—ইংরেজ কখনো নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনতা দেয়? আমাদেরও অনেক রক্তপাত করে তবে স্বাধীনতা আদায় করতে হয়েছে।

—তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তবে কে ছিলেন?

—সুভাষচন্দ্র বসুর নাম শুনেছ? স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগে কিন্তু তিনিই ইংরেজকে শেষ আঘাত করেছেন যার ফলে তারা স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছে।

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন, দুজনেই বলিলেন—কই, আমরা তো এসব কথা শুনি নাই?

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং নেতাজীর কথা মোটামুটি বলিলাম। গ্রেনভিল বলিলেন—তাই বল, ইংরেজ কখনো স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ে?

যখন বলিলাম এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমিও যোগ দিয়াছি এবং তার জন্য সাত বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, তখন দুজনেই বলিয়া উঠিলেন—কি ভাগ্য তোমার। তুমি নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে পারিয়াছ। আমরা শুধু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাসই পড়িয়াছি।

তিনজনে বেশ জমিয়া উঠিল। একে একে সহরের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো হইল। একটি মিউজিয়ামে ফিলাডেলফিয়া সহরের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস দেখিলাম। দেখাইবার কায়দা বিস্ময়কর। ১৭০৪ সালে প্রথম সহরটির পত্তন হয়। সোজা রাস্তা, সমস্ত সহরটা যেন একেবারে চৌকো ঘর কাটা। একটি রাস্তায় একটু বাঁক নাই। আয়তন ছোট। একটি কাঁচের উপর সহরের মানচিত্র। একটি সুইচ টিপিল। ঐ কাঁচেই ভাসিয়া উঠিল এক শত বৎসরের পরের সহর। আবার সুইচ। আবার আর এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী ছবি। আবার সুইচ, এবার বর্ত্তমান সহরের চিত্র।

সেখান হইতে নিয়া গেল একটি কাঠের মডেলের সামনে। সমস্ত সহরটা কাঠের দ্বারা তৈরি। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে তার যে সব জায়গা ভাঙ্গিয়া নূতন হইয়াছে এবং এখন আর যে সব নূতন প্লান হইয়াছে তাহা দেখাইবার কায়দাও চমৎকার। একটা সুইচ টেপে আর পরিবর্ত্তিত অংশটি উল্টাইয়া যায়। পর পর এইভাবে সুইচ টিপিয়া শীঘ্রই সহরটির চেহারা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা দেখাইল। অতঃপর ধড়াস করিয়া আবার সুইচ এবং সমস্ত জায়গাগুলি আবার উল্টাইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি।

সহরের রাস্তাগুলি সব সমান চওড়া, আমাদের কলেজ ষ্ট্রীটের মত। কলিকাতার রাস্তায় অল্প কয়েকটি যে অতিকায় গাড়ী দেখা যায় এখানে সব গাড়ীই তাই। ছোট গাড়ী সারাদিনে একটি দুটির বেশী চোখে পড়ে না। জলস্রোতের মত গাড়ী ছুটিয়াছে। প্রতি রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক লাইট সিগনাল। গাড়ী বা পথচারী কেহই সিগনাল অমান্য করে না, নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া কেহ রাস্তা পার হইতে যায় না। সেরূপ করাও বিপজ্জনক। সিগনাল খোলা থাকিলে যে

জোরে গাড়ী ছোটে তাহাতে ব্রেক কষিতে কষিতেই ভবলীলা সাঙ্গ অনিবার্য্য। আর একটি অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করিলাম—গাড়ীতে কেউ হর্ণ দেয় না। পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সাইরেন বাজাইয়া ছোটে। এম্বুলেন্সের মাথায় চারিটি লাল আলো ঘুরিতে থাকে, কোন হর্ণ বা শব্দ নাই। পার্কিং এক বিরাট সমস্যা। কোথাও আধ ঘণ্টা, কোথাও এক ঘণ্টা গাড়ী রাখা যায়। আবার কোন কোন জায়গায় গাড়ী রাখিয়া গেলে পুলিশ আসিয়া টোয়িং ভ্যান দিয়া টানিয়া সরাইয়া দেয়। তার উপর জরিমানা তো আছেই।

আমার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল হোটেল রুজভেল্ট। ঘরে টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিসন তিনটিই আছে। এখানে হোটেলে খাবার দেয় না, শুধু থাকার জায়গা।

সন্ধ্যায় সহরতলীতে মিডিয়া নামক একটি জায়গায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। গ্রেনভিল এবং ক্রীম্যান ষ্টেসনে তুলিয়া দিয়া গেলেন। ট্রেণে টিকিট কাটিলে সঙ্গে সেই ষ্টেসনের টাইম টেবিল বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক ট্রেণ আসিল। আমাদের বনগাঁ লাইনের ট্রেণের মতই ঝরঝরে। ট্রামের মত বসার বন্দোবস্ত। একটিমাত্র শ্রেণী। সহরতলীর প্রথম ষ্টেসন দেখিয়া চক্ষুস্থির। ট্রেণ এবং ষ্টেশন দুটি বিষয়েই এরা সমান উদাসীন। এরা বলে—পনেরো মিনিট আধ ঘণ্টার জন্য ট্রেনে উঠব, তার আবার আরাম দিয়ে কি হবে? থাকবার ঘর ভাল হলেই হলো। আগাগোড়া সমস্ত ট্রেণটি ভেষ্টিবুল্ড। একজন কণ্ডাকটার। ষ্টেসনে টিকিট না কিনিয়া উঠিলেও আপত্তি নাই। ট্রেণে কণ্ডাকটার টিকিট দেয়।

মিডিয়া ষ্টেসনে মিঃ লুইস গাড়ী নিয়া উপস্থিত। প্রবীণ ভদ্রলোক ইনভেষ্টমেণ্ট ব্যাঙ্কার। ভারত সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। আমি ফিলাডেলফিয়া পৌঁছিবার আগেই নিমন্ত্রণ ঠিক হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী পৌঁছিলাম। দরজা খুলিয়া দিলেন মিসেস লুইস। খাকি হাফপ্যাণ্ট পরিহিতা বৃদ্ধা মহিলা। গামছাপরা মেমসাহেব যে এর চেয়ে ভাল ছিল। ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝিলেন, পত্নীকে বলিলেন—পোষাক বদলে এস। মহিলা কানেই তুলিলেন না। টানিয়া বারান্দায় নিয়া গেলেন। বলিলেন—এখানে এসে বস, কি সুন্দর জায়গা দেখ।

জায়গা সত্যিই সুন্দর। চতুর্দ্দিক ফাঁকা। বলিলাম—খুব ভাল জায়গা, আমার বাড়ীর মত।

—কেন, তুমি তো ক্যালকাটা থেকে আসছে।

—না, আমি ক্যালকাটায় থাকি না, ক্যালকাটা ছেড়ে দিয়েছি। গ্রামে থাকি।

—ওঃ লাভ্‌লি। কি নাম তোমার গ্রামের?

—মধ্যমগ্রাম।

বার কয়েক ম্যাটামগ্রাম করিয়া বলিলেন—হাঁ, এবার ঠিক মনে থাকবে।

সাহেব মেম দুজনে কাড়াকাড়ি—কে আগে এবং কে বেশী কথা বলিবে। এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই বোর্ডিং-এ থাকে। তাদের ছবি দেখানো হইল। তারপরেই মেমসাহেবের প্রশ্ন—তোমার ছেলে মেয়ে নেই?

—আছে, এক মেয়ে।

—ওঃ লাভ্‌লি। কি নাম তার? কি বললে? মইট্—মইট ট্রেয়ি—হাঁ, এবার মনে থাকবে।

ইতিমধ্যে এক ফাঁকে পোষাক বদলাইয়া আসিলেন। বলিলেন—এবার চল, খাবার ঘরে গিয়ে বসা যাক।

খানার টেবিলে বসিয়াছি। সাহেব একটি কসাইয়ের ছুরির মত ছুরি শানাইতেছে। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই সের পাঁচেক ওজনের এক বিরাট মাংসখণ্ড আসিয়া ধপাস করিয়া টেবিলে পড়িল। চক্ষু কপালে উঠিল। ভাবিলাল, কি রে বাবা, শূকর মাংস নয় তো?

ভদ্রলোক বোধ হয় মুখ দেখিয়া বুঝিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন—ল্যাম্ব। একটি ভেড়ার ছানার প্রায় অর্দ্ধেকটার আস্ত রোষ্ট।

লুইস দম্পতি ছাড়িতে আর চান না। এক রকম জোর করিয়াই রাত্রি নয়টায় বাহির হইয়া পড়িলাম। সহরে পৌঁছিতে রাত দশটা বাজিবে। অচেনা দেশ। সঙ্গে কেউ নাই। একা বেশী সাহস করা ঠিক নয়।

লুইস ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দিলেন। বলিলেন—এখন ষ্টেসনে টিকিট ঘর বন্ধ হয়ে গেছে, ট্রেণেই টিকিট পাবে।

শ্রীমতী লুইস বাহির হইবার সময় বলিয়া দিয়াছেন—দেশ ঘোরা হলে ফেরার আগে একদিন কিন্তু নিশ্চয় আসতে হবে, কি কি দেখলে সব বলে যেতে হবে।

রবিবার গির্জ্জায় গেলাম। প্রকাণ্ড হল, সবটা ভর্ত্তি হইয়াছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তরুণ তরুণী, বালক বালিকা সবাই উপস্থিত। প্রার্থনার পর সকলের একসঙ্গে

চা অথবা কফি পানের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। বহুমূল্য সুদৃশ্য চায়ের বাসন। দেখিয়া বোঝা যায় এদের সম্পদ প্রচুর। সঙ্গে ছিলেন গ্রেমভিল এবং ফ্রীম্যান। তাঁহারা অনেকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। এক বৃদ্ধ বলিলেন—ও, তুমি ভারত থেকে এসেছ? আমার এক বন্ধু কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ্চে ছিলেন। বছর কুড়ি আগে তিনি দেশে ফিরেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন—ভারত আমাদের সভ্যতা শেখাতে পারে, আর আমরা সেখানে গিয়েছি এদের খৃষ্টান করতে। (India can civilise us, we have gone there to Christianise them.) আমার খুব ইচ্ছা ছিল ভারতে একবার যাই, কিন্তু এ জীবনে আর হলো না।

সোমবার দুপুরে বোষ্টন যাত্রা। সকালে অফিসে গিয়া প্রোগ্রাম দেখিয়া চক্ষুস্থির। এর চেয়ে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দেওয়া অনেক ভাল ছিল। একেবারে বাঘের গর্ত্তে নিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। সব জায়গাতেই আলোচনার ব্যবস্থা এবং আলোচনার ক্ষেত্র ও ব্যক্তি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়,গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের সভাপতি ও ডিরেক্টরবর্গ।

বোষ্টনের প্রোগ্রাম—

(১) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার অফিস। আমেরিকায় অজস্র পত্রিকা আছে। তার মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৩) বোষ্টন সিটি হল।

(৪) আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র কেন্দ্র।

(৫) ইউনিটেরিয়ান গির্জ্জা।

(৬) মাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতাল। এটি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। এটি তাদের মেডিকেল স্কুলের হাসপাতাল।

(৭) World Peace Foundation-এ মধ্যাহ্ন ভোজন।

নিউ হাভেনের প্রোগ্রাম—

(১) ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়।

নিউ ইয়র্কের প্রোগ্রাম—

(১) আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজ-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফ্রেডারিক বুর্কহার্ডের সহিত সাক্ষাৎ।

(২) কাউন্সিল অফ ফরেণ রিলেশন্স-এর একজিকিউটিভ ডিরেক্টর জর্জ ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

(৩) ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জন নাসন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

(৪) কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইণ্টারনাশনাল পীস-এর ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্লাটিগ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

(৫) আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশনসের ডিরেক্টর ডাঃ আইকেলবার্গারের সহিত সাক্ষাৎ।

(৬) এশিয়া হাউসে ডিরেক্টর মিস নিমিজের সহিত সাক্ষাৎ।

(৭) টাইম-লাইফ অফিসে সম্পাদকদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন।

(৮) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান গবেষণা বিভাগের অধ্যাপকদের সহিত আলোচনার জন্য ডিরেক্টর ডাঃ এইন্সলি এমব্রির আহ্বানে নৈশ ভোজন।

২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই প্রোগ্রাম। তারপর ফিলাডেলফিয়া ফিরিয়া পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ার সেমিনারে যোগদান।

পরবর্ত্তী প্রোগ্রাম ফিলাডেলফিয়া ফিরিলে মিলিবে।

বোষ্টন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

বোষ্টনে হোটেল ডুরাইনে পৌঁছিয়াই একখানি চিঠি পাইলাম। চিঠিখানি লিখিয়াছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল জে. হ্যামডেন রব, পাঠাইয়াছেন স্পেশ্যাল ডেলিভারীতে। খামের উপর আমার নাম ও হোটেলের ঠিকানার পাশে খেলা—Arriving Monday. October 9, 1961, Time of arrival 2 p.m.। চিঠির প্রথম কথা—

Dear Mr. Burman,

This letter is written to welcome you on your arrival in Boston and to say that I hope you will find your visit both pleasant and profitable.

সোমবার বিকালে পৌঁছিয়া মঙ্গলবার সকালে টেলিফোন করিলাম। মিঃ রব তখনই রওনা হইতে বলিলেন। পৌঁছিবামাত্র পরিচয় হইল তাঁর তিনটি সহকারিণীর সঙ্গে—মিস বেলচার, মিস রিনটেল এবং মিস মুগার। সময় ছিল মাত্র ছুটি দিন—মঙ্গল এবং বুধবার। বৃহস্পতিবার কলম্বস দিবসের ছুটি। শুক্রবার সিটি হল দেখিবার নিমন্ত্রণ। শনিবার সর্ব্বত্র ছুটি। রবিবার নিউ হাভেন যাত্রা।

বিশ্ববিত্থালয়ের একটি মোটামুটি বিবরণ জানিয়া নিয়া দেখিতে বাহির হইলাম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় ১৬৩৬ সালে। প্রথমে উহা ছিল একটি কলেজ, আমেরিকার প্রাচীনতম কলেজ। ইংলণ্ড হইতে একদল লোক আমেরিকায় পৌঁছিয়া দেখিলেন গির্জ্জায় পাদ্রীদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা অনুভব করিলেন যে, উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা ভিন্ন দেশের নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হইতে পারিবে না, সুতরাং সাধারণ জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। জন হার্ভার্ড তাঁহাদের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাঁর

জমিদারীর অর্দ্ধেক একটি কলেজ স্থাপনের জন্য দান করিলেন। তাঁর একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল, সেটিও কলেজকে দিয়া দিলেন। বোষ্টন সহরের উপকণ্ঠে কেমব্রিজ নামক গ্রামে কলেজ স্থাপিত হইল। দাতার নামে উহার নাম হইল হার্ভার্ড কলেজ। 'এই কলেজই কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। হার্ভার্ড প্রথমে যে সম্পত্তি দান করেন তার মূল্য ছিল ১৭০০ পাউণ্ড, পরে আরও ৩০০ পাউণ্ডের সম্পত্তি তিনি দান করেন। এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট দানের (University Endowment) পরিমাণ ৫০ কোটি ডলার বা ২৫০ কোটি টাকা। শুধু কলেজটির হাতে দানের টাকা আছে সাড়ে ১৩ কোটি ডলার। সম্প্রতি আরও সওয়া ৮ কোটি ডলার কলেজের জন্য তোলা হইয়াছে।

একটি মেডিকেল ছাত্রকে সঙ্গে দিয়া মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ঘুরিয়া দেখিতে পাঠাইলেন। ছাত্রটি প্রথমেই নিয়া গেল হার্ভার্ডের প্রস্তরমূর্তির সামনে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এই মূর্ত্তি কি হার্ভার্ডের কোন ছবি দেখিয়া তৈরি হইয়াছে? সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের এত সুন্দর মূর্ত্তি গঠনের উপযুক্ত ফটোগ্রাফের মত ছবি কোথায় পাইলে?

ছাত্রটির নাম এণ্ডার্সন। জবাব দিল—মূর্ত্তিটি কাল্পনিক।

কলেজ প্রাঙ্গণকে সর্ব্বত্র বলা হয় ক্যাম্পাস, এখানে বলে ইয়ার্ড। আগে সর্ব্বত্র ইয়ার্ড কথাটা ব্যবহৃত হইত, এখন উহা একমাত্র হার্ভার্ডে অবশিষ্ট আছে। প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখিয়াছি। হার্ভার্ড তাহাই করিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি হার্ভার্ডের ছাত্র। তিনি কোন্ হলে থাকিতেন ছাত্রটি তাহা দেখাইল। পাশেই একটি গির্জ্জা। সেখানে যুদ্ধে হার্ভার্ডের যে সব ছাত্র প্রাণ দিয়াছে তাহাদের নাম লেখা আছে। গির্জ্জার একটি ঘরে শ্বেতপাথরের দুটি মূর্ত্তি, নার্সের বেশে একটি তরুণী, দৃষ্টি উর্দ্ধে নিবদ্ধ, তার কোলে মাথা রাখিয়া যুদ্ধের বেশ পরিহিত নিহত সৈনিক শায়িত। এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি খুব কম দেখিয়াছি।

এর পর নিয়া গেল একটি মিউজিয়ামে। সেখানে প্রথমেই আলাপ হইল ফিলিপিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন ডীনের সঙ্গে। মিউজিয়ামটির সবচেয়ে ভাল দ্রষ্টব্য বস্তু কাঁচের ফুল। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ফুলগুলি তৈরি হইয়াছে, আজও

নূতনের মত অক্ষত রহিয়াছে। বিভিন্ন ফুলের রং কি ভাবে কাঁচের ভিতর আনিল তাহাই আশ্চর্য্য। কলার ফুল হিসাবে একটি মোচা রাখা আছে। বুঝিবার সাধ্য নাই যে, উহা গাছের মোচা নয়।

লাইব্রেরী দেখিতে চাহিয়াছিলাম। শুনিলাম ৮৫টি ইউনিটে সমস্ত বই ছড়ানো, বই এবং পুস্তিকার সংখ্যা ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার। ২৫ বা ৩০ লক্ষ বই এদের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ব্যাপার। আণ্ডার গ্রাজুয়েট বা কলেজের ছাত্র এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য বই আলাদা জায়গায় রাখা হয়। এরা আণ্ডার গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠানকে বলে কলেজ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠানকে বলে স্কুল। কলেজ লাইব্রেরী তিনটি বাড়ীতে সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে ওয়াইডেনার লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর ৪৫টি ইউনিট এই তিনটি বাড়ীতে আছে। একমাত্র ওয়াইডেনার লাইব্রেরীতে আছে ২০ লক্ষ বই। এক বিধবার একমাত্র পুত্র হ্যারি এলকিন্স ওয়াইডেনার লুসিটেনিয়া জাহাজডুবিতে মারা যান। তাঁর মা সমস্ত সম্পত্তি ও বই এই লাইব্রেরীর জন্য দান করেন। লাইব্রেরী রাত দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ল্যামণ্ট লাইব্রেরী খোলা থাকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত। কলেজ লাইব্রেরীতে ছাত্রেরা নিজেরাই ইচ্ছামত বই বাহির করিয়া আনিতে পারে।

ওয়াইডেনার লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ডাঃ মিস এলিয়ানর নিকল্‌সের সঙ্গে পরিচয় হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমার গবেষণার অন্যতম বিষয় জানিয়া মহিলা খুব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, তিনি ঐ সময়ের দুজন লোক—বারওয়েল এবং পিকক নিয়া গবেষণা করিতেছেন। বাঙ্গলার জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান প্রাচীন দলিলের কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে, দলিলটি নিউ ইয়র্কের একটি লোকের নিকট আছে। সেই লোকের নাম ঠিকানা আনিলাম কিন্তু কাজ হয় নাই। নিউ ইয়র্ক পৌঁছিয়াই তাঁহাকে চিঠি দিয়াছিলাম কিন্তু জবাব পাই নাই।

ডাঃ পল টিলিকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আসিয়া গেল। তিনি ঐ বাড়ীতেই বসেন। টিলিকের ঘরে পৌঁছিবার আগে একটি ঘরের দরজায় লেখা—সংস্কৃত এবং ভাষাতত্ত্ব।

টিলিক স্কুল অফ ডিভিনিটির প্রধান অধ্যাপক। তিনি নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন। একজন

আমেরিকানের নিকট বলিয়া মনে হইতেছিল যেন ভারতীয় ঋষির কথা শুনিতেছি। তাঁর সঙ্গে আলাপের পর হার্ভার্ডের শিক্ষার আদর্শ আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এরা liberally educated man তৈরী করিতে চায়। শিক্ষার সঙ্গে উদারতা এবং নৈতিক দৃঢ়তা আনা এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমেরিকায় প্রচুর সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং প্রত্যেকটি সাধারণতঃ স্থানীয় ছাত্রে ভর্ত্তি থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশত মাইলের মধ্যে যাহাদের বাড়ী তাহারাই প্রধানতঃ উহাতে ভর্ত্তি হয়। কিছু বাইরের ছাত্রও থাকে। কিন্তু হার্ভার্ডে তা নয়। এখানে আমেরিকার প্রত্যেক প্রদেশের ছাত্র আসে। বিদেশী ছাত্রের সংখ্যাও অনেক। ঐ সময়ে আমেরিকার বাহিরের ৪৭টি দেশের ছাত্র হার্ভার্ডে ছিল। হার্ভার্ডের শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ। বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ছাত্র একত্র বাস করে, পড়ে, খেলা করে, থিয়েটার করে এবং এইভাবে পরস্পরের সহিত মেলামেশায় তাহাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দূর হইয়া যায়। পরস্পরকে জানিবার এবং সুস্থ আলোচনার দ্বারা একটি বিষয় সমগ্রভাবে বুঝিয়া তারপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার দিকে শিক্ষকদের সব সময় লক্ষ্য থাকে। মেডিকেল ছাত্র এণ্ডার্সনের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিলাম এই জ্ঞান তার বেশ ভালভাবেই জন্মিয়াছে। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ বুঝাইতে গেলে তাহাদেরই ভাষায় বলিতে হয়—

(Harvard seeks to develop the individual's capacity for critical analysis and independent thinking, for understanding facts and ideas, reasoning from them and expressing conclusions lucidly. It tries to increase breadth and perspective, understanding and judgment.)

It is concerned with values and standard and points of view, with broadening horizons and increasing awareness of the basic problems of man and society.

এই আদর্শ কথার কথা নয়, এই আদর্শ তাহারা বাস্তবে পরিণত করিতেছে এইখানেই তাহাদের কৃতিত্ব। কেবলমাত্র ডিগ্রী অর্জ্জনই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহা উপলব্ধি করিতে

২

পারিয়াছে। এই কারণেই আমেরিকাতে দেখিয়াছি হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েটের সম্মান সবচেয়ে বেশী। চিন্তার শক্তি, মূল্যমান নির্দ্ধারণের শক্তি, নূতন বিশ্বের পরিবর্ত্তন দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি আপনি আসে না, উহা অর্জ্জন করিতে হয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে এই তিন শক্তির সম্পর্ক ওতঃপ্রোত, সে বিষয়ে এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক সম্পূর্ণ সচেতন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ কোর্স চার বছর ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসের ছাত্রেরাও অবহেলিত নয়, তাদেরও ক্লাস বহু বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মনীষী নিয়া থাকেন। এক হইতে ছয় জন পর্য্যন্ত ছাত্র নিয়া টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়। সপ্তাহে এক বা দুই দিন তদুপলক্ষ্যে যে কোন ছাত্র তার অধ্যাপকের নিকট যাইতে পারে। টিউটোরিয়েলের উদ্দেশ্য পরীক্ষার উত্তর লিখিতে শেখানো নয়, Tutorial work enables a student to broaden and deepen his understanding of his own field.

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী কত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা এগারো হাজার। অধ্যাপক চার হাজার। প্রতি তিনজন ছাত্রে একজন অধ্যাপক। আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র ৪৪০০ ; তাহাদের জন্য অধ্যাপক ফুল-টাইম ৫৮০ এবং পার্ট-টাইম ৫০০। পার্ট-টাইম অধ্যাপকদের এরা বলে Teaching Fellow.

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শালের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হইল। দেখিলাম এরা বড় কলেজের পক্ষপাতী নয়। কলেজের আয়তন বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে উহা ভাঙ্গিয়া ছোট করে। এরা Collegiate Way of Living অর্থাৎ 'কলেজের উপযুক্ত জীবন' কথাটা খুব বেশী ব্যবহার করে। হার্ভার্ড কলেজের জন্ম হইতেই এই কথাটি এদের একটি মূলমন্ত্র হইয়া আছে। একটি সুন্দর স্নিগ্ধ এবং আনন্দজনক আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখাকে এরা বলে Collegiate Way of Living। প্রবীণ অধ্যাপকদের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা এদের। পল টিলিকের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি—ইহাতে যেন আমারও মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে।

কলেজগুলিকে কি ভাবে ছোট করা হয় তাহা মার্শালের নিকট শুনিলাম। ইহাকে এরা বলে হাউস প্লান। হার্ভার্ড কলেজে এখন ৪৪০০ ছাত্রছাত্রী, উহা নয়টি কলেজে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগ কিন্তু আমাদের মত নয়। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে। অধ্যাপকদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকেন। কেহ কেহ বাহির হইতে আসা যাওয়া করেন। ছাত্রদের নয়টি গ্রুপে ভাগ করিয়া

নয়টি হাউসে বা হোষ্টেলে জায়গা দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস চ্যান্সেলার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নামে উহাদের নামকরণ হইয়াছে। হাউস প্লানের প্রবর্ত্তক হইতেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট, নাম এডোয়ার্ড হার্কনেস। ১৯৩০-এ এই উদ্দেশ্যে তিনি হার্ভার্ড এবং ইয়েল উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেককে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা দান করেন। মার্শাল বলিলেন যে, হাউস প্লান হার্ভার্ড এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত আমেরিকার আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই।

হাউস প্লান মোটামুটি এইরূপ :

ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রেরা সকলে একসঙ্গে থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় বারো শতের মত ছাত্র ভর্ত্তি হয়। তাহাদিগকে জায়গা দেওয়া হয় হার্ভার্ডের ঐতিহাসিক ইয়ার্ডে। প্রতি কামরায় দুজন থাকে এবং প্রতি চারজনের জন্য একটি পড়ার আলাদা ঘর ও একটি বাথরুম। খাওয়ার ঘর ও খেলার ঘর সকলের জন্য একটি। প্রথম বছর এখানে থাকিয়া তার পরে ইহারা বিভিন্ন হাউসে চলিয়া যায়। প্রতি হাউসকে বলা হয় Self-contained College Community বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ গোষ্ঠী। ক্লাস এবং লেবরেটরীর কাজের জন্য আলাদা বাড়ী। সেখানে রীতিমত ক্লাস হয়। ইহাকে বলা হয় formal instruction। সাধারণ ক্লাস ছাড়া আর সমস্ত কিছু হয় হাউসে। হাউসে প্রত্যেক ছাত্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্লাট দেওয়া হয়। উহাতে থাকে দুই বা তিনটি শয়ন কক্ষ, একটি বড় পড়ার ঘর এবং স্নানের ঘর। কেহ একা থাকিতে না চাহিলে এক বা দুইজন রুমমেট নিতে পারে। প্রত্যেক হাউসের ভার থাকে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের উপর, তাঁকে বলা হয় মাষ্টার। একজন সিনিয়ার টিউটরকেও হাউসে বাস করিতে হয়। অধ্যাপকদের অনেকে হাউসেই থাকেন। সব অধ্যাপকদের থাকা বাধ্যতামূলক নয়। যাঁরা প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন তাঁদের জন্য হাউসে আলাদা বসার বন্দোবস্ত আছে।

প্রতি হাউসে প্রায় ৪৫০ ছাত্র আছে, তাহাদের সঙ্গে সাধারণতঃ কত জন অধ্যাপক থাকেন—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম প্রায় ৪০ জন অধ্যাপককে থাকিতে হয়, তার মধ্যে ৮ হইতে ১০ জন টিউটর। প্রতি হাউসে ১২ হাজার বইয়ের একটি লাইব্রেরী থাকে। হাউসের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে পড়া তৈরির কাজটা সেখানে খুব ভাল ভাবে হইয়া যায়। প্রতি দশ জন ছাত্রে একজন

অধ্যাপক হাউসে থাকেন বলিয়া যে কোন বিষয়ে ঠেকিলে তৎক্ষণাৎ ছাত্রেরা সাহায্য পায়। টিউটোরিয়েল ক্লাস কলেজে হয় না, হাউসে হয়। শুধু লেখাপড়া নয়, ছাত্রদের কোনরূপ ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে অধ্যাপক ও টিউটরেরা তাহারও সমাধান করিয়া দেন। বিভিন্ন হাউসের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতা খুব প্রবল। শুধু হার্ভার্ডের নয়টি হাউস নয়, হার্ভার্ড ও ইয়েলের হাউসগুলির মধ্যেও তীব্র ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। এদের ফুটবল আমাদের মত গোল বল নয়, লম্বাটে বল। হাউসে লেখাপড়া, খেলা, আমোদপ্রমোদ এবং সামাজিক জীবন সব দিকে সমান দৃষ্টি রাখা হয়। শিক্ষক ছাত্র সাহচর্য্য একটি প্রধান জিনিষ। শিক্ষকের যোগ্যতা সম্বন্ধে এরা অতিশয় কঠোর। এদের নীতি হইতেছে—একজন অযোগ্য শিক্ষক থাকিতে দেওয়ার অর্থ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। এ বিষয়ে এরা যে কত কঠোর তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম আটলাণ্টায়। সেখানে স্কুল বোর্ডের একটি সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সে কথা পরে বলিব। অধ্যাপক এবং টিউটরদের যোগ্যতা সর্ব্বোচ্চ বলিয়াই অধ্যাপক ছাত্র অনুপাতের স্বল্পতা এতটা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে।

মার্শালের একটি কথা খুব মনে লাগিল। তিনি বলিলেন—আমরা এখানে ত্রিবিধ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলি। প্রথম স্বাধীনতা হইতেছে বাহিরের সকল প্রকার রাজনৈতিক বা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণ হইতে আত্মরক্ষার স্বাধীনতা। হার্ভার্ড স্বাধীন, স্বয়ংশাসিত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়, বিদ্যাচর্চ্চার স্বাধীনতা (academic freedom)। সত্যের সন্ধান এবং সত্যের প্রকাশ হার্ভার্ডের ব্রত। তাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলে লেখা আছে veritas বা সত্য। তৃতীয়, ছাত্রদের স্বাধীনতা (freedom for the student)। ছাত্র এবং অধ্যাপক উভয়ের জন্যই যথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ ও যথাসম্ভব বেশী স্বাধীনতায় হার্ভার্ড বিশ্বাসী।

মার্শাল বার বার 'লিবারাল এডুকেশন' কথাটার উপর খুব জোর দিতেছিলেন। উহার তাৎপর্য্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম—'লিবারাল এডুকেশন' বলিতে আমরা বুঝি সেই শিক্ষা যাহা স্বাধীন সমাজে স্বাধীনতার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের শিক্ষা দেয় (Liberal education is fundamentally education for the intelligent use of freedom in a free society)। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলিলেন—এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বাধীনতার

আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, সামাজিক সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তোলা স্বাধীনতার উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার প্রয়োগ শিখিতে হয়, সেই প্রয়োগ শিখিতে গেলে শুধু বইয়ে হয় না, উন্নত চরিত্র এবং আদর্শ চোখের সামনে রাখিতে হয়, এই শিক্ষাই আসল শিক্ষা—হার্ভার্ডে কয়েক ঘণ্টা থাকিলে এবং অল্প কয়েকটি ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিলেই যেন এটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা যায়। বিশ বছর আগে কলিকাতায় বহু আমেরিকান সৈনিক দেখিয়াছি। তাহাদের অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উহাদের অসভ্যতাকে বোধ হয় বর্ব্বরতা বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। কুড়ি বৎসরের মধ্যে সেই দেশের ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক কিরূপে এত ভদ্র সামাজিক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া গেল, হার্ভার্ডে না গেলে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইত। মার্শাল বলিলেন—সমাজে বাস করিবার উপযুক্ত সংযত স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন হার্ভার্ডে a necessary part of growing up. Growing up বলিতে তাঁহারা বোঝেন growing up socially, intellectually and morally —অর্থাৎ মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে সামাজিক সভ্যতা, বুদ্ধির বিকাশ এবং নৈতিক চরিত্র তিনটিই সমান ভাবে চাই। আরও একটি খুব বড় কথা বলিলেন—হার্ভার্ড সেই শিক্ষা দেয় যে শিক্ষায় প্রতিটি ছাত্র নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শেখে (learns to stand on his own feet)। বহুর মধ্যে একের প্রকাশ আমাদের আদর্শ ; হার্ভার্ডের আদর্শ শুনিলাম—স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই তিনটিকে তাহারা গণতান্ত্রিক জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়া বিশ্বাস করে। সকলের উর্দ্ধে দেয় মূল্যবোধের স্থান।

আলোচনা দীর্ঘ হইতেছে তবু শেষ করিতে মন উঠিতেছে না। পরবর্ত্তী প্রোগ্রামের সময় হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা যাওয়ার আগে দুই বন্ধু তাঁহাদের পুত্রদের হার্ভার্ডে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি না জানিয়া আসিতে বলিয়াছেন। মার্শালকে বলিলাম। হাসিয়া বলিলেন—বেশ তো, দরখাস্ত পাঠাইতে বলিবেন ; তবে ১৬ বছর formal education অর্থাৎ স্কুল কলেজে পড়া চাই।

খরচের কথা শুনিয়া চক্ষুস্থির। প্রত্যেক ছাত্রের বছরে প্রায় তিন হাজার ডলার অর্থাৎ ১৫ হাজার টাকা পড়া এবং খাওয়া থাকার ফী দিতে হয়। আমাকে চোখ কপালে তুলিতে দেখিয়া বলিলেন—ভয় নাই, যারা এত টাকা দিতে

পারে না তাহাদের উপার্জ্জন করিয়া টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অন্য সুযোগও আছে। বার্ষিক সাড়ে ১২ লক্ষ ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হয়। শতকরা প্রায় ২৫ জন ছাত্র স্কলারশিপ পায়। সর্ব্বোচ্চ স্কলারশিপের পরিমাণ বার্ষিক আড়াই হাজার ডলার। মেধাবী ছাত্রকে যাহাতে উপার্জ্জনের চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিতে হয় তার জন্য এত টাকার স্কলারশিপ দেওয়া হয়। স্কলারশিপের পরিমাণ সাধারণতঃ বার্ষিক ১২০০ ডলার বা মাসে ৫০০ টাকা। স্কলারশিপ পাওয়া এবং বজায় রাখা ছাত্রের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যাহারা স্কলারশিপ নিতে পারে না তাহাদেরও ব্যবস্থা আছে। যে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বছরে ৭৫০ ডলার ঋণ নিতে পারে। প্রতি ছাত্র মোট তিন হাজার ডলার পর্য্যন্ত ঋণ পায়। এই ঋণের কোন সুদ নাই এবং ছাত্রাবস্থায় উহা পরিশোধ আরম্ভ করিবারও দায়িত্ব নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা সুদ ধরা হয় এবং মাসিক অন্ততঃ ১০ ডলার হারে ঋণ শোধ আরম্ভ করিতে হয়। প্রতি বৎসর কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ ডলার এইভাবে ঋণ দেওয়া হয়। এই সুযোগ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রেরা পায়। ছাত্রদের উপার্জ্জনের উপযুক্ত কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব। সপ্তাহে ১০ হইতে ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া যে কোন ছাত্র বার্ষিক চার হইতে পাঁচ শত ডলার উপার্জ্জন করিতে পারে।

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিতে হইল। মার্শাল একটি অতি সুন্দর বাঁধানো চমৎকার কাগজের খাতা খুলিয়া বলিলেন—এটিতে আপনার নাম ঠিকানা লিখিয়া দিন।

তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই খাতা আমরা যত্নের সহিত রক্ষা করি। হয়ত শতবর্ষ পরে কোন ছাত্র হার্ভার্ডে কাহারা অতিথি আসিয়াছিলেন তাহা নিয়া গবেষণা করিবে, সেদিন সার্থক হইবে এই খাতার সব স্বাক্ষর।

বোষ্টন সিটি গবর্ণমেণ্ট

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল বোষ্টন সিটি কাউন্সিল দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সময় ঠিক হইল শুক্রবার ১৩ই অক্টোবর বেলা দশটা। সিটি হলে কাউন্সিলার হাইন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি সমস্ত দেখাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

সিটি হলে উপস্থিত হইয়া কাউন্সিলার হাইনের ঘর খুঁজিতেছি এমন সময় একজন বলিল—Can I help you? (তোমাকে কি সাহায্য করিতে পারি?)

বলিলাম—নিশ্চয়, আমি কাউন্সিলার হাইনের ঘর খুঁজিয়া পাইতেছি না।

—এই বিরাট বাড়ীতে ঘর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন বটে, আমার সঙ্গে এসো।

ঘরের সামনে পৌঁছিয়া বলিলাম—ধন্যবাদ।

—এর জন্য আবার ধন্যবাদ কিসের? একজন লোককে এইটুকু সাহায্য যদি না করিতে পারি তবে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি কেন?

কাউন্সিলার হাইন তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। তাঁর সেক্রেটারী ডয়েল অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি ঘরে নিয়া বসাইলেন।

আমেরিকার মিউনিসিপাল ব্যবস্থা বইয়ে পড়িয়াছি। ডয়েলের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপেই বুঝিলাম বই পড়া জ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ।

বোষ্টন আমেরিকার বৃহত্তম সহরগুলির মধ্যে একটি। এখানে মেয়র টাইপের সিটি গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত। আমেরিকার মিউনিসিপালিটি আমাদের মত শুধু জল সরবরাহ, জল নিকাশ, আবর্জ্জনা সাফ এবং বসন্ত ও কলেরার টীকাদানে দায়িত্ব শেষ করে না; এরা প্রকৃত সিটি গবর্ণমেণ্ট চালায়। মিউনিসিপালিটির সমস্ত কাজ তো করেই, তার উপর পুলিশ, অগ্নিনির্ব্বাপন, হাসপাতাল পরিচালন প্রভৃতিও সিটি কাউন্সিলের কাজ। মিউনিসিপালিটির তিনটি টাইপ—মেয়র টাইপ, কমিশনার টাইপ এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ। বোষ্টনে মেয়র টাইপ এবং কানসাস প্রদেশের মানহাট্টান সহরে সিটি ম্যানেজার টাইপ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। মেয়র টাইপে কার্য্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মেয়রের, সিটি কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব বাজেট পাশ এবং মেয়রের কাজ অনুমোদন।

সিটি কাউন্সিলের সদস্য দশজন। সকলেই নির্ব্বাচিত এবং সকলেই বেতন পান। মেয়রও নির্ব্বাচিত এবং বেতনভোগী। মেয়র কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন না। কাউন্সিলারদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলারদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হন। দেখিলাম গণতন্ত্রে বয়সের মর্য্যাদা দানের সুযোগও আছে।

ষ্টাণ্ডিং কমিটি ১৪টি। যথা:

(১) একজিকিউটিভ কমিটি। সব কয়জন কাউন্সিলার ইহার সভ্য।

(২) ফিনান্স কমিটি। সভ্য সাতজন।

(৩) দাবী বা Claims কমিটি। সভ্য পাঁচজন। এই কমিটির কাজ কি—জিজ্ঞাসা করিলে ডয়েল বলিলেন—সিটি গবর্ণমেণ্টের কাজের কোন ত্রুটিতে যদি কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে সিটি কাউন্সিলের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বোঝা যাইবে:

(ক) রাস্তার গর্ত্তে পড়িয়া এডওয়ার্ড হোয়ের গাড়ীর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে ৪০০ ডলার।

রাস্তার গর্ত্তে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীর ক্ষতিপূরণের সংখ্যা অনেক।

(খ) হেলেন হেলার একটি গলিতে রাস্তার দোষে পড়িয়া আহত হন। তিনি ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন ২০০ ডলার।

(গ) রাস্তার মেইন পাইপ ফাটিয়া জেমস ডায়ারের ভাঁড়ার ঘরে জল ঢুকিয়া জিনিষ নষ্ট হইয়াছিল। তার ক্ষতিপূরণ ২৯ ডলার।

(ঘ) জলের মিটারের ত্রুটিতে আন্না কেলির ভাঁড়ার ঘরে জল ঢুকিয়া জিনিষ নষ্ট হইয়াছিল। তার ক্ষতিপূরণ ৭৫ ডলার।

(ঙ) ফায়ার ব্রিগেডের মইয়ের ধাক্কায় রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় অ্যানি লিঙ্কের গাড়ীর ক্ষতি হয়। তার ক্ষতিপূরণ ৬০ ডলার।

(চ) ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় দাঁড়ানো উইলিয়াম কুকের গাড়ীর ক্ষতি হয়। তার ক্ষতিপূরণ ২৫০ ডলার।

সিটি কাউন্সিলের কর্ত্তাদের অমনোযোগী হইবার উপায় নাই। ক্ষতিপূরণের এই ব্যবস্থার দ্বারা আমেরিকানরা তাহাদের সিটি গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক এবং কর্ম্মক্ষম

রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অযোগ্য কাউন্সিলারদের কর্ত্তব্যে অবহেলার দোষে নাগরিকদের অযথা ক্ষতি নিবারণ করিয়াছে।

(৪) কনফারমেশন কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। মেয়র অফিসার ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। তার কতকগুলিতে কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। মেয়র পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করেন। এই নিয়োগে গবর্ণরের অনুমোদন প্রয়োজন। কনেষ্টবল নিযুক্ত করেন মেয়র, অনুমোদন করে কাউন্সিল। সমস্ত অনুমোদনের কেস আগে কমিটিতে বিচারের পর কাউন্সিলে যায়। সহরের স্থায়ী অধিবাসী ভিন্ন অপর কেহ কনেষ্টবল নিযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের কলিকাতা সহরে এই দাবী তুলিলে তৎক্ষণাৎ প্রাদেশিকতা বলিয়া অভিহিত করা হইবে। কংগ্রেস কমুনিষ্ট উভয়েই ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া নিন্দা করিবেন। ডয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ বিষয়ে কোন আইন আছে কি না। বিনা বাক্যব্যয়ে ডয়েল একটি বই টানিয়া বাহির করিলেন—The Revised Ordinances of 1961 of the City of Boston। উহার নবম পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাষায় লেখা—মেয়র কনেষ্টবল নিযুক্ত করিবেন who shall be inhabitants of the City।

(৫) হাসপাতাল কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। হাসপাতাল সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে এঁরা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

(৬) জেল কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। কারাগার পরিদর্শন এঁদের কাজ।

(৭) আইন সংক্রান্ত কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। আইন সভায় সহর সংক্রান্ত কোন আইনের প্রস্তাব হইলে এই কমিটি সে বিষয়ে সিটি কাউন্সিলের বক্তব্য উপস্থিত করেন।

(৮) লাইসেন্স কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। লাইসেন্স এবং পারমিটের সমস্ত দরখাস্ত প্রথমে এই কমিটিতে আসে।

(৯) অর্ডিনান্স কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। সিটি কাউন্সিল নিজে কার্য্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারে। উহাকেই বলা হয় অর্ডিনান্স। ডয়েল যে বইটি দেখাইয়াছিলেন তাহা চাহিয়া নিয়া আসিয়াছি।

(১০) পাবলিক হাউসিং কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ।

(১১) পাবলিক জমি কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ।

(১২) পাবলিক সার্ভিসেস এবং রিক্রিয়েশন কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। পার্ক, খেলার মাঠ প্রভৃতি এই কমিটির হাতে।

(১৩) রুল কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। অর্ডিনান্স বলে ছোটখাট কাজ পরিচালনার জন্য নিয়ম বা রুল তৈরি করিতে হয়। উহা এই কমিটির কাজ। আইন, অর্ডিনান্স এবং রুল তিনটির জন্য ইঁহারা তিনটি আলাদা কমিটি তৈরি করিয়াছেন।

(১৪) Urban Redevelopment, Rehabilitation and Renewal কমিটি। সহরের ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর এলাকাগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী, পার্ক ও রাস্তা তৈরি হইতেছে। ডয়েল উহার ভারপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। বিরাট মানচিত্রের উপর নূতন কাজের প্রতিটি ধাপ আঁকা আছে। উহার সাহায্যে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। শৈবাল গুপ্ত কলিকাতার বস্তি ভাঙ্গিয়া ভাল রাস্তা এবং বাড়ীর যে প্লান তৈরি করিয়াছিলেন নীতির দিক হইতে ইহা প্রায় সেইরূপ।

সহর শাসনে মেয়রকে সাহায্য করিবার জন্য একটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস বোর্ড এবং একটি পাবলিক সেফটি কমিশন আছে। এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস বোর্ডের সভ্য এই কয়জন :

(১) ডিরেক্টর অফ এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস,
(২) পার্সোনেল সুপারভাইজার,
(৩) বাজেট সুপারভাইজার,
(৪) অডিটার,
(৫) কালেকটার ট্রেজারার,
(৬) অ্যাসেসমেণ্ট কমিশনার,
(৭) মাল ক্রয়ের এজেণ্ট।

পাবলিক সেফটি কমিশনের সদস্য :

(১) ডিরেক্টর অফ এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস,
(২) বিলডিং কমিশনার,
(৩) সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টর,
(৪) আগুন কমিশনার,
(৫) স্বাস্থ্য কমিশনার,

(৬) পুলিশ কমিশনার,

(৭) পাবলিক ওয়ার্কস কমিশনার,

(৮) ট্রাফিক কমিশনার,

(৯) স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,

(১০) মেট্রোপলিটান যানবাহন অথরিটির জেনারেল ম্যানেজার।

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা তিন স্তরে বিভক্ত—কেন্দ্র, প্রদেশ এবং নগর। কেন্দ্রে প্রেসিডেণ্ট, প্রদেশে গবর্ণর এবং নগরে মেয়র নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনজনেই নির্ব্বাচিত। ছোট সহরে সিটি ম্যানেজার হইতেছেন প্রধান একজিকিউটিভ।

আমেরিকায় মিউনিসিপালিটি পরিচালনার বিশেষত্ব এই যে, উহাকে তাহারা সিটি গবর্ণমেণ্টে পরিণত করিয়াছে। পুলিশ বড় সহরে মেয়র, এবং ছোট সহরে সিটি ম্যানেজারের হাতে। যাহাকে ক্ষমতা দিয়াছে দায়িত্বও তাহারই উপর চাপাইয়া রাখিয়াছে। মেয়র এবং সিটি ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য কাউন্সিল এবং এবং কমিটি আছে কিন্তু কমিটির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সরিয়া পড়ার উপায় নাই। মেয়র বা সিটি ম্যানেজারের কার্য্যকাল সংক্ষিপ্ত, দুই, তিন বা বড় জোর চার বৎসর। এরা নির্ব্বাচিত লোক। ভোটদাতারা জানে যে, এদের উপর তাহারা সহরের শাসন এবং মিউনিসিপাল উভয়বিধ ক্ষমতা দান করিতেছে। ভোটদাতারা অনেক বেশী সজাগ বলিয়া মেয়র এবং সিটি ম্যানেজারকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। তার উপর সিটি গবর্ণমেণ্টের দোষে কোন নাগরিকের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব আরও কঠোর করিয়া দিয়াছে।

আমাদের কর্পোরেশনে মেয়র সাক্ষীগোপাল মাত্র। কাউন্সিলারেরা তাঁহাদের দুর্নীতি এবং অযোগ্যতা অনায়াসে চালাইতে পারেন। বলিলেই হইল—কমিটি করিয়াছে বা কমিটি করে নাই, আমি কি করিব?

আমাদের কর্পোরেশনের কমিটিতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমেরিকায় প্রতিনিধি সভা ও সিনেটের কমিটি হইতে সুরু করিয়া সিটি কাউন্সিল ও কমিটিতে সাংবাদিকদের অবাধ প্রবেশাধিকার। বোষ্টন সিটি কাউন্সিলের একটি সুপ্রশস্ত ঘর শুধু রিপোর্টারদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক রিপোর্টারের আলাদা টেলিফোন। বোষ্টন হেরাল্ড, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার

এবং গ্লোবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ হইল। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটিতে গোপনতার কালো পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া রেওয়াজ হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের সংবাদ সংগ্রহেও নানারূপ বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। কর্পোরেশনের কমিটিতে সাংবাদিকের প্রবেশ নিষেধ। আমেরিকায় সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

ডয়েল কাউন্সিল চেম্বারে নিয়া গেলেন। ঘরের ভিতরে জাতীয় পতাকা। প্রার্থনার জন্য পাদ্রীর বেদী। চেয়ারম্যানের মঞ্চ ও চেয়ার। কাউন্সিলারদের জন্য দশটি চেয়ার এবং প্রত্যেক চেয়ারের সামনে একটি টেবিল। ডয়েল বলিলেন—দশজন কাউন্সিলার উপস্থিত থাকিলেও দশটি চেয়ারের একটি সর্ব্বদা খালি থাকে।

বলিলাম—বুঝিয়াছি। এদেরই একজন তো চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি চেয়ারম্যানের মঞ্চে বসিলে একটি কাউন্সিলারের আসন শূন্য থাকিবেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—পাদ্রীর মঞ্চ কেন?

—কাউন্সিলের প্রতিটি অধিবেশন আরম্ভ হইবার আগে সিটি কাউন্সিলের চ্যাপলেইন প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনা কিরূপ হয় তার একটি নমুনা নিলাম। সেখানে গিয়েছিলাম ১৩ই অক্টোবর। ১৮ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনার রিপোর্ট:

(হে মহান দয়াময় ঈশ্বর। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা কখনও বঞ্চিত হই না। আমাদের দেশের মধ্যে এখন এক মহা সঙ্কটকাল দেখা দিয়াছে, জীবন সম্বন্ধে মানুষের মনে তীব্র সন্দেহ এবং উদ্বেগ জাগিয়াছে, আমাদের পদক্ষেপ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, এই সন্ধিক্ষণে আমরা বিনীত বিশ্বাসের সঙ্গে তোমারই দিকে তাকাই। আজ এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া আমরা আমাদিগকে তোমার এবং নগরবাসীর সেবায় উৎসর্গ করি। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু সৎ, যেন ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহা তোমার ও নগরবাসীর সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি। আমাদের স্বাধীনতা, শান্তি, এবং সম্পদ সকলের জন্য তুমি রক্ষা কর। আমাদের কর্ত্তব্য পালনে যে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রয়োজন, জনসেবায় যে সাহস আবশ্যক তাহা লাভের উপযুক্ত উদার উন্মুক্ত দৃষ্টি তুমি আমাদের দাও। তোমার আশীর্ব্বাদ যেন আমরা অর্জ্জন করিতে পারি।)

সিটি কাউন্সিল হইতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—নাম সিটি

রেকর্ড। উহার ৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় এই প্রার্থনার রিপোর্ট রহিয়াছে। পত্রিকাটি নিতে পারি কি না—জিজ্ঞাসা করিলে ডয়েস সানন্দে সম্মতি দিলেন। সিটি কাউন্সিলের প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্ণ বিবরণ উহাতে প্রকাশিত হয়। মূলনীতি সেই এক —আমাদের কাজ সবাই দেখুক, সবাই জানুক।

প্রার্থনাটি এত সুন্দর যে, উহার প্রকৃত অনুবাদ করিতে পারিলাম না। সেই সময়ে আকাশে এটম বোমা বিস্ফোরণ চলিয়াছে। সারা বিশ্বে এক অজ্ঞাত আতঙ্কের ছায়া। তারই পটভূমিকায় এই প্রার্থনা।

ভাবিতেছিলাম—এরা বস্তুতন্ত্রবাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী। আমাদের সেকুলার রাষ্ট্রের স্কুল কলেজ বা জনপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রার্থনার পর হয় পতাকা অভিবাদন, তার পরে কাজ আরম্ভ।

সিটি রেকর্ডের প্রতিটি সংখ্যা দেখিলে বোঝা যায় কাউন্সিলের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য এদের কি আগ্রহ। নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ বা পুরাণো বাড়ীর অদলবদলের যতগুলি পারমিট এক সপ্তাহে দেওয়া হয় তার প্রত্যেকটির মালিকের নাম, ঠিকানা, ওয়ার্ড নম্বর এবং খরচের অঙ্ক প্রকাশ করা হয়। যথা :

Alterations :

নাম	ঠিকানা	ওয়ার্ড	খরচ ডলার
এফ. সয়ার	৩১৯ ডার্টমুথ ষ্ট্রীট	৫	৫০০০
ডব্লিউ. বফোর্ড	১৩৭ হাওয়ার্ড এভিনিউ	১৩	৩০০০
এ. বাগলি	৩৩ গ্রেনভেল ষ্ট্রীট	১৫	৭২৩

নূতন বাড়ী :

সি. মিকুনাজ	৩৬ মিল ষ্ট্রীট	১৬	১১,০০০

Buildings Demolished :

এফ. বাস্কট	১১০ পশ্চিম সপ্তম ষ্ট্রীট	৬	৬৮৫

ট্যাক্স সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা। যাহাদের ট্যাক্স মকুব করা বা কমানো হয় তাহাদেরও নাম ঠিকানা ও অঙ্ক প্রকাশ করা হয়। যথা :

নাম	ঠিকানা	ট্যাক্স (ডলার)	মকুবের অঙ্ক
আইরিণ মিলার	১০৯ ব্লু হিল	১৫৮১	৪৬৫
জেরি কাপোন	৬ এবট ষ্ট্রীট	১১১৬	৯৩
চার্লস ইনিস	৫৩ ষ্টেট	১৫১'০৫	১০০'৭০
বিলোদ বলবিয়ারিং	২৬ ফরসাইথ	১৭২'০৪	১৭২'০৪

এই তালিকায় আরও একটি সংবাদ জানানো হয়। ট্যাক্স মকুবের পাঁচটি কারণ হইতে পারে :

(১) আপীল ট্যাক্স বোর্ডের সালিশী (Settlement),

(২) আপীল ট্যাক্স বোর্ডের সিদ্ধান্ত,

(৩) অ্যাসেসার বোর্ডের overvaluation settlement,

(৪) বেআইনি অ্যাসেসমেণ্ট,

(৫) দুইবার অ্যাসেসমেণ্ট।

নামের পাশে *, †, ‡, ¶ এবং § চিহ্ন দিয়া উপরোক্ত পাঁচটির কোন্‌টি কোন্ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়। উপরের তালিকায় চার্লস ইনিস এবং বিলোদ বলবিয়ারিং-এর এ্যাসেসমেণ্ট বেআইনি হইয়াছিল।

প্রতিটি নূতন নিয়োগ, ছুটি, বদলী প্রভৃতি প্রতি সপ্তাহের সিটি রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়।

কণ্ট্রাক্ট দুই রকমে দেওয়া হয়—কতকগুলি যথারীতি টেণ্ডার ডাকিয়া দেওয়া হয় ; আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে মেয়র নিজে কণ্ট্রাক্টর ঠিক করেন। যে টেণ্ডার-দাতাকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে,তার নাম ঠিকানা এবং কণ্ট্রাক্টের পূর্ণ বিবরণ সিটি রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। বিনা বিজ্ঞাপনে মেয়র যে সব টেণ্ডার দেন তারও বিবরণ তো প্রকাশিত হয়ই, মেয়র কেন টেণ্ডার না ডাকিয়া কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন তার কারণও সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ কণ্ট্রাক্ট বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে বিলডিং কমিশনারের যে পত্রালাপ হয় তার সমস্ত চিঠি সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয়।

শুধু তাই নয়, প্লাম্বিং পারমিট, গ্যাস ফিটিং পারমিট যাদের দেওয়া হয় তাদেরও নাম ঠিকানা এবং কত টাকার পারমিট তাহা প্রকাশ করা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনে যখন কাউন্সিলার ছিলাম তখন কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে ঠিক এই জিনিষগুলি প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাড়ীর

ভ্যালুয়েসন প্রকাশ খানিকটা করানো গিয়াছিল কিন্তু তাহা এত অসম্পূর্ণ ছিল যে, কোন কাজের হয় নাই।

সিটি হলে কাউন্সিলারদের প্রত্যেকের আলাদা ঘর। প্রত্যেকের নিজস্ব সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট প্রভৃতি। ঘর বেশ বড়। কাউন্সিলার আয়ানেলা এবং আর একজন কাউন্সিলারের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম যতদূর মনে পড়িতেছে বোধ হয়—কেরিগান। প্রত্যেকেরই ভারত সম্বন্ধে বেশ ভাল জ্ঞান আছে।

ডয়েল এবং ডেভাইন মেয়রের ঘরে নিয়া গেলেন। প্রথমে একটি ঘর—বাইরে লেখা 'প্রাইভেট'। সেটিতে বসেন মেয়রের প্রধান প্রাইভেট সেক্রেটারী। সেই ঘর পার হইয়া আর একটি ঘর, তার দরজায় লেখা—Strictly private। সেটি মেয়রের নিজস্ব ঘর। তখন মেয়র ছিলেন কলিন্স। যে সব উপহার তিনি পাইয়াছেন সমস্ত সেই ঘরে সাজানো। মেয়র একটি বই উপহার দিলেন। বইটির নাম—'Boston : A Topographical History…By Walter Muir Whitehall. বইটিতে লিখিয়া দিলেন—Best Wishes to Debajyoti Burman. John F. Collins. Mayor of Boston, Oct 1961..

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার

আমেরিকার অসংখ্য পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে দুইটি—নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার। নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিদিন ৪৮ পৃষ্ঠা, দাম পাঁচ সেণ্ট। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার ১২ পৃষ্ঠা, দাম দশ সেণ্ট। এই দুটি পত্রিকা সাংবাদিকতার মূল সূত্র মানিয়া চলে—All the news not fit to print। খুন, ডাকাতি, ডাইভোর্স প্রভৃতির সংবাদ এরা দিলেও খুব ছোট করিয়া দেয়। পৃথিবীর কোথায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন হইতেছে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা এবং চিন্তাজগতে কোথায় কোন্ নূতন ভাবধারা দেখা দিতেছে তাহার সংবাদ এরা সুন্দর ভাবে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে দেয়। কমন মার্কেট সম্বন্ধে অনেকগুলি অস্পষ্ট ধারণা মণিটারের প্রবন্ধ পড়িয়া পরিষ্কার হইল। আমেরিকান এডুকেশন এসোসিয়েসনের রিসার্চ্চ ডিরেক্টর ডাঃ ল্যাম্বার্টের বক্তৃতার রিপোর্ট এই পত্রিকাতেই পাইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় লিখিয়া দিলাম।

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার অফিসে গেলাম। বোষ্টন সহরের কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড বাড়ী। আট তলা বাড়ী, বোধ হয় এক ফার্লং লম্বা হইবে। প্রথমে গেলাম তাঁদের পাবলিকেসন বিভাগের মিঃ হোগলাণ্ডের কাছে। তিনি সঙ্গে নিয়া পৌঁছিয়া দিলেন মণিটার সম্পাদক আরউইন কানহামের ঘরে। আমেরিকার সাংবাদিক জগতে এবং রেডিও Commentator রূপে কানহাম সুপরিচিত। মণিটারের কথা অনেক আগেই জানিতাম। মাঝে মাঝে কলিকাতায় পড়িতাম, নিয়মিত পাইতাম না। বোষ্টনে যে হোটেলে ছিলাম তার সামনেই ছিল ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স রিডিং রুম। আমেরিকার প্রত্যেক বড় সহরে এরূপ রিডিং রুম দেখিয়াছি। মণিটার সব ষ্টলে পাওয়া যায় না, সুতরাং যে সহরেই যাইতাম সেখানে তাদের রিডিং রুম খুঁজিয়া পত্রিকা আনিতাম। বোষ্টন রিডিং রুমের চার্জ্জে ছিলেন একজন প্রবীণ আমেরিকান। তাঁর নিকট কানহামের কথা জানিয়া নিলাম। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারের প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি এবং উহার

সম্পাদক কানহাম দুজনেরই জীবনকথা উপন্যাসের মত চমকপ্রদ। আট বৎসর বয়সে কানহামের সাংবাদিক জীবন আরম্ভ। পিতা ছিলেন একটি ছোট মফঃস্বল দৈনিকের সংবাদদাতা। বাড়ীর দেয়ালে একটি টেলিফোন ছিল। আট বৎসর বয়সে কানহাম একটি চেয়ারে চড়িয়া সেই টেলিফোন ধরিতেন এবং গ্রামের প্রবীণ গৃহিনীদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পিতাকে বলিতেন। কিছুদিন বাদে তাঁর পিতা একটি ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্কুলের পর কানহাম বুধ এবং বৃহস্পতিবার উহার পাতা ভাঁজ করিতেন এবং রাস্তায় পত্রিকাটি বিক্রী করিতে যাইতেন। বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তিনি পুরাদস্তুর রিপোর্টার এবং প্রুফরীডার। লেখাপড়া কিন্তু চলিতেছে। কলেজে ঢুকিয়াই বিতর্কে যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। অক্সফোর্ড হইতে একদল ছাত্র আমেরিকায় তর্ক সভা করিতে আসিয়াছিল। কানহাম তাহাতে তর্ক করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

১৯২৫-এ কানহাম মণিটারে রিপোর্টার হইয়া ঢুকিলেন। তিন বছরের ছুটি নিয়া পড়িতে গেলেন অক্সফোর্ডে। কলেজ যখন ছুটি থাকিত তখন জেনেভার লীগ অফ নেশন্সের বৈঠকে মণিটারের সহকারী সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করিতেন। ১৯৩৯-এ কানহাম মণিটারের বার্ত্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পাইলেন, ১৯৪১-এ সম্পাদক হইলেন। মণিটারের ৫৩ বছরের জীবনের ৩৬ বৎসর কানহাম তার সঙ্গে জড়িত।

মণিটার প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি-র জীবন আরও অদ্ভুত। দৈনিক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার তিনি যখন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর বয়স ৮৮। এঁদের রিডিং রুমে মহিলার জীবনী আছে, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন তাঁর বয়স ৪৫ তখন একদিন বরফের উপর পড়িয়া গিয়া আহত হন। ১৮২১-এ তাঁর জন্ম, ১৮৬৬-তে এই ঘটনা। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—আঘাত ভিতরে হইয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বের শেষকৃত্য করিতে পাদ্রী ডাকা হইল। তিনি পাদ্রীর নিকট হইতে বাইবেল চাহিয়া নিলেন এবং তাঁহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। বাইবেলের ভিতর তিনি এক আশ্চর্য্য বাণী খুঁজিয়া পাইলেন। কে যেন তাঁহাকে বলিল—জীবন নিঃশ্বাস নয়, হৃদস্পন্দন নয়, জড়পদার্থ নয়, অবয়বও নয়। জীবন শাশ্বত, জীবনই ঈশ্বর। পরে তিনি লিখিয়াছেন ঈশ্বর বা জীবন এক, কারণও এক, কার্য্যও এক; ঈশ্বর রোগ সৃষ্টি করেন নাই। জীবনের উৎস এক ঈশ্বর—এই

Emerson : The true meaning of Spiritual is real ; that law which executes itself, which works without means, and which cannot be conceived as not existing.

Eddy : Spirit is the real and eternal ; matter is the unreal and temporal.

বোষ্টনে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ পাঠচক্রে ইমার্সনের আর্ণ্টির যোগদান এবং ইমার্সনের রচনায় তাঁর প্রভাব সর্ব্বজনস্বীকৃত। এডির উপর ইমার্সনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বেদান্তের শাশ্বত বাণীর সঙ্গে এডির যোগসূত্র নিঃসন্দেহ।

নব মতবাদ প্রচারে এডিকেও যথারীতি লাঞ্ছনা, অপমান ও অবজ্ঞা সহিতে হইয়াছে। তবু তিনি দমেন নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দিয়াছিলেন। তাঁর সাফল্য তিনি নিজে দেখিয়া গিয়াছেন।

বইখানা শেষ হওয়ার পর আর একবার কানহামের সঙ্গে দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিজলি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় জানেন না, এডির অনেক কথার তাৎপর্য্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। কানহামের মারফৎ বিজলির সঙ্গে দেখা করিতে পারিলে ভাল হইত।

সময় ছিল না। পরদিনই বোষ্টন ছাড়িতে হইবে। এই পত্রিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে যোগ আমাদের থাকা উচিত ছিল তাহা আমরা রাখি নাই।

পাবলিক লাইব্রেরী

বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরী আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী। উহার পুস্তক সংখ্যা ২২ লক্ষ। খরচ হয় বার্ষিক ৩২ লক্ষ ডলার বা দেড় কোটি টাকা। ২০ লক্ষের বেশী বই আছে এরূপ অনেক লাইব্রেরী আমেরিকাতে আছে। লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের বই ও পুস্তিকার সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লক্ষ। নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে বই আছে সার্কুলেসনে ২৯ লক্ষ এবং রেফারেন্স সেকসনে ৪০ লক্ষ। চিকাগো পাবলিক লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা ২৫ লক্ষ। ওহিও প্রদেশের ক্লিভলাণ্ড লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৩০ লক্ষ। লস এঞ্জেলসের পাবলিক লাইব্রেরীতে বই আছে ২৭ লক্ষ। ফিলাডেলফিয়া লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ২০ লক্ষ। ক্লিভলাণ্ড এবং লস এঞ্জেলস ছাড়া অন্য লাইব্রেরীগুলি দেখিয়াছি।

বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর রিডিং রুম দোতালায়। সিঁড়ি দুই ভাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং বামদিকে জিন্না ও ডানদিকে আয়ুব খাঁকে কুর্ণিশ করিয়া উঠিতে হয়। সিঁড়ি যেখানে বামদিকে মোড় নিয়াছে সেখানে দেখি একটি শো কেস, তার মধ্যে জিন্নার ছবি এবং পাকিস্থানী কতকগুলি প্রচার পুস্তিকা। দোতলায় লাইব্রেরী হলের প্রধান প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে তিনটি করিয়া শো কেস। তাহাতেও পাকিস্থানী বই। সিঁড়ির ডানদিকে তাকাইয়া দেখি সেখানেও মোড়ের উপর একটি শো কেস। নামিয়া গিয়া দেখিলাম ঐ শো কেসও পাকিস্থানের এবং উহাতে রহিয়াছে আয়ুব খাঁর ছবি।

হলে ঢুকিয়া প্রথমেই বই দেওয়ার কাউন্টার। তার ঠিক পিছনে একটি ডায়াসের উপর এক প্রবীণ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পরণে পুলিশের ইউনিফর্ম্ম। ভাবিলাম—কি ব্যাপার? এদের লাইব্রেরীতে পুলিশ? ভদ্রলোকের কাছে গিয়া দেখিলাম যাহা ভাবিয়াছি তাই, কাঁধে লেখা—পুলিশ। বুঝিলাম—এরা সামাজিক ব্যবহারের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছে, সাধারণ সততা অনেক বাড়াইয়াছে কিন্তু বোধ হয় লাইব্রেরীতে বইয়ের পাতা কাটা প্রভৃতি এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে পারে নাই। লাইব্রেরী হলের ভিতরে পুলিশ বসাইয়া রাখিয়াছে।

তবে অফিসারটি বেশ বয়স্ক এবং তাঁর চেহারায় এমন একটি গাম্ভীর্য্য এবং শালীনতা রহিয়াছে যে, লাইব্রেরী কক্ষে তাহা বেমানান হয় নাই। সামাজিক পাপ নিবারণে এরা বদ্ধপরিকর এবং তার জন্য যে কোনরূপ চেষ্টা নেতারা করিলে সাধারণ লোক তাহা মানিয়া নেয়। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বইয়ের পাতা কাটা বহুদিনের রোগ এবং এই রোগ আজও দূর করা যায় নাই। আমাদের লাইব্রেরীতে পুলিশ অফিসার মোতায়েন করিলে কি ঘটিবে ভাবিতে লাগিলাম। আমাদের দৌড় হইতেছে খবরের কাগজে চিঠি।

ক্যাটালগের ঘরে গেলাম। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের ঘরের চেয়ে অনেক বড় ঘর এবং তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী ক্যাবিনেট। এই লাইব্রেরীতে একটি বহু মূল্য বইয়ের সন্ধান পাইলাম। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাব্রাল নামে এক পর্টুগীজ ব্রেজিল আবিষ্কারের পর ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসিয়াছিলেন। সেখানে আরব বণিক এবং দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অমূল্য দলিল। বইটির প্রথম ইংরেজি সংস্করণ বোষ্টন লাইব্রেরীতে আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সংস্করণটি অনেক আধুনিক।

নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থা অন্যরূপ। সাধারণ রিডিং রুম বড়, কিন্তু ওরিয়েণ্টাল বা অন্য কোন বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিতে হইলে তার জন্য ছোট ঘর আছে। ক্যাটলগও বিষয় হিসাবে আলাদা করিয়া ছোট ঘরের সামনে রাখা আছে। ওরিয়েণ্টাল সেকসনে জনৈক ফরাসী লিখিত একখানি বই পাইলাম। উহাতে বহুদিনের একটি সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম। আমাদের তাজ, ফতেপুর সিকরি, লাল কেল্লা প্রভৃতি আজও অটুট রহিয়াছে। সেকালে সিমেণ্ট ছিল না। পাথরগুলি কোন্ জিনিষ দিয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছিল ইহা অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কেহই জবাব দিতে পারেন নাই। আরও বহু পুরাতন দেব মন্দিরগুলিতেই বা কি দিয়া পাথর জোড়া দিয়াছে, তাহাও জানিতে পারি নাই। এই ফরাসীর লেখা বিবরণে ঐ সিমেণ্টের ফরমূলা পাইলাম। উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় মিহি চুণের গুঁড়া, তৈল, চিনি এবং ডিমের সাদা অংশ ছিল এই সিমেণ্টের উপাদান। চুণ, সরিষার তেল ও গুড় আজও জলছাদ তৈরিতে দেয়, চুণ এবং চিনির প্রলেপ অতিশয় শক্ত হয়, এগুলি জানা কথা। কিন্তু ডিমের সাদা অংশ এই কাজে লাগে ইহা কখনও শুনি নাই।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডীন ক্রীমানকে এই ফরমুলার কথা বলিলে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ডিমের সাদা অংশ ব্যবহারের কথা আমি শুনিয়াছি, কিন্তু চিনি ও তেলের কথা আমি কখনো শুনি নাই।

ছোট ঘরটিতে আমরা অল্প কয়েকজন মাত্র পাঠক ছিলাম। লক্ষ্য করিলাম একটি জাপানী মহিলা ভারত সম্বন্ধে বই নিয়াছেন।

ওয়াশিংটনে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের বাড়ী দেখিলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। লাইব্রেরীর বাড়ী দুইটি ৬ একরের উপর। একটি বাড়ীতে শুধু ওরিয়েণ্টাল বই। দুই বাড়ী মিলিয়া মেঝের পরিমাপ (floor space) হইতেছে ৩৬ একর বা ১০৮ বিঘা। বইয়ের তাকগুলির মোট দৈর্ঘ্য ২৭০ মাইল। টমাস জেফারসনের নামে প্রধান রিডিং রুম। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস অর্থাৎ তাহাদের পার্লামেণ্টের সভ্যদের ব্যবহারের জন্য এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ১৮১৪ সালে মোট বইয়ের সংখ্যা হয় ৩০০০। ঐ বৎসর ইঙ্গ মার্কিন যুদ্ধে লাইব্রেরীটি পুড়িয়া যায়। পর বৎসর কংগ্রেস জেফারসনের লাইব্রেরীর ৬ হাজার বই কিনিয়া নেয়। প্রায় দেড় শত বৎসর পরে ঐ লাইব্রেরীতে বই হইয়াছে সওয়া কোটি। প্রধান বাড়ীটির স্থাপত্য এবং কারুকার্য্য দেখিবার জিনিষ।

ওরিয়েণ্টাল সেকসনে কয়েকটি বই চাহিলাম। তার মধ্যে একটি ছিল Ogilby প্রণীত Asia, the First Part। প্রকাশের তারিখ ১৬৭৩। বই পাইতে আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মতই সময় লাগে। ঠেলাগাড়ী করিয়া নির্দ্দিষ্ট সিটে বই দিয়া যায়। শ্লিপে সিট নম্বর দিতে হয়। উপরোক্ত বইটির শ্লিপ ফেরৎ আসিল। তাহাতে মন্তব্য Check full book number অর্থাৎ নম্বর ঠিক হয় নাই। আবার উঠিয়া কার্ড বাহির করিলাম। দেখিলাম যে নম্বর আছে তাহাই লিখিয়াছি। পাশে একটি তরুণী ক্যাটালগ দেখিতেছিল। মনে হইল পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রী হইবে। বলিলাম—আমাকে একটু সাহায্য করিবে? এদের যা দস্তুর, একগাল হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—নিশ্চয়। বলিলাম—দেখ তো, কার্ডে এই নম্বর আছে, আর এই বলিয়া শ্লিপ ফেরৎ দিয়াছে। ভুলটা কোথায় করিয়াছি? মেয়েটি দেখিয়া বলিল—না, কোন ভুল তো হয় নাই। এক কাজ কর। ট্রে খুলিয়া নিয়া কাউণ্টারে দেখাও। বলিলাম—কিছু বলিবে না তো? মেয়েটি হাসিয়া বলিল—না, আমরা তো তাই করি।

ট্রে বাহির করিয়া নিয়া কাউণ্টারে গেলাম। কাউণ্টারে অতি মিষ্টভাষী দুটি যুবক। তাহারা বলিল----এই নম্বরই তো বটে। আচ্ছা, ঐ কাউণ্টারে এরূপ অনুসন্ধানের উত্তর দেয়, তার কাছে ট্রে নিয়া যাও। গেলাম। সেখানে এক মহিলা। দেখিয়া বলিলেন—এটা কার্ডের নম্বর, বইয়ের নম্বর নয়। সম্ভবতঃ বইটা আমাদের নাই। সঠিক উত্তর তাঁর কাছে পাইলাম না। ট্রে যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম।

মনে পড়িল—আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রশ্নের উত্তর না পাইলে পাঠককে চটিয়া আগুন হইতে দেখিয়াছি এবং লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসকে দক্ষতার আদর্শ বলিয়া মানিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু ত্রুটি তাহাদেরও আছে। ত্রুটি সকলেরই থাকে। যে দেশের লোক ত্রুটি দূর করিতে যত্ন করে উন্নতির পথে তাহারাই অগ্রসর হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি ফাউণ্ডেশন

বিশ্বশান্তি ফাউণ্ডেশন (World Peace Foundation , নাম শুনিয়াছি ; তাহাদের প্রকাশিত বই ও জার্ণাল পড়িয়াছি। ফাউণ্ডেশনের অফিস বোষ্টনে অবস্থিত। সেখানে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ। ফাউণ্ডেশনের একজিকিউটিভ সেক্রেটারী আলফ্রেড হেরো বয়সে নবীন কিন্তু কয়েক মিনিট আলাপেই বুঝিলাম, তিনি পাণ্ডিত্যে প্রবীণ।

এডুইন গিন নামে একজন পাবলিশার ১৯১০-এ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। উহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি সুবিচার ও শুভেচ্ছার উন্নতি সাধন। এই কাজের জন্য এরা একটি পথ বাছিয়া নিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা লোকে যাহাতে সঠিক ভাবে বুঝিতে পারে তার উপযুক্ত বই পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এঁরা নিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারী তথ্য সমন্বিত বইয়ের একটি লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের এক প্রধান বিশেষত্ব।

ইণ্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেসন নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা এঁরা প্রকাশ করেন। জাতিসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলি, সিকিউরিটি কাউন্সিল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, আন্তর্জ্জাতিক আদালত প্রভৃতিতে তিন মাসে যে কাজ হইয়াছে তার এত সুন্দর সংক্ষিপ্তসার এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, এই একটি অধ্যায় মাত্র পড়িলেই গত তিন মাসের আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা যেন চোখের সামনে থাকে। ইহা ছাড়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডার, আন্তর্জ্জাতিক বিমান প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জ্জাতিক নৌ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থা, গ্যাট এবং নাটো, সেণ্টো প্রভৃতি চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানেরও তিন মাসের কার্য্যকলাপের সুন্দর বিবরণ উহাতে থাকে। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিন চারিটি বিশেষ ভাবে লিখিত প্রবন্ধও থাকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রিপোর্টের অংশ তো নিশ্চয়ই আপনাদের নিজেদের তৈরি করিতে হয়, কিন্তু অফিসে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি কি যথেষ্ট হয়, না বিশেষভাবে উহা লেখানোর ব্যবস্থা করিতে হয় ?

হেরো বলিলেন—ঠিকই বলিয়াছেন। ডাকে যে সব প্রবন্ধ আসে তার অধিংকাংশেরই মান খুব নীচু। অনেক সময় নিজেদের উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত লোক দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া আনিতে হয়।

আবার প্রশ্ন করিলাম—এশিয়া এবং আফ্রিকা হইতে যে সব প্রবন্ধ পান তাদের ষ্টাণ্ডার্ড কিরূপ ?

—ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা খারাপ বলিতে পারি না। তবে ঐ দুই মহাদেশ হইতে অত্যন্ত কম প্রবন্ধ আসে।

ফাউণ্ডেশন কি ভাবে গবেষণা করেন হেরো তার পরিচয় দিলেন। তিনি নিজে চারিটি বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন এবং বই লিখিয়াছেন :

(১) Americans in World Affairs.

(২) Mass Media and World Affairs.

(৩) Voluntary Organisations in World Affairs Communication.

(৪) Opinion Leaders in American Communities.

হেরোর বই চারিটি ছাড়া আরও তিনটি বই ফাউণ্ডেশন প্রকাশ করিয়াছেন :

(১) প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ণার্ড কোহেন লিখিত The Influence of Non-Governmental Groups on Foreign Policy Making.

(২) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ব্বার্ট কেলমান এবং বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ালটার হ্বাইস লিখিত Some Principles of Opinion and Attitude Change.

(৩) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউটের জর্জ্জ কোয়েলহো লিখিত Cross Cultural Contact and American Attitude toward World Affairs.

সবগুলি বইয়ের উদ্দেশ্য এক—Studies in citizen participation in International affairs অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের যোগদান সম্বন্ধে গবেষণা। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাসমূহ জানিবার আগ্রহ সমাজের কোন্ স্তরে কতটা হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে তথ্য প্রচারের বন্দোবস্ত কি ভাবে চলিয়াছে তাহা গবেষণার জন্য এদের অসীম আগ্রহ এবং উৎসাহ।

হেরো নিজের লেখা বইগুলি দিলেন। Mass Media and World

Affairs বইটির সূচী খুলিয়াই গবেষণার ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় পাইলাম। জ্ঞান বিস্তারের বাহনগুলিকে এরা চার ভাগ করিয়াছে: বই, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং রেডিও টেলিভিসন। ইহাদের শুধুমাত্র একটিতে সন্তুষ্ট থাকে এরূপ লোক খুব কম, সকলেই অল্পবিস্তর চারিটির দিকেই মনোযোগ দেয়, কোনটি কম কোনটি বেশী। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র একটির দিকে ঝুঁকিয়াছে, শুধু সংবাদপত্র, শুধু রেডিও বা শুধু টেলিভিসন নিয়া খুসী থাকে এ রকম লোকও আছে। যারা একটি নিয়া থাকে সেটির দিকে তারা যে খুব বেশী মনোযোগ দেয় তাহা নহে।

জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক গবেষণার অতিশয় খুঁটিনাটির দিকেও আমেরিকানরা কি ভাবে ঝুঁকিয়াছে তার অনেক পরিচয় আগেও পাইয়াছি, হেরোর সঙ্গে আলাপে তাহা আরও ভাল ভাবে জানিলাম। তাঁর নিজের গবেষণা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ফল তাঁর নিজের মুখে শুনিয়া আমিও খুসী হইলাম।

১৯৫৮ সালে আমেরিকাতে ৫০ কোটি বাঁধানো বই এবং ৫০ কোটি কাগজের মলাট বই বিক্রয় হইয়াছে। সব লোক কিন্তু বইয়ের ক্রেতা নয়, বই কেনে অল্প লোক। শিক্ষিত লোকদের শতকরা ১৬ জন সমগ্র বইয়ের শতকরা ৯০টি কিনিয়াছে। হেরো বলিলেন—১৯৪৫-এর অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে বইয়ের চাহিদা খুব বাড়িয়াছে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বই কিনিয়া অথবা লাইব্রেরী হইতে নিয়া পড়ার আগ্রহ খুব বেশী বাড়ে নাই। পাঠকের হিসাব নিয়া দেখা গিয়াছে শতকরা ১০ জন লোক মোট পাঠকের শতকরা ৭০ জন অর্থাৎ দেশের এক দশমাংশ লোকের বই পড়ার ঝোঁক খুব বেশী। আমাদের দেশে ম্যাট্রিক পাশের উপরে শিক্ষিত লোকের অর্থাৎ সিরিয়াস বই পড়িয়া বুঝিবার উপযুক্ত লোকসংখ্যা শতকরা একজন, এটা আর হেরোকে বলিলাম না। আমেরিকাতে এত জ্ঞানবিস্তারের পরেও শতকরা ৬৩ জন লোক বছরে একটির বেশী বই পড়ে না, এই সংবাদ একটু আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হইল। সিরিয়াস বই, জনপ্রিয় উপন্যাস, বাজে বই প্রভৃতি সমস্ত ধরিয়া এই হিসাব। একজন লোক যখন বেশী বই পড়িতে আরম্ভ করে তখন সিরিয়াস বইয়ের দিকেই ঝোঁকে।

যে লোক বছরে কুড়িখানা বই পড়ে তার বেলায় দেখা গিয়াছে অধিকাংশই হয় সিরিয়াস বই। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার ঝোঁক খুব বেশী। সব বিষয়ের ছাত্রছাত্রী, বিশেষতঃ আইন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা এবং

পাত্রীগিরির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার প্রবণতা সর্ব্বাধিক। ব্যবসায়ী, টেকনিসিয়ান এবং চাকুরিজীবীরা সাধারণতঃ গল্প উপন্যাসই পড়ে, সিরিয়াস বই তাহারা প্রায় পড়েই না। যে সব ব্যবসায়ী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে রত আছে তাহারাও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বই পড়িতে উৎসাহী হয় না। যে সব ব্যবসায়ী আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বই পড়ে তাহাদিগকে ব্যতিক্রম বলিয়া ধরা হয়। কলেজে যারা এই জাতীয় পড়া অভ্যাস করিয়াছে এবং ব্যবসায়ী জীবনে প্রবেশ করিয়াছে তারাই সিরিয়াস বই পড়ার অভ্যাসটা আর ছাড়িতে পারে নাই। মেয়েদের বয়স যত বাড়ে সিরিয়াস বই পড়িবার ঝোঁকও ততই বাড়িয়া চলে। হেরোর এই কথার প্রমাণ পরে পাইলাম ওয়াশিংটনে, লীগ অফ উইমেন্স ভোটার প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণ ওয়াশিংটন পর্ব্বে দিব। নৃতত্ত্ব এবং ধর্ম্ম হিসাবে জাতি বিভাগ করিলে দেখা যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সিরিয়াস বই পড়ে ইহুদী, সবচেয়ে কম পড়ে নিগ্রো।

যাহারা সিরিয়াস বই বেশী পড়ে তারা সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিসনে বেশী আগ্রহশীল হয় না। আবার সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন যারা ভালবাসে তারা সিরিয়াস বই বিশেষ পড়িতে চায় না। বছরে খুব কম বই এরা পড়ে।

আমেরিকায় অজস্র বিষয়ে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত সঙ্ঘের যারা নেতা তারা সিরিয়াস বই পড়িবেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত নব নব বিষয়ে গবেষণা হইতেছে তাহা জানা না থাকিলে এদের নেতৃত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়।

সবচেয়ে প্রচলিত সিরিয়াস বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জর্জ্জ কেনানের আমেরিকান ডিপ্লোম্যাসি, ডেভিড কয়েল-এর জাতিসঙ্ঘ এবং উহা কি ভাবে কাজ করে, ওয়ালটার রোষ্টোর সোভিয়েট সমাজের ডাইনামিক্স (গতিশীলতা), বার্ণার্ড পেয়ার্স-এর রাশিয়া, গিব-এর মুসলমানত্ব, ডেভিড শুব-এর লেনিন, লুই ফিশারের গান্ধী এবং জর্জ্জ অরওয়েলের অ্যানিমাল ফার্ম্ম। শেষের বইটি দশ লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়াছে। বাঁধানো বইয়ের দাম সাধারণতঃ পাঁচ ডলারের কম নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশী। কাগজের মলাটের দাম ৩৫ সেণ্ট হইতে আড়াই ডলার। খুব কঠিন বই দাম কম হইলেও বেশী বিক্রয় হয় না। যেমন রেম্ আরঁ-র সামগ্রিক যুদ্ধের এক শতাব্দী বইখানি ১০ হইতে ১৫ হাজারের বেশী বিক্রী হয় না। অধ্যাপকেরা যে সব বই ছাত্রদের পড়িতে বলেন তার কাগজের মলাট সংস্করণ থাকিলে উহার বিক্রয় খুব বাড়িয়া যায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হইলে দুজনে উঠিলাম। ফিরিয়া আসিয়া সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র নিয়া আলোচনা করিলাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে বিশ্বশান্তি ফেডারেশনের আগ্রহ কি অসীম এবং তার জন্য কি অক্লান্ত তাঁদের চেষ্টা, হেরোর সঙ্গে আলাপে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কতখানি সাহায্য করিতেছেন তাহারও পরিচয় পাইলাম। ইংলণ্ড, জাপান এবং রাশিয়াতেও এই চেষ্টা সমান আন্তরিকতার সঙ্গে সুরু হইয়াছে তাহার নিদর্শন বই এবং পত্রিকায় পাই ; মাঝে মাঝে ঐ সব দেশ হইতে আগত গবেষকদের নিকট হইতেও জানিতে পারি। আমাদের দেশে এখনও এই কাজ আরম্ভ হয় নাই। বিভিন্ন দেশ তো দূরের কথা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে যথার্থ এবং পর্য্যাপ্ত জ্ঞান লাভের চেষ্টা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন স্তরেই আরম্ভ হয় নাই। মাদ্রাজে কামরাজ নাদার মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর তামিল ব্রাহ্মণেরা সরকারী উচ্চপদ হইতে একরূপ বিতাড়িত হইয়াছে। তাহাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি এখন চাকুরিতে পদোন্নতির প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে ব্যবসা সংগঠনে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বাস পরিচালন ও অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যবসায়ে ইহারা সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে। আমরা তার কোন সংবাদ রাখি না। মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, গুজরাটে, উত্তর প্রদেশে ক্ষুদ্রশিল্প কিরূপ প্রাধান্য লাভ করিতেছে আমরা তার খবর জানি না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ কোথায় কিভাবে সংগঠিত হইতেছে তার নিদর্শন আমরা জানি না। আমাদের খবর আমরা নূতন করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পাই কালিফোর্ণিয়া বা চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ষ্টানফোর্ড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে বা বোষ্টনের এম. আই. টি.তে। আলফ্রেড হেরোর কাছে বসিয়া মনে হইতেছিল এরা সত্যিই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পৌঁছিয়াছে, আর আমরা এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে খাবি খাইতেছি। জ্ঞানের চারিটি বাহন—বই, পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং রেডিও আমাদের দেশেও আছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারে তার কতটা সদ্ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি ?

আমেরিকায় কত লোক সাময়িকপত্র পড়ে তার পরিচয় হেরো দিলেন। যাহারা কলেজে পড়িয়াছে, হয়ত সকলে পাশ করে নাই, তাহাদের শতকরা ৯০ জন অন্ততঃ একটি সাময়িক পত্র পড়ে ; অনেকে একাধিক পত্রিকা পড়ে। হাই স্কুল পাশ ছাত্রছাত্রীদের ৬৮ শতাংশ এবং যারা তার চেয়েও কম লেখাপড়া

শিখিয়াছে তাদের ৩৫ শতাংশ সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। গড়ে দুই তৃতীয়াংশ আমেরিকান সাময়িক পত্র পড়ে একথা বলা যাইতে পারে।

এই তথ্য কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে জানিতে চাহিয়া শুনিলাম যে, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, আন আরবারের ইনষ্টিটিউট অফ সোসাল রিসার্চ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছে। গবেষণার কয়েকটি বিষয়— Reaction to the Atomic Bomb and World Affairs, Public impact of Science in the Mass Media, Public use of the Library and of other Sources of Information, প্রভৃতি। সার্ভে রিসার্চ সেণ্টার কর্তৃক পরিচালিত একটি সর্ব্ব আমেরিকান স্যাম্পল সার্ভে দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ৬৬ শতাংশ সাময়িকপত্রের নিয়মিত পাঠক।

যাহাদের পয়সা হয় তাহারা সাময়িক পত্র পড়া বাড়ায় অথবা কমায় ইহা জানিতে চাহিয়া শুনিলাম যে, এ বিষয়েও গবেষণা হইয়াছে এবং জানা গিয়াছে যে, পয়সাওয়ালা লোকদের ৯০ শতাংশ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ের লোকদের ৪৮ শতাংশ সাময়িক পত্রের পাঠক। মনে পড়িল সত্যেন মজুমদারের একটি গল্প। এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন। নবনির্ম্মিত সুরম্য ভবন, চমৎকার আসবাবপত্র, যে দিকে তাকান চোখ জুড়াইয়া যায়। ভোজন পর্ব্বও খুব উৎকৃষ্ট ভাবেই সমাধা হইল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু গড়াইবার আগ্রহ সকলেরই হয়, সে সময়ে হাতের কাছে একটি বই বা পত্রিকাও লোকে চায়। বাড়ীর একটি ছেলেকে তিনি পড়িবার মত একটা কিছু আনিতে বলিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে হাতে করিয়া আনিল একটি পঞ্জিকা। ভাল ভাল বাঁধানো বই অনেক সময় বড় লোকেরা আলমারী সাজানোর জন্যও কেনে কিন্তু সাময়িক পত্র যাহারা রাখে তাহারা পড়ার জন্যই কেনে। এদের গবেষণার এই দিকটা খাঁটি সত্যি কথা।

কোন্ কোন্ স্তরের লোক বেশী পত্রিকা পড়ে জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম সব চেয়ে বেশী সাময়িক পত্র পড়ে কলেজের ছাত্রেরা। তার পরে আছে ক্রমান্বয়ে উকীল ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি পেশাজীবী লোক, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ লোক, সুদক্ষ শ্রমিক এবং মাঝারি দক্ষ শ্রমিক। সব চেয়ে কম সাময়িক পত্র পড়ে সাধারণ শ্রমিক, পরিচারক এবং চাষী। এর অবশ্য খানিকটা আমাদের সঙ্গে মেলে।

মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশী সাময়িক পত্র পড়ে তবে তাদের প্রিয় হইতেছে গল্প জাতীয় পত্রিকা, সিরিয়াস পত্রিকা ততটা প্রিয় নয়।

আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য সব চেয়ে বেশী খ্যাত পত্রিকা হইতেছে হার্পার ম্যাগাজিন, আটলান্টিক মাসিক, নিউজ উইক, টাইম এবং ইউ. এস. নিউজ এণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট। এদের প্রচার সংখ্যা ঃ

টাইম	২৫ লক্ষ
হার্পার	আড়াই লক্ষ
আটলান্টিক	পৌনে ৩ লক্ষ
নিউজ উইক	সাড়ে ১৪ লক্ষ
ইউ. এস. নিউজ	সাড়ে ১২ লক্ষ।

টাইম খুব জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মহলে উহার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পীসের ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্লেটিগের সঙ্গে আলোচনা কালে লক্ষ্য করিয়াছিলাম টাইমকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। নিউ ইয়র্কে টাইম এবং লাইফ অফিসে উহার সম্পাদকেরা মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম জনপ্রিয়তা রক্ষার উপযুক্ত সহজ ও সরলভাবে দেশীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

লুক এবং সাটারডে ইভনিং পোষ্ট এই দুটি জনপ্রিয় পত্রিকারও উল্লেখ হেরো করিলেন। সাটারডে ইভনিং পোষ্টের অফিস ফিলাডেলফিয়ায়। তাঁদের অফিসেও গিয়াছি এবং সম্পাদকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। এই পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য আগেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। Adventures of the Mind নামে একটি সিরিজ এই পত্রিকায় থাকে। সারা পৃথিবীর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব প্রতিভা কিভাবে বিকশিত হইতেছে তার পরিচয় দান এই সিরিজের উদ্দেশ্য। এবিষয়ে অনেক জিনিষ জ্ঞাতব্য আছে। উহা ফিলাডেলফিয়া পর্ব্বে বলিব।

আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ মাত্র। তথাপি তাহাদের নিকট আন্তর্জ্জাতিক তথ্য পৌঁছিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে এরা অতিশয় আগ্রহশীল। গ্রামের লোক পছন্দ করে এরূপ পত্রিকা প্রকাশে এরা উদ্যোগী হইয়াছে। ফার্ম্ম জর্ণাল নামে একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৩০ লক্ষ

হইয়াছে। কি ধরণের প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হয় তার সামান্য পরিচয় এই কয়টি শিরোনামায় পাওয়া যাইবে—(১) ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, (২) আন্তর্জ্জাতিক গম চুক্তি, (৩) ইউরোপকে সাহায্য দান বন্ধ করিলে চাষীদের উপর তার আঘাত পড়িবে, (৪) চল আমরা পাকিস্থান দেখিতে যাই, (৫) সোসালিষ্ট ইংলণ্ডের কৃষি। এখানেও পাকিস্থান ঢুকিয়া গিয়াছে, ভারত নিরুদ্দেশ।

আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে আমেরিকার কেন, সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ফরেন অ্যাফেয়ার্স (Foreign Affairs) ইহা সকলেই স্বীকার করে। নিউ ইয়র্ক সহরে এঁদের অফিসে গিয়াছি এবং সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই পত্রিকার পাঠক এবং গ্রাহক ইহা জানিয়া সম্পাদক খুব খুসী। নিউ রিপাবলিকেরও সমাদর শিক্ষিত সমাজ বেশী। আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকা দুটি—রীডার্স ডাইজেষ্ট, প্রচার সংখ্যা এক কোটি ২৬ লক্ষ এবং লাইফ প্রচার সংখ্যা ৬৮ লক্ষ।

দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার। হেরো বলিলেন—টাইমস এবং মণিটারে তফাৎ এই যে, কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতে বসিলে মণিটার তার পটভূমিকা দিয়া দেয়, তাহাতে বিষয়টি বুঝিতে সাহায্য হয়। নিউ ইয়র্ক টাইমসও তাহা দেয় কিন্তু মণিটারের লেখার একটি বৈশিষ্ট্য আছে ইহা নিজেও লক্ষ্য করিয়াছি। বিদেশী কোন পত্রিকা আমেরিকায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইকনমিষ্ট এবং মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সাপ্তাহিক সংস্করণ অনেক আসে। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানকে তাহারা মণিটারের সঙ্গে তুলনা করে। উহার ১৫ হাজার আমেরিকান গ্রাহক আছে।

রেডিও এবং টেলিভিসনের অধিকাংশই—শতকরা ৮৫ ভাগ—এখনও আনন্দদান এবং বিজ্ঞাপনে সীমাবদ্ধ। সিরিয়াস আলোচনা উহাতে খুব কম।

হেরো একথা স্বীকার করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন সাধারণতঃ লোকে বই এবং সমালোচনা প্রধান সাময়িক পত্র হইতে করিয়া থাকে। আর একটি বিষয়ের উপর তিনি খুব জোর দেন। তাহা হইতেছে সমান অথবা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা। আলোচনার উপর আমেরিকানরা যে কি ভয়ানক গুরুত্ব আরোপ করে তাহা প্রতি পদে অনুভব করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়, সাময়িক পত্র অফিস, ফাউণ্ডেশন বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান,

রেড ক্রস প্রভৃতি যেখানেই গিয়াছি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়াছে, প্রতিটি প্রশ্নের পিছনে দেখিয়াছি জানিবার আগ্রহ। তাহাদের ধারণা বা জ্ঞানের বাহিরে যখনই কথা বলিয়াছি তখন সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরাও বলিয়াছেন—আ—ই সী, আ—ই সী, আবার বলুন তো।

আমেরিকার শিক্ষিত সমাজের মনোভাবে দুইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রথমতঃ, এরা বুঝিতেছে যে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহিরে আসিলেই বিদ্যা শেষ হয় না। শিক্ষার ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে, সুতরাং পরে যাহারা পাশ করিবে তাহারা আরও বেশী জ্ঞান নিয়া আসিবে। উহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জীবন সংগ্রামে টিঁকিতে হইবে। এই ভয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি এদের ঝোঁক বাড়িয়া গিয়াছে। ড্রইং-রুম কনভারসেসন বা বৈঠকী আলোচনায় জ্ঞানবুদ্ধি শালীনতার স্ফূরণ এই কারণে অতিশয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকানরা বুঝিয়াছে আধুনিক যানবাহন এবং দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের যুগে কেহ কূপমণ্ডুক হইয়া বাঁচিতে পারিবে না। বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির সংবাদ সকলকেই অল্পবিস্তর রাখিতে হইবে।

হেরোর নিকট বিদায় নিয়া পথে বাহির হইলাম। পিছন ফিরিয়া একবার বাড়ীটির দিকে তাকাইলাম। ভাবিলাম, ছোট বাড়ী, কিন্তু কি উদার, কি বিশাল জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র বোষ্টনের এই ৪০ নম্বর মাউণ্ট ভার্ণন ষ্ট্রীট।

হাসপাতাল

আমেরিকার হাসপাতাল দেখিতে চাহিয়াছিলাম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মার্শাল (Marshall of the Alumnii) হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের হাসপাতাল দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গত বৎসর এই হাসপাতালের দেড়শতবার্ষিকী পালিত হইয়াছে। উহার নাম মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল, ১৮১১ সালে স্থাপিত। গত বৎসরে এই হাসপাতালের নাসাকর্ণ বিভাগের একজন চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

হাসপাতাল গেটে ট্যাক্সি পৌঁছিলে একজন মহিলা অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া গেলেন অফিসে। ডিরেক্টর ছিলেন না, একজন সহকারী ডিরেক্টরের ঘরে তিনি পৌঁছিয়া দিলেন। ভদ্রলোকের নাম লিখিয়া রাখি নাই, ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁর ঘরে সব সময় লোক আসা যাওয়া করিতেছে বলিয়া আমাকে নিয়া আর একটি ঘরে গেলেন। সেখানে নিরিবিলি বসিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি বিষয়ে কতটুকু জানিতে চাই।

বলিলাম—আমি চিকিৎসার টেকনিক অপেক্ষা হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা জানিতে বেশী উৎসুক। এখানে কি ধরণের রোগী আসে তাহাও জানিতে চাই।

—আমাদের এখানে রোগের মধ্যে কলেরা এবং বসন্ত একেবারে নাই। টাইফয়েড কদাচ হয়, উহা এখন আমাদের নিকট curiosity—অর্থাৎ একটি টাইফয়েড রোগী কখনও আসিলে হাসপাতালশুদ্ধ ডাক্তার ও ছাত্র তাহাকে দেখিতে আসে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শীতজনিত রোগ, চর্ম্মরোগ, দাঁতের রোগ প্রভৃতিই বেশী।

এদের মধ্যে চর্ম্মরোগ এবং দাঁতের রোগের প্রাদুর্ভাব এই কয়দিনেই চোখে পড়িয়াছে। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও দেখিয়াছি দাঁত সাধারণতঃ কালো এবং খারাপ। একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পাশ্চাত্য জাতিরা আহারের পর জল দিয়া মুখ ধোয় না। আগে তবু রুমালে মুখ মুছিত, এখন কাগজে মুখ ঘষে। রেস্তোরাঁয় কাপড়ের রুমাল উঠিয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র কাগজের রুমাল।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং মাসাচুসেটস্ জেনারেল হাসপাতালের সম্পর্ক বিষয়ে সহকারী ডিরেক্টর বলিলেন—আমরা অবাধ প্রতিযোগিতার (free com-

petition) কথা শুনি কিন্তু এই দুজনের মধ্যে রহিয়াছে অবাধ সহযোগিতা (free collaboration)। উভয়ের মধ্যে কোন লিখিত চুক্তি নাই কিন্তু দুজনেই দুজনের স্বার্থ বিষয়ে সমান সচেতন। অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেহ কাহারও ক্ষতি করিয়া নিজের ইচ্ছা খাটায় না।

এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন—হাসপাতাল প্রথম আরম্ভ হয় মাসাচুসেটসের বৃটিশ গভর্ণরের পরিত্যক্ত বাড়ীতে। ১৭৭৬-এ আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে এবং ১৮১১-তে হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। ভাগ্যিস ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন নাই —তোমাদের গবর্ণরের বাড়ীগুলি কি করিয়াছ ?

হাসপাতালটির পরিচালন পদ্ধতি একটু বিচিত্র। উহার পরিচালকমণ্ডলী একটি Self-perpetuating Corporation। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে একটি কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্যেরা যাবজ্জীবন সদস্য থাকেন। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে অন্য সদস্যেরা সেই শূন্য পদ পূরণ করেন। ইহাকে বলে Self-prepetuating Co-oporation। দৈনন্দিন কাজ পরিচালনের জন্য ১২ জনের একটি বোর্ড অফ ট্রাষ্টি আছে। এই বোর্ডের চারজনকে গবর্ণর মনোনীত করেন, অবশিষ্ট আটজন হাসপাতাল কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। কর্পোরেশনের অধিবেশন বছরে একবার মাত্র হয়। সার্জ্জারি, মেডিসিন, ডারমেটোলজি, ডেন্টিষ্ট্রি প্রভৃতি বারোটি চিকিৎসা বিভাগ আছে, এক একজন বিশিষ্ট ডাক্তার প্রত্যেকটির সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা। এঁরা কেবলমাত্র চিকিৎসায় সময় দেন, হাসপাতাল পরিচালনার কোন কাজে এঁদের নজর দিতে হয় না। তার জন্য আলাদা নার্সিং, সোসাল সার্ভিস, ডায়েটারি, ফার্ম্মেসি, বিলডিং সার্ভিস প্রভৃতি বিভাগ আছে এবং এই সমস্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে যাঁদের নিয়োগ করা হয় তাঁহারা সাধারণতঃ ডাক্তার হন না। হাসপাতালের প্রধান একজিকিউটিভ হইতেছেন জেনারেল ডিরেক্টর। তাঁর অধীনে থাকেন সাত জন সহকারী ডিরেক্টর। আমি যখন হাসপাতালটি দেখি তখন জেনারেল ডিরেক্টর ছিলেন ডাঃ ডীন ক্লার্ক— চিকিৎসক। তাঁর কার্য্যকাল তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নূতন ডিরেক্টরের সন্ধান চলিতেছে। এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন—এবার যিনি জেনারেল ডিরেক্টর আসিবেন তিনি সম্ভবতঃ ডাক্তার হইবেন না।

বলিলাম—সে কি কথা। হাসপাতাল পরিচালনার প্রাত্যহিক দায়িত্ব যাঁর, তিনি ডাক্তার না হইয়া বাহিরের লোক হইবেন ?

—আমরা সাত জন এসিসটান্ট ডিরেক্টর আছি, আমি একা ডাক্তার, বাকি ছয় জনই ডাক্তার নহেন।

—তবে তাঁরা কি ?

—দুই জন হোটেল ব্যবসায়ী, দুই জন সংবাদপত্র বিক্রয় ব্যবসায়ী, একজন ব্যাঙ্কার, একজন এটর্ণী এবং আমি ডাক্তার।

—এই ব্যবস্থা কেন ?

—আমরা মনে করি হাসপাতালের ডাক্তারদের রোগীর চিকিৎসার বাহিরে এক মিনিট সময় নষ্ট করা উচিত নয়। হাসপাতালে কত গজ ব্যাণ্ডেজ লাগিবে, কোন্ যন্ত্র বিকল হইয়াছে, বাড়ীটার কোথায় কি মেরামত করিতে হইবে সে সব দিকে ডাক্তারদের নজর দিতে হইবে কেন ?

সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ শিখিলাম। ডাক্তার এডমিনিষ্ট্রেটার হয় না, এটা আমেরিকানরা বুঝিয়া তার প্রতিকার করিয়াছে, আমাদের দেশে ডাক্তারেরা সর্ব্বক্ষেত্রে নাসিকা প্রবেশ করাইয়া একদিকে রোগীর প্রতি অবহেলা আর একদিকে দেশের অনিষ্ট সমানে করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের এডমিনিষ্ট্রেসনে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি নরক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—ডাক্তারেরা ভাল এডমিনিষ্ট্রেটার হইতে পারেন না এ রকম কোন ধারণা কি আপনাদের আছে ?

মৃদু হাসিয়া এসিসটান্ট ডিরেক্টর জবাব দিলেন—হাসপাতাল পরিচালনার কাজ আজকাল বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অনেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হাসপাতাল এডমিনিষ্ট্রেসন একটি আলাদা শিক্ষণীয় বিষয় করা হইয়াছে।

নন-ডাক্তার পরিচালিত হাসপাতালে নোবেল প্রাইজ আসে, আর ডাক্তার পরিচালিত হাসপাতালের রোগী হাসপাতাল হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে এক হাজার বেড। ১৯৬০ সালে ২৫ হাজার রোগী হাসপাতালে বেড নিয়া চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। ৪৫টি ক্লিনিক আছে, উহার প্রত্যেকটিতে দৈনিক প্রায় ৭৫০ জন রোগী আসে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে প্রতিদিন আসে প্রায় ১০০ লোক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুলের ৪৫০ ছাত্র এই হাসপাতালে শিক্ষা লাভ করে।

রোগীদের চিকিৎসা এবং পরিচর্য্যার জন্য কত লোক আছে তার যে জবাব পাইলাম তাহাতে চক্ষু স্থির হইবার উপক্রম। হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা ৫০০। ইনডোর এক হাজার এবং আউটডোর ১০ হাজার রোগীর জন্য ৫০০ ডাক্তার, অর্থাৎ প্রতি ২২ জনে একজন ডাক্তার। ডাক্তার বাদে আরও ৪০০০ লোক এই সমস্ত রোগীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছে। রেসিডেন্ট ডাক্তার ১৬০ জন। হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য বিপুল ব্যবস্থা রহিয়াছে। রিসার্চ্চ এবং ক্লিনিকাল ফেলো সংখ্যা ২০০। শুধু আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশ নহে, পৃথিবীর বহু দেশ হইতে এই হাসপাতালে গবেষণার জন্য লোক আসে। এখানে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আছে, উহাতে দ্রষ্টব্য বস্তু এক লক্ষ গুণ বাড়াইয়া দেখা যায়। শুনিলাম এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানুষের হাড় কি ভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয় তাহার গবেষণা চলিতেছে। মানুষের দেহে ক্যালসিয়াম কি ভাবে হাড় গঠন করিতে থাকে তাহা দেখা হইতেছে এবং এই গবেষণা শেষ হইলে শুধু যে ক্যালসিয়াম প্রয়োগ সম্বন্ধে নূতন তথ্য জানা যাইবে তাহা নহে, একটি সাধারণ রোগ hardening of the artery চিকিৎসারও উপায় হইবে। আর একজন গবেষক ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের দ্বারা মানবদেহের টিস্যু নিয়া গবেষণা করিতেছেন।

মাসাচুসেটস হাসপাতালের পুরাণো আমলের কয়েকটি গবেষণার বিষয় জানিতে চাহিলে এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন—আনেসথেসিয়া হিসাবে ইথারের প্রথম ব্যবহার এখানে ১৮৪৬ সালে হয়, এপেনডিসাইটিস রোগের কারণ ও চিকিৎসা এখানে প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৬ সালে, আমেরিকায় aseptic surgery এবং এক্স-রে ব্যবহার এখান হইতে আরম্ভ হয়, ১৯০৫ সালে এই হাসপাতাল পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মেডিকেল সোসাল সার্ভিস প্রবর্ত্তন করে।

স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর্ত্তের প্রতি কতখানি দরদ থাকিলে তবে ইহা সম্ভব হয়। এদের মত বাড়ী, এদের মত সরঞ্জাম, এদের মত টাকা আমাদের নাই একথা ঠিক। কিন্তু রোগীর প্রতি যে সহানুভূতি এবং প্রতিটি পয়সা সদ্ব্যবহারের যে নিষ্ঠা ও আগ্রহ এদের আছে সেটুকুও কি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না ?

এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন—এবার চলুন, হাসপাতালটা দেখবেন, পরে এসে আবার না হয় বসা যাবে।

মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে বছরে লোক আসে ২৫ হাজার। দৈনিক আসে প্রায় ৭৫ জন। সব সময়েই দু'জন মেডিকেল এবং দু'জন সার্জিকাল ডাক্তার ডিউটিতে থাকেন। তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে রেসিডেন্ট ডাক্তারদের যাহাকে যখন প্রয়োজন ডাকিয়া পাঠান। ভিজিটিং ডাক্তারদের মধ্যে দুইজন সাধারণ সার্জ্জন, দুইজন অর্থোপিডিক সার্জ্জন, দুইজন মেডিকেল ডাক্তার এবং অন্যান্য বিষয়ে কয়েকজন স্পেশালিষ্টকে প্রয়োজনমাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আনাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ডাক্তার এবং নার্সেরা কি যত্নের সঙ্গে প্রতিটি রোগী পরীক্ষা করিতেছে, কি সুন্দর তাদের ব্যবহার। নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ ভেদাভেদ নাই, সকলের প্রতি সমান মনোযোগ, সমান ভদ্রতা।

চার নম্বর ওয়ার্ড একটি নূতন জিনিষ। আমাদের দেশের কোন হাসপাতালে এই বস্তু নাই। এটি একাধারে হাসপাতালের ওয়ার্ড এবং গবেষণাগার। মেডিসিনের প্রধান অধ্যাপক এই ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। হাসপাতালে এমন রোগী আসে যার রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা হয়ত আশানুরূপ হয় নাই। এখানে রোগীদের অধিকাংশই শয্যাগত নয়, তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। এই ওয়ার্ডে শ্রেষ্ঠ নার্স, ডায়েটিসিয়ান, অকুপেসনাল থেরাপিষ্ট প্রভৃতিদের রাখা হয়। এখানকার রোগীদের কোন টাকা দিতে হয় না। এই ওয়ার্ডে আয় নাই অথচ ব্যয় অন্য সমস্ত ওয়ার্ড অপেক্ষা বেশী। গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটি এর অধিকাংশ খরচ দেয়, অন্য দাতাও আছে।

ভাঙ্গা হাত সারাইবার ওয়ার্ড আলাদা। এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বুঝাইয়া দিলেন—হাত, বিশেষ ভাবে ডান হাত মানুষের উপার্জ্জনের উপায়, এই হাতটি ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষের কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে জীবন্মৃত এবং পরনির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া গেলে কোনরূপ সময় নষ্ট না করিয়া হাত মেরামতে মন দিতে হয়। ইহার জন্য সাধারণ সার্জ্জন, অর্থোপিডিক সার্জ্জন, প্লাষ্টিক সার্জ্জন, রেডিওলজিষ্ট, রিহাবিলিটেসন স্পেশালিষ্ট, এমন কি নিউরোলজিক সার্জ্জন প্রয়োজন হয়। ওয়ার্ডটির বিশেষত্ব, রোগীকে এক ডাক্তার হইতে অন্য ডাক্তারের ঘরে দৌড় না করাইয়া তাহাকে এক জায়গায় রাখিয়া প্রয়োজনীয় ডাক্তারদের তার কাছে আনা হয়, যাহাতে হাত মেরামতের কাজে বিন্দুমাত্র সময় অনাবশ্যক নষ্ট না হয়। হাতভাঙ্গা রোগীকে ডাক্তারেরা

সকলে মিলিয়া একসঙ্গে পরীক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়া যায়।

ওয়ার্ডগুলি আমাদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ে ছোট। ছোট ওয়ার্ডে প্রত্যেক রোগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া যায় বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ঐগুলিকে ছোট করা হইয়াছে।

আউটডোরের ব্যবস্থাও সুন্দর। এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন—আগে সত্যিই এরা আউটডোর রোগী ছিল, দরজার বাইরে এদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। রোদ বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। আজকাল বসিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন আর এরা আউটডোর পেশেণ্ট নয়— আউট পেশেণ্ট।

পারিবারিক স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম হাসপাতালের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বোষ্টন সহরের যে সব বাড়ীতে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, হাসপাতাল হইতে সেখানে ডাক্তার পাঠানো হয়। এই কাজে মেডিকেল স্কুলের থার্ড ইয়ার ছাত্রদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শিশু এবং চিররোগী বৃদ্ধদের চিকিৎসা এই প্রোগ্রামে করা হয়। হাসপাতালে শিশু বিভাগ আছে এবং সেটি একটি দেখিবার জিনিষ। এদের নীতি হইতেছে এই যে, বাড়ীতে রাখিয়া যাহাদের চিকিৎসা চলে তাহাদের বাড়ীতেই রাখা ভাল, হাসপাতালে আনা হয় কঠিন এবং গুরুতর রোগাক্রান্তদের।

মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে, নাম ম্যাকলিন হাসপাতাল। সেখানে রোগীরা যে সব লোককে ভালবাসে, যাহাদের সংসর্গে ভাল থাকে, তাহাদের সান্নিধ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কতক রোগী সারাদিন বাইরে ঐ ধরণের লোকের সঙ্গে থাকে, রাত্রে থাকে হাসপাতালে; আবার কেহ বা সারাদিন হাসপাতালে থাকে, রাত্রে যায় প্রিয়জনদের বাড়ীতে। ইহাকে তাহারা বলে part time hospitalisation। এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন, এই বন্দোবস্তে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

ম্যাকলিন হাসপাতালের মধ্যে আস্ত একটি গ্রাম গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে যে সব মানসিক রোগী ভাল হইয়া উঠিতেছে তাহারা স্বাভাবিক পরিবেশে দ্রুত সুস্থ হইতে পারে। দেড় শতবার্ষিকী বৎসরে এই কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাকলিন হাসপাতালে প্রতিদিন প্রচুর আউটডোর রোগীও আসে। এটিকে বলা হয় Day Care Programme। শুনিলাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানসিক ব্যাধি হাসপাতালের অনুরূপ উন্নতি হইতেছে। কেবল আমরা এখনও পাগলা গারদ পর্য্যায়ের উপরে উঠিতে পারি নাই। মানসিক ব্যাধি নির্দ্ধারণের জন্য এরা দারুণ চেষ্টা করিতেছে। ম্যাকলিন হাসপাতালের কেবলমাত্র বায়োকেমিষ্ট্রি গবেষণাগারে গবেষণাকার্য্যে রত আছেন ১৬ জন এম-ডি এবং পি. এইচ. ডি. এবং তাঁহাদের টেকনিকাল এসিসটান্ট আছেন ১৪ জন। সম্প্রতি একটি বায়ো-ফিজিকাল ল্যাবরেটরী তৈরি হইয়াছে। কেবলমাত্র নিউরোলজি এবং সাইকোলজিতেই এরা গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখে নাই। দেড় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ম্যাকলিন হাসপাতালে একটি আলোচনা সভা বা সিমপোসিয়াম হইয়াছিল, আলোচ্য বিষয় ছিল—A Multi-Disciplinary Research Program in a Mental Hospital.

সার্জ্জিকাল ওয়ার্ড বুঝিতে হইলে একমাত্র এখানেই সাতদিন কাটানো দরকার। বুলফিঞ্চ বিলডিং-এ প্রথম ইথার আনেসথেসিয়ার সাহায্যে অপারেশন হইয়াছিল। আনেসথেসিয়া দিয়াছিলেন একজন ডেন্টিষ্ট। কান সম্বন্ধে গবেষণায় যিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তিনি ছিলেন টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার। এই হাসপাতালে সায়াটিকা রোগীর ruptured intervertebral disc অপসারিত করিয়া তাহাকে আরাম দেওয়ার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়। মস্তিষ্কের টিউমার অপসারণের সার্জ্জারিও এখানেই আরম্ভ হয়।

হাসপাতালে তিন রকমের ওয়ার্ড আছে—ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র হিসাবে আলাদা ওয়ার্ড। চিকিৎসা একই। ধনীদের দৈনিক ৪৫ ডলার বা ২২৫ টাকা চার্জ্জ করা হয়। মধ্যবিত্তদের অনেক কম এবং দরিদ্রদের চিকিৎসা বিনামূল্যে। মধ্যবিত্তেরা কতটা দিতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই হিসাবে আদায় করা হয়। পেনসিলভানিয়া জেনারেল হাসপাতালে রক্তে চিনির পরিমাণ পরীক্ষা করাইতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিল—কিছু চার্জ্জ দেওয়া কি সম্ভব হইবে?

—কত?

—তিন ডলার।

বলিলাম—আনন্দের সহিত দিব। কলিকাতায় ১৫ টাকায় এই পরীক্ষা করানো যায় না।

এসিসটাণ্ট ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র এই ভেদাভেদ আপনারা করেন কি ভাবে ?

—রোগীর আত্মীয়স্বজনদের পোষাক, চালচলন, গাড়ী প্রভৃতি দেখিয়া অনেকটা বোঝা যায়। তা ছাড়া সাধারণতঃ লোকে মিথ্যা বলে না। গবর্ণমেন্ট এবং মিউনিসিপালিটির গ্রাণ্ট ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া মধ্যবিত্ত পর্য্যন্ত চার্জ্জ কমাইয়া আনা হইতেছে। একজন রোগীর চিকিৎসার খরচ কত পড়ে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—দৈনিক প্রায় ৩৫ ডলারের মত পড়ে। হাসপাতালের আয় বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি ডলার বা সাড়ে সাত কোটি টাকা এবং ব্যয় পৌনে দুই কোটি ডলার বা পৌনে নয় কোটি টাকা। ঘাটতির টাকা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটির গ্রাণ্ট এবং ব্যক্তিগত দান হইতে উঠিয়া আসে। সার্জ্জারির নূতন ঘর নির্ম্মাণ দেড় শতবার্ষিকীর আর একটি কাজ। শুনিলাম সার্জ্জিকাল ওয়ার্ডে বেড অপেক্ষা অপারেসন থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন অনেক বেশী।

হাসপাতালে অবস্থা হইল এই যে, কোন্‌টি ছাড়ি কোন্‌টি দেখি। এক্স-রে ওয়ার্ড এক বিরাট ব্যাপার। শুনিলাম এখানে মানবদেহের প্রতিটি অংশের এক্স-রে করা হইতেছে। একটি যন্ত্রে ১২ লক্ষ ভোণ্ট এক্স-রে বীম পাওয়া যায়। আর একটি বসানো হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যায় ২০ লক্ষ ভোণ্ট। রোগ কি ভাবে আরম্ভ হয়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং টিশু কি ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয় এক্স-রে যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ২০ লক্ষ ভোণ্ট এক্স-রে যন্ত্রও যথেষ্ট মনে হইতেছে না, ৫০ লক্ষ ভোণ্ট যন্ত্র বসাইবার প্লান হইতেছে। কোবাণ্ট ইউনিটও বসাইয়াছে। দৈনিক ১০০ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। এখানকার Radiation Therapy and Research Centre একটি বিস্ময়কর বস্তু।

হাসপাতালের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি—আর্ত্তের সেবা, মেডিকেল শিক্ষা এবং গবেষণা। তিনটির দিকেই সমান দৃষ্টি। হাসপাতালের সাধারণ ষ্টাণ্ডার্ডের মাপকাঠির একটি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। এখানকার একটি হাউস সার্জ্জন বা ইণ্টার্ণ-এর পদ শূন্য হইলে যদি দশ জনের বেশী মেডিকেল ছাত্র উহার জন্য আবেদন না করে তাহা হইলেই কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন নিশ্চয়ই কোথাও কোন

গলদ ঘটিয়াছে যার জন্ত ছাত্রেরা এখানে আসিতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। হোলটাইম এবং ভিজিটিং দুই রকম ডাক্তারই এখানে আছেন।

মাসাচুসেটস হাসপাতালের ইণ্টার্ণরা বাহির হইয়া যখন অন্তত্র প্রাকটিস করিতে বসে তখন তাহাদের মর্য্যাদা হয় সকলের চেয়ে বেশী। এই ষ্টাণ্ডার্ড এরা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। এদের বৈভব আমাদের নাই, এদের মত এত বড় বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি আমাদের পাওয়া কঠিন, কিন্তু আর্ত্তের সেবার যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা এদের আছে সেটা কি আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি না? এককালে ওটা তো আমাদের ভালই ছিল। এই জিনিষটির পুনরুদ্ধার কি এতই কঠিন?

নিউ ইয়র্ক

বোষ্টন হইতে যাওয়ার কথা নিউ হেভেনে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৩ই হইতে ১৫ই অক্টোবর নিউ হেভেনের টাফ্‌ট হোটেলে ঘর রিজার্ভ করা ছিল। ডাঃ জন মিলারের সহিত সাক্ষাতের সময় স্থির হইয়াছে ১৪ই তারিখে। বোষ্টন হইতে নিউ হেভেন ঘণ্টাখানেকের পথ। ১২ই কলম্বস ডে ছুটি পড়ায় ১৩ই তারিখটা বোষ্টনে কাজে লাগাইতে চাহিলাম। নিউ হেভেনে ১৩ই কোন কাজ ছিল না। ১৪ই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া ১৫ই নিউ ইয়র্ক পৌঁছিবার কথা।

১২ই অক্টোবর টাফ্‌ট হোটেলকে চিঠি দিলাম—আমি ১৩ তারিখের পরিবর্ত্তে ১৪ই সকালে সেখানে পৌঁছিব। ১৩ই বিকালে বেয়ারিং পোষ্টে একটি টেলিগ্রাম পাইলাম—আমাদের সব জায়গা বিক্রী হইয়া গিয়াছে, আপনাকে ঘর দিতে পারিব না। আমেরিকায় বেয়ারিং টেলিগ্রাম পাঠানো যায়। প্রাপকের নিকট হইতে মাশুল আদায় হয়।

টেলিগ্রাম পাইয়া অবাক হইলাম। বোষ্টনে ছিলাম তুরাইন হোটেলে। উহার ম্যানেজারকে ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি বলিলেন—এটা খুব অন্যায় হইয়াছে। আপনার ১৩ই হইতে তিন দিনের জন্য ঘর রিজার্ভ করা আছে। এরা আপনাকে ১৩ই তারিখের ঘর ভাড়া চার্জ্জ করিতে পারিত। জায়গা দিতে পারিবে না একথা কি করিয়া বলে।

নিউ ইয়র্কে আমার হোটেল রিজার্ভেসন ১৫ই হইতে করা আছে। তার আগে সেখানে গেলে হয়ত সত্যিই জায়গা না থাকিতে পারে। ভাল হোটেলে যথেষ্ট আগে রিজার্ভ না করিলে জায়গা মিলে না এবং হোটেলে ঘর এবং বিছানা সাবান তোয়ালে প্রভৃতি ছাড়া আর কিছু দেয় না। তুরাইন হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন —আপনি তাহলে ১৪ই এখানে থাকিয়া ১৫ই সোজা নিউইয়র্ক যান। টাফ্‌ট হোটেল নিউ হেভেনের সবচেয়ে বড় হোটেল, তারাই যখন এরকম করিল তখন বিনা রিজার্ভেশনে নিউ ইয়র্ক যাওয়া ঠিক হইবে না।

টাফ্‌ট হোটেলের ঘটনা অনেককেই বলিয়াছি এবং সকলেই উহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ইলেকট্রিক ট্রেণ সর্ব্বত্র গড়ে ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতিতে চলে। বোষ্টন হইতে রওনা হইলাম। টিকিট ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত। টিকিটের মেয়াদ এক বছর। একটি ষ্টেশনে বাহিরের সিগনালে ট্রেণ পূরা আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিল। নিউ ইয়র্ক পৌঁছিল আধ ঘণ্টা লেট। ভাবিলাম—এদেরও তবে ট্রেণ লেট হয়।

আর একটি নূতনত্ব লক্ষ্য করিলাম। ট্রেণের সমস্ত যাত্রী প্লাটফর্ম্ম হইতে বাহিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত ট্রেণে চড়ার যাত্রী প্লাটফর্ম্মে ঢুকিতে দেয় না। একটু বেকায়দায় পড়িয়াই তথ্যটা শিখিলাম। প্লাটফর্ম্ম হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সঙ্গে সুটকেশ প্রায় আধ মণ ভারী। কুলি নাই। অতিকষ্টে আস্তে আস্তে ওটি নিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছি আর ভাবিতেছি ভাগ্যিস ডাঃ রবি চ্যাটার্জ্জি সামনে নাই, এমন সময় হুড় হুড় করিয়া যাত্রী সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিল। পরে বুঝিয়াছিলাম আমার উঠিবার জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া তার পর দরজা খুলিয়া দিয়াছে। আমি যে তাদের দেশে দেহাতি লোক এটা হয়ত বুঝিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারে নাই। যাত্রী স্রোত আর থামে না। এক মহিলা স্মিত হাস্যে বলিলেন—মাঝখানে আটকা পড়িয়াছ? (Caught in the middle ?)

সকলের নামা শেষ হইলে উঠিলাম। অবশেষে একজন কুলি পাইলাম। কুলি প্রায় সবই নিগ্রো, কিছু শ্বেতাঙ্গও আছে। সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোর্টারের ইউনিফর্ম্ম। কুলি ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিল। কুলিভাড়া ২৫ সেণ্ট বা পাঁচ সিকা।

জাতিসঙ্ঘের নিকটে টুডোর হোটেল। বিশ তলা বাড়ী। জাতিসঙ্ঘের বহু ডেলিগেট এবং তাঁহাদের সঙ্গোপাঙ্গ এখানে থাকেন। এদের ট্যাক্স ব্যবস্থায় একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। প্রতিটি জিনিষের উপর ট্যাক্স, মায় হোটেলের ঘরভাড়া, রেস্তোঁরায় খাওয়ার উপরেও। তবে এক ডলারের কম খাইলে ট্যাক্স নাই। প্রায় সবটাই প্রত্যক্ষ ট্যাক্স। হোটেল ভাড়া, খাওয়া, জিনিষ কেনা সব কিছুতেই ট্যাক্স আদায় হইতেছে। দোকানে বা রেস্তোঁরায় ক্যাশ মেমো লেখার সময় জিজ্ঞাসা করিত—আপনি কি ডিপ্লোম্যাট? বলিতাম—না। উত্তর পাওয়ার পর দেখিতাম ক্যাশ মেমো লেখা শেষ করে। একদিন দেখি টুডোর হোটেলের

রেস্তোঁরায় দুই জন নিগ্রোর সঙ্গে বচসা বাধিয়াছে। উহারা বলিতেছে—আমরা ডিপ্লোম্যাট। রেস্তোঁরার কর্মচারী বলিতেছে—না তোমরা ডিপ্লোম্যাট নও, তোমাদের ট্যাক্স লাগিবে। নিগ্রো দুজন চলিয়া গেলে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে ট্যাক্সের কি সম্পর্ক? আমাকেও অনেক সময় দোকানে বা রেস্তোঁরায় ডিপ্লোম্যাট কি না জিজ্ঞাসা করে।

—আমাদের এখানে ডিপ্লোম্যাটদের ট্যাক্স দিতে হয় না।

এতক্ষণে রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এই দুজনে বলিল তারা ডিপ্লোম্যাট কিন্তু আপনি তাদের কথা মানিলেন না। কিরূপে বুঝিলেন এরা ডিপ্লোম্যাট নয়?

—আমাদের একটা সুবিধা আছে। এই হোটেলে বহু ডিপ্লোম্যাট আসেন। ঘর রিজার্ভেসনের সময়েই তাঁদের status জানিয়া নিয়া ফরম পূরণ হইয়া যায়। কে ডিপ্লোম্যাট কে তাহা নয় আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

—দোকানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি ডিপ্লোম্যাট কি না। যদি আমি বলি আমি ডিপ্লোম্যাট তবে কিরূপে ধরিবে?

—নিশ্চয়ই ধরিতে পারিবে না। আপনার কথাই মানিয়া নিয়া ট্যাক্স বাদ দিবে। বিদেশী দেখিলে সাধারণতঃ এই প্রশ্ন করে তবে সব দোকানে করেও না। ক্যাশ মেমো লেখার সময় তাঁরা নিজেরাই পরিচয় দেন। একজন ডিপ্লোম্যাট মিথ্যা পরিচয় দিয়া এইটুকু সামান্য সুবিধা নিবেন, এটা কেহ মনে করে না।

এর আগেই দুই ডিপ্লোম্যাটের মিথ্যাচরণ দেখিয়াছি। সে কথা আর তুলিলাম না। এতদিনে একটি জিনিষ বুঝিতে পারিয়াছি। এরা প্রথমে লোককে বিশ্বাস করে। কেহ ঠকাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে ধরিতে পারিলে ধরে। না ধরিতে পারিলে নিজের অক্ষমতার দায়িত্ব সকল লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া সকলের সুযোগ হরণ করে না।

নিউ ইয়র্কের প্রোগ্রাম ছিল এই কয়টি সাক্ষাৎকার:

আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজ—প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ফ্রেডারিক বুর্কহার্ড।

কাউন্সিল অন ফরেণ রিলেশন্স—একজিকিউটিব ডিরেক্টর জর্জ ফ্রাঙ্কলিন।

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন—প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জন ন্যাসন।

কার্ণেগী এনডাওমেন্ট ফর ইণ্টারন্তাশনাল পীস—ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্রেটিগ।

আমেরিকান এসোসিয়েসন অফ ইউনাইটেড নেশন্‌স—প্রেসিডেণ্ট ডাঃ আইকেলবার্গার।

এসিয়া হাউস—ডিরেক্টর মিস মিন্‌জ।

টাইম-লাইফ—পাবলিসিটি ডিরেক্টর জেমস পিট।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—এশিয়া বিভাগে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ এম্‌ব্রি।

ইউনিয়ন থিওলজিকাল সেমিনারী —ডাঃ হ্যাণ্ডি।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং কাউন্সিল অন ফরেণ রিলেশন্সের পরামর্শদাতা ডাঃ হেনরী অব্রে।

ইনষ্টিটিউট অফ রাশিয়ান ষ্টাডিজ—ডিরেক্টর ডাঃ পেনার।

কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজ

নিউইয়র্কে প্রথম সাক্ষাৎ ছিল আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজ-এর প্রেসিডেন্ট ফেডারিক বুর্কহার্ডের সঙ্গে। অমায়িক ভদ্রলোক। সাদরে তাঁর ঘরে নিয়া বসাইলেন।

আমাদের দেশে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ছাড়া বাঁচিতে পারে না। এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনেক দিন ছিলাম। সেখানেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন তো আরও সঙ্গীন অবস্থা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিজের খরচ চালাইতে পারে না বলিয়া সরকারী সাহায্য চায়, অথবা একটা কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া সরকারী সাহায্যের টাকা আত্মসাৎ করাই আসল উদ্দেশ্য, ইহা আমাদের দেশে বলা কঠিন। এই কথাটি মনে ছিল বলিয়া বুর্কহার্ডকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কতটা আছে এবং এই সোসাইটির কাজ কি?

—আমেরিকার কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরকারের উপর নির্ভরশীল তো নয়ই, অধিকাংশেরই সরকারী টাকার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে আমাদের কাউন্সিলের একটু পরিচয় দিই।

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেগণারত ত্রিশটি গবেষণা সমিতি নিয়া এই কাউন্সিল গঠিত। এটি উহাদের ফেডারেশন। ইহা প্রাইভেট বা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইহাদের লাভের টাকা কেহ নিতে পারে না। ১৯১৯-এ কাউন্সিল গঠিত হয়। উহার খরচের অধিকাংশ বিভিন্ন জনকল্যাণকর ফাউণ্ডেশন হইতে আসে। গবর্ণমেণ্ট উহাকে দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ করাইয়া নিতে পারেন এবং তার জন্য টাকা দেন।

ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণার পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে আছে—দর্শন, মুদ্রাতত্ত্ব, প্রাচীনতত্ত্ব, প্রাচ্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, লোকসাহিত্য, আইন, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, সূচীতত্ত্ব, ভূগোল, ললিত কলা, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ভাস্কর্য্য, এশীয় বিদ্যা, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, আমেরিকান বিষয়,

আমেরিকার নবজাগরণ প্রভৃতি। দর্শন এবং ভাষাতত্ত্বে অনেকগুলি সমিতি আছে।

বুর্কহার্ড হাসিয়া বলিলেন—সঙ্গীতজ্ঞেরাও ছাড়েন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিষয়েও গবেষণার প্রভূত ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং তাঁহারাও সঙ্গীত বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। উহাও কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে ১৩টি প্রতিষ্ঠান নিয়া সোসাইটি আরম্ভ হয়। এখন উহার সংখ্যা ত্রিশ। কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলীর সংখ্যা এখনও ১৩ রহিয়াছে।

কাউন্সিলের গবেষণার ষ্টাণ্ডার্ড পোষ্ট গ্রাজুয়েট তো বটেই, বহু ক্ষেত্রে পোষ্ট ডক্টরেট। ইউরোপে সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ১৯৬০-এর ডিসেম্বরে ২৫ লক্ষ ডলার বা সওয়া কোটি টাকা দিয়াছে। ১৯২০ সালে সোসাইটির বার্ষিক ব্যয় হইয়াছিল ১৩৮ ডলার মাত্র। ১৯৬০-এ সমিতির ব্যয় হইয়াছে ১৫ লক্ষ ডলার বা ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহা পরিচালন ব্যয়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের উপরোক্ত গ্রাণ্ট ইহার বাহিরে। সোসাইটির দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের টাকার একটি মোটা অংশ ফোর্ড, রকফেলার এবং কার্ণেগী এই তিন ফাউণ্ডেশন হইতে আসে।

বুর্কহার্ডকে তিনটি প্রশ্ন করিলাম—

(১) আমরা বিদেশ হইতে লক্ষ্য করিতেছি আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে পি. এইচ. ডি-র থিসিস বাছিয়া নিতেছে এবং অতি সুন্দর বই লিখিতেছে। ছাত্রছাত্রীদের সর্ব্বোচ্চ স্তরের গবেষণাকে আপনারা সন্তোষজনক মনে করেন কি না।

(২) আপনাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অধিগম্য হয় কি না।

(৩) রাশিয়ার সুধী সমাজের সঙ্গে আমেরিকান সুধী সমাজের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে কি না।

বুর্কহার্ড বলিলেন—আমেরিকান কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. সংখ্যা কমিতেছে এবং এই হ্রাস তাঁহাদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৬০ সালে নিযুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ পি. এইচ. ডি. ইহা তাঁহাদের নিকট চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ১৯৫৪তেও অধ্যাপকদের শতকরা

৪০ জন পি. এইচ. ডি. ছিলেন। এই অভাবের কারণ তাঁর মতে এই যে, সপ্তাহে ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা অধ্যাপনার পর গবেষণার সময় অধ্যাপকদের থাকে না এবং অনেকেই বড় লাইব্রেরী কাছে পায় না বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও গবেষণায় হাত দিতে পারে না। অধ্যাপনা হইতে ছুটি না নিলে গবেষণা করা যায় না ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য যে বৃত্তি দরকার কাউন্সিল তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। গবেষকদের বই প্রকাশ করাও এক দুরূহ সমস্যা। কত সংখ্যক গবেষণা শেষ হইয়াছে, কিন্তু বই বাহির হয় নাই সে বিষয়ে ১৯৫৮ সালে কাউন্সিল তদন্ত করিয়াছিলেন। বুর্কহার্ড খুব সহানুভূতির সহিত বিষয়টি বলিলেন এবং জানাইলেন এরূপ গ্রন্থ প্রকাশে কাউন্সিল অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইহার জন্য আমেরিকার ষ্টীল ফাউণ্ডেশন একটি বড় গ্রাণ্ট দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে শুনিলাম—আমেরিকার প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের আয়ত্তে আনা তাঁহাদের একটি সুনির্দিষ্ট পলিসি। বাঙ্গলাদেশ প্রতিভার পীঠস্থান, অতি বড বঙ্গবিদ্বেষীকেও এই সত্য অস্বীকার করিতে ঢোক গিলিতে হইবে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সব চেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হইতেছে এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ ঝোঁক দেওয়া হয় না। আমাদের সমস্ত ঝোঁক পড়ে কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।

আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজ দেশের সর্ব্বোচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত, তৎসত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন, উহার গতি ও প্রকৃতির সংবাদ আহরণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা উহার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের সর্ব্বপ্রধান উপায় শিক্ষক শিক্ষণ। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সম্মেলন হয় এবং সেই সম্মেলনে কাউন্সিলের দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। বিষয়টি আরও বিষদভাবে জানিলাম ওয়াশিংটনে আমেরিকার ইতিহাস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ বয়েড শেফারের নিকট। মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের আধুনিক গবেষণার ফল জানাইবার জন্য কি সুন্দর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় শেফার তাহা দেখাইয়াছিলেন। চীন, জাপান এবং ভারত সম্বন্ধে পুস্তিকা তিনটি নিয়া আসিয়াছি।

কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মাধ্যমিক স্কুলে সমাজ বিজ্ঞান পড়ানো হইবে তাহা স্থির করিয়া তবে পাঠ্যতালিকা তৈরি হয় এবং দুই কাজেই কাউন্সিল

স্কুলগুলিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। পাঠ্যতালিকা প্রণয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজ বিজ্ঞানের (Social Studies) নয়টি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ নয়জন পণ্ডিতের উপর কাউন্সিল এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। বিষয় নয়টি হইতেছে—নৃতত্ত্ব, এশীয় বিষয় (Asian Studies), অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, রুশীয় বিদ্যা (Russian Studies) সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)।

আমাদের সঙ্গে তুলনা না করাই ভাল। একাদশ বার্ষিক স্কুল এবং ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স মারফৎ শিক্ষা সংহারের যে অপূর্ব্ব স্কীম তৈরি হইয়াছে তাহার চাপ আজ বাঙ্গলাদেশের প্রতিটি ছাত্র ও অভিভাবক মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছেন। শিক্ষক শিক্ষণের নামে যাহা চলিতেছে তাহাকে প্রহসন বলিলেও বোধ করি সম্মান দেওয়া হয়।

বিদেশী জর্ণাল পাঠে আমার এক দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আমেরিকা এবং রাশিয়ার পণ্ডিত সমাজ ক্রমশঃ কাছে আসিতেছে। এটম বোমার আস্ফালন যতই চলুক না কেন, এই গতি মন্দীভূত হয় নাই। বুর্কহার্ড বলিলেন, সত্যই তাঁহাদের কাউন্সিল এবং রাশিয়ার একাডেমি অফ সায়েন্সের মধ্যে ১৯৫৯-এর নবেম্বরে এক আলোচনায় স্থির হয় যে, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠান উভয় দেশে স্কলার পাঠাইবে। ১৯৬১তে প্রস্তাবটি পাকা হয় এবং ঐ বৎসর ১৭ই মার্চ্চ মস্কোতে আমেরিকান কাউন্সিলের পক্ষে বুর্কহার্ড এবং সোভিয়েট একাডেমির পক্ষে উহার প্রেসিডেন্ট নেসমিয়ানফ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে স্থির হয়—(১) উভয় দেশের তিনজন স্কলার তিন মাসের জন্য অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন, সেমিনার করিবেন এবং সেখানে যে সমস্ত গবেষণা চলিতেছে তার পরিচয় নিবেন। (২) পাঁচজন স্কলার ত্রিশ মাসের জন্য উভয় দেশে গবেষণার জন্য প্রেরিত হইবেন। টাকার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কাউন্সিল গবর্ণমেণ্টের টাকা নেন নাই। ফোর্ড, রকফেলার এবং কার্ণেগী ফাউণ্ডেশনেরা আমেরিকান স্কলারদের প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা কাউন্সিলের হাতে দিয়া দিয়াছে।

বুর্কহার্ড বলিলেন, সোভিয়েট একাডেমি নিজেরাই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই স্কলার বিনিময় ব্যবস্থা আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালেও যাহাতে উহা বহাল থাকে তার চেষ্টা করা হইবে।

আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে আমরা শুধু বিরোধই

দেখিতে পাই কিন্তু দৃষ্টির অন্তরালে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার যে আন্তরিক চেষ্টা চলিয়াছে তার সন্ধান খুব কম লোকেই রাখি। বুর্কহার্ডের কথায় মনে হইল এই প্রশ্নটি বোধ হয় বড় একটা কেহ করে না। তাঁর ভাবভঙ্গীতে বেশ বোঝা গেল এত বড় একটি কাজ তাঁর সভাপতিত্ব কালে সাধিত হইতে চলিয়াছে ইহাতে তিনি গৌরব বোধ করিতেছেন। সোভিয়েট একাডেমির প্রেসিডেণ্ট নেসমিয়ান-ফের কথা ডাঃ মেঘনাদ সাহার নিকট অনেক শুনিয়াছি। বুর্কহার্ডের সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁর কথা মনে জাগিতে লাগিল।

ভাষা সম্বন্ধে যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা আমেরিকা চালাইয়াছে তাহাতে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কাউন্সিল উরাল আলতাইক ভাষা গোষ্ঠী নিয়া পড়িয়াছে। কোরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, আঝারবাইজানি, এস্তোনিয়ান, কারেলিয়ান, তুর্কী, কিরঘিজ, মঙ্গোলিয়ান, উজবেক, তাতার, ফিনিশ প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত কাজ হইয়াছে বুর্কহার্ড তার তালিকা দেখাইলেন। চক্ষু কপালে উঠিবারই কথা। ভাষাবিজ্ঞান তো উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এখন ইলেকট্রণিক যন্ত্রে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হইয়া যাইতেছে। আধুনিক চীন এবং জাপান সম্বন্ধে গবেষণাও খুব বিস্তৃত। ডাঃ শেফার প্রদত্ত 'ভারত' পুস্তিকাটি পাইয়া দেখিলাম এ বিষয়েও এরা কম যায় না। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন তিলক ও গোখেল সম্বন্ধে বই বাহির করিয়াছে। এখন এম. এন. রায়ের জীবনী লিখিতেছে। চিকাগো এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চ্চা হইতেছে। পেনসিলভানিয়ায় বাঙ্গলা "আনন্দবাজার পত্রিকা" মাইক্রো-ফিল্‌ম হইয়া সংরক্ষিত হইতেছে।

দীর্ঘ আলাপের পর বাহিরে আসিলাম। যে ঘরের ভিতর দিয়া লিফটে পৌঁছিতে হয় তার কয়েকটি শেল্‌ফ দেখাইয়া বুর্কহার্ড বলিলেন—বিশিষ্ট আমেরিকানদের জীবনীর একটি অভিধান প্রণয়নের কাজ কাউন্সিল হাতে নিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের কাজ সুরু হইয়াছে। ১৯৪১ হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদের জীবনী উহাতে থাকিবে।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—কাজটা একটু পিছাইয়া আছে। কার জীবনী এই অভিধানে সংগ্রহের উপযুক্ত তাহা বুঝিতেও তো একটু সময় লাগে।

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জন নাসন স্বল্পভাষী, কিন্তু কোন বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে বেশী সময়ও তাঁর লাগে না। তাঁর কাছে ছিলাম প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। এসোসিয়েসন গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। তখন উহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ। এখন এই এসোসিয়েসনের কাজ কেবল-মাত্র সংবাদ সরবরাহ নয়, দেশের প্রতিটি মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি বৃহৎ সমস্যার বুদ্ধিদীপ্ত বিচারের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই উহার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে সমস্ত উপায় ইঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক।

ডাঃ নাসন একটি জিনিষের উপর খুব জোর দেন। পুস্তক প্রকাশ, সম্মেলন আহ্বান, বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি যথেষ্ট নহে। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ও আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে হইলে সমাজের একেবারে গোড়ায় গিয়া তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং আলোচনা ও তর্ক সভা নিম্নতম স্তর হইতে গঠন করিয়া উপরের দিকে আনিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় এসোসিয়েসন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় নাই, এক নূতন এবং অদ্ভুত উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। আমাদের দেশে এদের কাজ হয়ত ধ্বংসাত্মক বলিয়া অভিহিত হইত কিন্তু আমেরিকানরা উহা শ্রেষ্ঠ গঠনমূলক কাজ বলিয়া মানিয়া নিয়াছে এবং উহাতে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দিতেছে।

এসোসিয়েসন নির্দ্দলীয় প্রতিষ্ঠান। গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির যে কোন দিক নিয়া স্বাধীন চিন্তা এবং তর্কের ব্যবস্থা এরা করে। এদের মূল নীতি সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যাইতে পারে—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ দেশের লোক বিচার করিবে, তবে তার আগে উপযুক্ত জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া তবে সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইবে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জ্জাতিক যে কোন সমস্যা বিচারের মূল ভিত্তি হইতেছে—"আমার

মনে হয়"। যে কোন বক্তা এই বাক্যাংশের দ্বারা নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে সুরু করিয়া দেন, এই "মনে হওয়া"র পিছনে কোনরূপ জ্ঞান চর্চ্চা বা সাধনার প্রয়োজন অনুভব তো করেনই না, সামান্যতম প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও করেন না। অপরে কোন ভুল ধরিয়া দিলে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিয়া "আমার" শব্দটির উপর আরও বেশী জোর দিয়া বলেন—"আমার মনে হয়..."।

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন সরকারের নীতি সমালোচনায় উৎসাহ দেন কিন্তু সে সমালোচনা পরীক্ষিত তথ্যের উপর করিতে বলেন। এদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হইতেছে এইরূপ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

সৈন্যদলের Kits-এর ন্যায় এসোসিয়েসন তথ্যের Kits দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাকে তাঁহারা বলেন Fact Sheet Kits। বাড়ীতে, গির্জ্জায়, স্কুলে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা নিয়া তর্ক সভায় এঁরা উৎসাহ দেন এবং সেই তর্ক যাহাতে যথাযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে হয় তার জন্য Fact Sheet Kits সরবরাহ করেন। সুপরিকল্পিত ভাবে এই সমস্ত তর্ক সভার ব্যবস্থা করা হয়। Great Decisions আখ্যা দিয়া এক এক সিরিজে আটটি করিয়া বিষয় গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে Great Decision সিরিজে আলোচনার বিষয় ছিল:

জার্ম্মেণীতে অচলাবস্থা
সোভিয়েট চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্ব নেতৃত্ব
ফ্রান্স এবং পশ্চিমী ঐক্য
জাপান—এশীয় মিত্রের ভবিষ্যৎ
বিস্ফোরণোন্মুখ আফ্রিকায় জাতিসঙ্ঘ
আমেরিকার দেশসমূহে বিশৃঙ্খলা
অস্ত্র এবং জীবন
বিশ্ব অর্থনীতির খসড়া।

১৯৬২ সালের বিষয় ছিল:
ভিয়েৎ নাম—জিতিবে, হারিবে, না ড্র হইবে?
লাল চীন—তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি?
ব্রেজিল—অর্দ্ধ মহাদেশ কোন্ পথে?
নাইজেরিয়া—নূতন আবহাওয়ায় গণতন্ত্র?

ইরাণ—পশ্চিম এশিয়ার খুঁটি ?

বার্লিন—মিত্রশক্তিদের ঐক্য পরীক্ষা ?

জাতি সঙ্ঘ—স্বতন্ত্র শক্তি ?

যুক্তরাষ্ট্র—বৈদেশিক নীতিতে নূতন ধারা ?

আমেরিকান বৈদেশিক নীতির উপর যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আসিতেছে তাহার বিচার এবং উহার কোন বিকল্প আছে কি না তার আবিষ্কার এই আলোচনা সিরিজের প্রধান উদ্দেশ্য। Fact Sheet Kits যাহাতে সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে সকলের হাতে যায় এবং উহা পড়িবার ও বুঝিবার যথেষ্ট সময় যাহাতে সকলে পায় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। এই Kits এসোসিয়েসন হইতে সরবরাহ করা হয়।

ডাঃ নাসনের ভাষায় এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য হইতেছে to encourage the development of an alert, informed and articulate public, অর্থাৎ সতর্ক, তথ্য সমৃদ্ধ এবং মুখর জনসাধারণ গড়িয়া তুড়িয়া উৎসাহ দান; এই জনসাধারণকে তাঁহারা মনে করেন essential foundation for the success of any American foreign policy—আমেরিকান বৈদেশিক নীতি সফল করিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভিত্তি। আজিকার দিনে রাস্তার লোক দেশের বৈদেশিক নীতি আলোচনা করিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রভেদ হইতেছে এইখানে যে, আমরা মনে করি বৈদেশিক নীতি আলোচনার জন্য কোন জ্ঞান বা শিক্ষা অনাবশ্যক, তাহারা বিশ্বাস করে ইহা অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে এরূপ তথ্যসম্বলিত বই বা পুস্তিকা নাই, তাহাদের দেশে আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞানের পুস্তক পুস্তিকা বোধ হয় প্রতি ঘণ্টায় প্রকাশিত হয়।

তর্কসভা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বসে তার জন্য এসোসিয়েসন খুব চেষ্টা করে। Great Decisions আলোচনার প্রাণকেন্দ্র বা core হইতেছে Small, informed, locally organised discussion groups। Fact Sheet Kits-এ যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হয় তাহাতে তর্কসভায় কোন নেতার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকায় একটি নূতন জিনিষ আছে—trained discussion leaders অর্থাৎ আলোচনা সভা পরিচালনার ট্রেনিং প্রাপ্ত নেতা। ইহাদের সংখ্যা কম এবং এরা সহজলভ্য নয়। এই কারণে এসোসিয়েসন

পুস্তিকাগুলি এমন ভাবে তৈরি করিয়া দেন যাহাতে এদের ডাকিবার প্রয়োজন না হয়।

সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিসন এই তর্কসভায় উৎসাহ দানের জন্য উহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রচার করে। বহু স্থানীয় সংবাদপত্র তর্কসভার রিপোর্ট প্রকাশের জন্য পূর্ণ একটি পৃষ্ঠা দেয়। আমাদের দেশে কোন ষাঁড় তিনতলায় উঠিলে বা কোন পাগল হাওড়া পুলের ডগায় চড়িলে তাহা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সচিত্র সংবাদ হয়। কোন তর্কসভার রিপোর্ট প্রকাশের কথা সংবাদপত্রেরা চিন্তাই করিতে পারে না। দিল্লীর সংবাদপত্রে এরূপ রিপোর্ট তবু কিছুটা বাহির হয়, কলিকাতায় একেবারেই হয় না।

ডাঃ নাসন জানাইলেন—গত ফেব্রুয়ারী মার্চ্চে (১৯৬১) প্রায় তিন লক্ষ লোক ঐ বৎসর Great Decisions নিয়া আলোচনা করিয়াছে। ৫৭টি সংবাদপত্র সবগুলির আলোচনা ভাল ভাবে প্রকাশ করিয়াছে এবং ৪৮৫টি সংবাদপত্র উহা অন্ততঃ খানিকটা প্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যা ২,৫৩,৭২,১০২। আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনাল তর্কসভার বক্তৃতা রিপোর্ট করেন। তর্কসভায় যোগদানকারীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট। তন্মধ্যে স্কুলের ছাত্র অনেক। ডেট্রয়েটে ৪০০০ প্রাপ্তবয়স্ক এবং ১০০০ ছাত্র Great Decisions প্রোগ্রামে যোগ দিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তার একটি নমুনা ডাঃ নাসনের নিকট পাইলাম। গত বৎসর ৪১৪১ জন নানা তথ্য জানিতে চাহিয়া এসোসিয়েসনকে চিঠি দিয়াছে। যাহারা চিঠি দিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৫৮
সরকারী এজেন্সি	৭০
বেসরকারী এজেন্সি	৭৫১
ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান	২৪৮
ছাত্র	১৮২৬
অন্যান্য	৫৮৮

এসোসিয়েসন দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—Headline Series এবং Intercom। Intercom পত্রিকাটি বছরে সাতবার প্রকাশিত হয়। Head-

line Series বাহির হয় দুই মাসে একবার। দুইটি পত্রিকাই অদ্ভুত তথ্য সমৃদ্ধ। দুইটিরই গ্রাহক হইয়া আসিয়াছি। আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সরকারী এবং বেসরকারী যত পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তার বিবরণ Intercom-এ বাহির হয়।

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের সঙ্গে আর একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইয়াছে World Affairs Centre। এটিকে বলা হয় আন্তর্জ্জাতিক তথ্যের ক্লিয়ারিং হাউস। ১৯৫৬ সালে উহা স্থাপিত হয়। এখন উহা ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নয়, উহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়াও এরা ব্যাপক ও গভীর ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। প্রায় হাজার খানেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত সাময়িক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্লড অ্যাফেয়াস´ সেণ্টার সেগুলির সারবস্তু নিজেদের অফিসে আনে এবং সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া অতিশয় সহজবোধ্য প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় প্রকাশ করে। এই হিসাবে Headline Series একটি অমূল্য সম্পদ।

ডাঃ নাসনের সঙ্গে আলোচনায় একটি বিষয় খুব স্পষ্ট বুঝিলাম যে, এঁদের এসোসিয়েসন নির্দ্দলীয় এই কথায় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রতিটি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় এক অপরিসীম উদার মনোভাব এদের প্রতিটি কথায় প্রতিফলিত।

কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট

এণ্ড্রু কার্ণেগী ছিলেন ইস্পাত ব্যবসায়ী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই তিনি স্থায়ী বিশ্বশান্তির কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি লীগ অফ পীস গঠনের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন। জার্ম্মেনীর দ্বিতীয় কাইজারের তখন খুব প্রতিষ্ঠা। নৌশক্তি বাদ দিয়া শুধু স্থলশক্তির কথা ধরিলে কাইজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলিয়া পরিচিত। বিমান শক্তির আবির্ভাব তখনও ঘটে নাই। কার্ণেগীর বিশ্বাস হইল কাইজারের নেতৃত্বে বিশ্ব হইতে যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব হইবে। ১৯০২ সালে স্কটল্যাণ্ডে সেণ্ট এণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তৃতায় কার্ণেগী তাঁর স্কীম উত্থাপন করিলেন। উহাতে তিনি একথাও বলিলেন যে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র আমেরিকার ন্যায় একটি ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভূত শক্তির অধিকারী হইবে। ১৯০৭ সালে কার্ণেগী কাইজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের লীগ অফ পীস স্কীমটি দিলেন। বিশ্ব-শান্তির মুকুট মস্তকে ধারণ করিবার জন্য তিনি কাইজারকে অনুরোধ করিলেন। ১৯০৭-এ হেগ-এ দ্বিতীয় শান্তি সম্মেলনেও তিনি বলিলেন যে বিশ্বশান্তির নেতৃত্বের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হইতেছেন কাইজার। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে নিউইয়র্কের কয়েকজন অধ্যাপক এবং পাদ্রী মিলিয়া নিউইয়র্ক শান্তি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং কার্ণেগী উহার সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন। বিশ্বশান্তি স্থাপনে কার্ণেগীর চেষ্টায় সাহায্য করিয়াছিলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট।

১৯০৮ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট নিকোলাস বেকৃটলার কার্ণেগী ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউটের প্লান তৈরি করিলেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহে অস্ত্র এবং নৌসজ্জা সুরু হইয়া গিয়াছে। উহার তীব্র নিন্দা এবং লীগ অফ পীস স্থাপনের দাবী তখন কার্ণেগীর প্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১০ সালে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে কাইজারের অভিমত জানিবার জন্য তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জার্ম্মেনী প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের সালিশী বাধ্যতামূলক করা যায় কি না ইহাই ছিল তখনকার বিতর্কের সর্ব্বপ্রধান বিষয়। ১৯১০-এর মার্চ্চ মাসে আমেরিকান শান্তি ও সালিশী লীগের সভায় প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌ট বলিলেন—সাধারণ সর্ব্ব প্রকার বিরোধ সালিশীতে দেওয়া তো উচিতই বটে, জাতীয় সম্মানের প্রশ্নও সালিশীতে দিতে কি বাধা থাকিতে পারে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। আন্তর্জ্জাতিক সালিশীর সমর্থকেরা প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌টের উক্তিতে উৎসাহিত হইলেন।

বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ইনষ্টিটিউট গঠন বিষয়ে কার্ণেগী তখনও মন স্থির করিতে পারেন নাই। ১৯১০ সালে বোষ্টনের পুস্তক প্রকাশক এডোয়ার্ড গিন ঐরূপ একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের জন্য দশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা দান করিলেন। ঐ টাকায় ১৯১১ সালে ওয়ার্ল্ড পীস ফাউণ্ডেশন বা বিশ্বশান্তি ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হইল। উহার সহিত সহযোগিতার আমন্ত্রণ কার্ণেগী গ্রহণ করিলেন না।

অল্পদিনের মধ্যেই কার্ণেগী এরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাজনীতি, আইন, শিক্ষা প্রভৃতির শীর্ষস্থানীয় ২৬ জনকে আমন্ত্রণ করিয়া কার্ণেগী একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য তাঁহাদের হাতে এক কোটি ডলার বা পাঁচ কোটি টাকা দান করিলেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হইল কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পীস অথবা আন্তর্জ্জাতিক শান্তির কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট। যুদ্ধকে সভ্যতার উপর কদর্য্যতম কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা হইল এবং উহা দূর করিবার কাজে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট গ্রহণ করিল।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে সংবাদ আসিল ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে। তখনও কার্ণেগীর বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ বেশী দূর গড়াইবে না। আন্তর্জ্জাতিক সালিশীতে বিরোধের মীমাংসা হইবে। কিন্তু যুদ্ধ যখন থামিল না, কার্ণেগী পরম দুঃখের সঙ্গে বলিলেন—আমি আকাশে কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছি, সমস্ত তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে সামলাইয়া নিয়া আবার তিনি যুদ্ধের পর লীগ অফ পীস স্থাপনের জন্য প্রচারে নামিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই প্রস্তাবের মূল্য স্বীকৃত হইল। লীগ অফ নেশন্‌স গঠিত হইল। কিন্তু উহা তিনি দেখিলেন না। লীগ অফ নেশন্‌স গঠনের পাঁচ মাস পূর্ব্বে ১৯১৯ সালের ১১ই আগষ্ট তিনি ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কার্ণেগী এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পীস প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার স্থির হইয়াছিল তাঁহাদের ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্লেটিগের সঙ্গে। তিনি আর দুজনকে ডাকিলেন—মিস আনি উইন্সলো এবং মিস প্যাট্রিসিয়া ওলগেমুথ। গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ শিক্ষার পত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সাহায্যে প্রচার এখন ইহাদের কাজ। এদের টাকা প্রচুর। অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য এদের অন্যতম কাজ। এদের সব কয়টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরই দেখিয়াছি আসল উদ্দেশ্য এক—উদার আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি। অজ্ঞতা, গোঁড়ামি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমেরিকার সব কয়টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এই চেষ্টা অতিশয় ব্যাপক এবং প্রতি গভীর হইয়াছে। ম্যাকার্থি শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পাঁচ সাত বছর আগেও জনচিত্তে যতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন, এখন তাহা পারেন না। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তব এবং নিরপেক্ষ জ্ঞান একেবারে স্কুল হইতে বিস্তারের চেষ্টায় জোর দেওয়ায় উহার স্থায়ী সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মারফৎ নিজেদের কথা প্রচারে ইউরোপীয় দেশগুলি যত তৎপর, এশিয়া এবং আফ্রিকা ততটা নয়। নিউ ইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে ভারতের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিলে আমাদের প্রকৃত সমস্যা এবং অসুবিধাগুলি আমেরিকায় প্রচার করা যায়; তাহা করিলে রাজনৈতিক দিক হইতে আমাদের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতি পদে একটি জিনিষ তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াছি—আমাদের কথা আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে যাই না, বিদেশীরা ভুল বোঝে, আমরা তখন পা ছড়াইয়া কাঁদি এবং বিদেশীর বাপান্ত করি।

প্রাথমিক আলাপের পর প্যাট্রিসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আমাদের দেশে কোন্ জিনিষটা সবচেয়ে ভাল লাগিল?

—এ যাবৎ যাহা দেখিয়াছি তার মধ্যে আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগিয়াছে বোষ্টনের মাসাচুসেটস হাসপাতাল। আমাদের জানা ছিল ডাক্তার ভিন্ন অন্যেরা হাসপাতাল চালাইতে পারে না। এখানে দেখিলাম সে ধারণা ভুল।

—তবে কি মনে করেন ডাক্তারেরা এডমিনিষ্ট্রেসন ভাল চালাইতে পারেন না?

—বোষ্টনের অত বড় এবং বিখ্যাত হাসপাতাল দেখিয়া তাহাই তো মনে হইল।

—আপনি কি ডাঃ রায়কে ধরিয়া এ কথা বলিতেছেন?

এবার আমার চক্ষু কপালে উঠিবার পালা। বলিলাম—আপনি ডাঃ রায়কে জানেন?

প্যাট্রিসিয়া হাসিয়া বলিলেন—আমি বেশ কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। বাঙ্গলাদেশ জানি।

আর ঘাঁটাইলাম না। এটা বিদেশ। ডাঃ রায়ের যত সমালোচনাই দেশে করি না কেন, এখানে তাহা করিতে পারি না। হাসিঠাট্টায় এই প্রসঙ্গ চাপা দিলাম।

প্যাট্রিসিয়ার পরিচ্ছদে, হাতের লেখার ভঙ্গীতে এবং আলাপে একটি অপূর্ব্ব স্বকীয়ত্ব আছে। আমেরিকান অতি আধুনিকা তরুণীদের মত পরিচ্ছদ নয়, আমাদের কাছে অনেক ভব্য এবং শালীনতাসম্পন্ন। বাম হাতে লেখেন এবং অন্যেরা যে ভাবে বাম হাতে লেখে সে রকম নয়। উপর হইতে নীচে এমন ভাবে লেখেন যে, দূর হইতে মনে হয় চীনা ভাষা লিখিতেছেন। অক্ষরগুলিকে কাত করিয়া লিখিয়া যান। কাগজটি সোজা করিয়া দিলেই দেখা যাইবে পরিষ্কার ইংরেজি লেখা।

কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পীস-এর মুখপত্র ইণ্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েসন। মিস উইন্সলো উহার প্রধান সম্পাদিকা এবং মিস ওলগেমুথ সহযোগী সম্পাদিকা।

ডাঃ প্লেটিগ—আপনাদের পত্রিকায় কি কি বিষয় আলোচনা করেন?

—আমরা প্রধানতঃ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং শিক্ষা নিয়া আলোচনা করি। বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ত্ত জ্ঞান এবং বিশিষ্ট লেখকদের প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি। আমাদের সমস্যা বিষয়ে নিজস্ব গবেষণা তো আছেই।

—এই সব জিনিষ সাময়িক পত্রে তো স্থায়ী হয় না। স্থায়ী ভাবে ঐ জ্ঞান ধরিয়া রাখার জন্য কোন ইনষ্টিটিউট গঠনের চেষ্টা কি আপনারা করিতেছেন এবং এখানে তাহা explore করা কি আপনার উদ্দেশ্য?

—আমরা কিছুদিন যাবৎ একটি Indian Institute of Social Research গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের গবেষণা স্থায়ী হইতেছে না ইহা আমরাও অনুভব করিতেছি। তবে এখানে উহার সম্বন্ধে কিছু explore করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। আপনাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি

ভাবে কাজ করিতেছে এবং উহাদের গবেষণালব্ধ ফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং উদার মতাবলম্বী নাগরিক সৃষ্টিতে কি উপায়ে এবং কি পরিমাণে কাজে লাগানো হইতেছে তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়া নেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের দেশেও বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু সেই জ্ঞান স্কুলের ছাত্র হইতে সুরু করিয়া সকলের নিকট পৌঁছিয়া দিলে জাতি গঠনের যে সাহায্য হইতে পারে সেরূপ চেষ্টার অভাব আমাদের দেশে আছে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌঁছিয়া না দিলে এবং ইনটেলেকচুয়ালরা অপরের ব্যবহারের যে মান নির্দ্দেশ করিবেন তাহা নিজেদের আচরণে পালন না করিলে একটা জাতিকে গড়িয়া তোলা যায় না ইহা আমরা বুঝি। দুইটি legacy আমরা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই—Legacy of British Rule এবং Legacy of Partition। এই দুইটির ফলে আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমাণ আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের দেশ উন্নত হইতে পারিবে না। গত দুই শতকের মধ্যে আপনাদের সমাজে যে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে চাই যাহাতে সেই জ্ঞান আমাদের কাজে লাগাইতে পারি। এই জ্ঞান অর্জ্জনে আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।

ডাঃ প্লেটিগ আমাদের প্রস্তাবিত ইনষ্টিটিউটকে সাহায্যের যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহা শুনিবামাত্র আমি যে ভিক্ষুকের মত হাত বাড়াইলাম না বরং মর্য্যাদার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিলাম তাহাতে তিনজনেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা খুসী হইয়াছেন দেখিলাম প্যাট্রিসিয়া।

একটা বাজিয়াছে। লাঞ্চের সময় আসিয়াছে। এবার উঠিতে হয়। পাট্রিসিয়া কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া বলিলেন—নমস্তে। কিন্তু আপনি কি আড়াইটায় আর একবার আসিতে পারিবেন ?

সাড়ে তিনটায় আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশনস-এর ডিরেক্টর ডাঃ আইকেলবার্গারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছিল। একই বাড়ী। আড়াইটায় কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট অফিসে আসার কোন অসুবিধা ছিল না। এক ঘণ্টা একটু বিশ্রাম নিতে পারিতাম। তাহার মায়া ত্যাগ করিলাম।

আড়াইটায় গেলাম। তাঁহাদের প্রধান পাবলিকেসন "ইণ্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েশন" নিয়া অনেক আলোচনা হইল। Intercom, Headline

Series, International Conciliation এইগুলির মূল্য কোন্‌টির বেশী কোন্‌টির কম বলা মুস্কিল। তৃতীয়টির এক সংখ্যায় আছে Communist China in the World Community নামে একটি প্রবন্ধ। প্রতিটি প্রবন্ধ সর্ব্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ দিয়া লেখানো হয়। এটি লিখিয়াছেন আর্থার ষ্টাইনার। ষ্টাইনার ৩০ বৎসর কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপনা করিয়াছেন, ফুলব্রাইট রিসার্চ্চ স্কলার হিসাবে দুইবার চীনে গিয়াছেন, এক বৎসর ভারতে রহিয়াছেন। চীনের সহিত ভারত সরকারের চিঠিপত্র আদান প্রদানের যে বিরাট বই ভারত সরকার প্রকাশ করিয়াছেন সেটি অধ্যাপক ষ্টাইনার যেন হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে চীন-ভারত সম্পর্কের অংশটুকু আমাদের কাছেও অদ্ভুত নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ। এটি মে ১৯৬১ সংখ্যা।

সওয়া তিনটায় বিদায় নিলাম। লিফ্‌ট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। আবার —নমস্তে।

পরদিন হোটেলে আসিল একটি চিঠি—

প্রিয় মিঃ বর্ম্মণ,

কাল যখন আপনি কার্ণেগী এনডাওমেণ্টে আসিয়াছিলেন তখন মিস উইন্সলো, মিঃ প্লেটিগ এবং আমি দেশের অন্যান্য স্থানে কাহাদের সহিত আপনি সাক্ষাৎ করিতে চাহিতে পারেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনার সুবিধার জন্য এখানে একটি তালিকা দিলাম—

ফিলাডেলফিয়ায়: আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি। তাঁহাদের কমুনিটি রিলেশন প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত বারবারা মোফেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। আমি নিশ্চিত জানি আপনি তাঁহাদের আন্তর্জ্জাতিক প্রোগ্রামেই যে শুধু খুশী হইবেন তাহা নহে, ফিলাডেলফিয়ায় তাঁহাদের সামাজিক পুনর্ব্বাসন প্রোগ্রামেও আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।

চিকাগো: নর্থ সেণ্ট্রাল এসোসিয়েসন। ইহাদের ফরেণ রিলেশন্স প্রোজেক্টের ডিরেক্টর মিঃ বেকারকে মিস উইন্সলো আপনার কথা লিখিতেছেন। আমেরিকার সিরিয়াস গবেষণা হাই স্কুল এবং কলেজ ছাত্রদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার চমৎকার কাজ এই এসোসিয়েসন করিতেছেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়: অধ্যাপক বার্ট হোসেলিট্‌জ অর্থনৈতিক এবং

সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহা জানিবার আগ্রহ ভারতে হইবে। আপনার নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুব ভাল লাগিবে।

পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেসন ক্লিয়ারিং হাউস: কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটি পরিচালন বিষয়ে যে সব নূতন চিন্তা ও ভাবধারার উদয় হইতেছে, নামেই বুঝায় যে "এটি তার ক্লিয়ারিং হাউস। ইউনাইটেড নেশন্‌স পাবলিক এডমিনেষ্ট্রেশনের মিঃ হার্ব্বার্ট এমরিক বলিয়াছেন আপমি যেন নিশ্চয়ই সেখানে যান।

আপনি আবার নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিলে এঁদের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন:

মিঃ উইলিয়াম কাসেলা, ন্যাশনাল মিউনিসিপাল লীগ। মিঃ চার্লস অ্যাশার বলিতেছেন যে, এঁরা সমগ্র দেশের মিউনিসিপাল এডমিনিষ্ট্রেশন সম্বন্ধে আপনাকে অনেক কথা বলিতে পারিবেন।

মিঃ হার্ব্বার্ট এমরিক অথবা মিঃ চার্লস অ্যাশার দুজনেই ইউনাইটেড নেশন্‌সের লোক এবং পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেসনে বিশেষজ্ঞ।

দুজনকেই এখন পাইবেন না, তাঁরা এখানে নাই। ফিরিবার পথে পাইবেন।

আমি আশা করি আপনার যাত্রা শুভ হইবে এবং এই লোকদের সকলে অথবা কয়েক জন আপনার কাজে লাগিবেন। ইতি—

প্যাট্রিসিয়া ওলগেমুথ

পুনশ্চ: লীগ অফ উইমেন ভোটার কি ভাবে গবর্ণমেণ্টের কাজে নাগরিব-যোগদান শিখাইতেছেন তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয়ই আপনার হইবে। ওয়াশিংটনে তাঁহাদের অফিসের ঠিকানা ১০২৪ ১৭ ষ্ট্রীট। মিসেস আলেকজাণ্ডার গুইয়োলকে টেলিফোন করিবেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া বিভাগে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ এমব্রির বাড়ীতে। ঠিক আটটায় নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি বড় বাড়ী। তার একটি ফ্লাটে থাকেন। দরজার পাশে বাড়ীর বাসিন্দাদের নাম এবং ফ্লাট নম্বর, পাশে একটি করিয়া কলিং বেলের বোতাম। ডাঃ এমব্রির নামের পাশের বোতাম টিপিলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সদর দরজা ভ্যাঁ করিয়া উঠিল। তাৎপর্য্যটা বুঝিলাম না। দাঁড়াইয়া রহিলাম।। কিছুক্ষণ বাদে আবার বোতাম টিপিলাম। আবার সেই ভ্যাঁ। সদর দরজার হাতল ঘোরাই, হাতল আর খোলে না। এমনি সময় একটি ভদ্রলোক, সঙ্গে একটি তরুণী, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলাম—আমি দরজা খুলিতে পারিতেছি না।

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনি কলিং বেল টেপার পর দরজায় কি কোন শব্দ হয়েছিল?

—হাঁ হয়েছিল।

—তখুনি কি দরজার হাতল ঘুরিয়েছিলেন?

—না, শব্দ থামলে ঘুরিয়েছিলাম।

—শব্দ থাকতে থাকতে হাতল ঘোরালেই দরজা খুলে যাবে।

ভদ্রলোক ডাঃ এমব্রির নামেরই বোতাম টিপিলেন। আবার ভ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতল ঘোরাইলেন। দরজা খুলিয়া গেল। তিনজনে ঢুকিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—এ আবার কি কল? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কার ফ্লাটে যাবেন?

—ডাঃ এমব্রির।

—চলুন, আমরাও সেখানেই যাবো।

বলিতে বলিতে বছর ছয় সাতের একটি বালিকা আসিল। ভদ্রলোক বলিলেন—এই যে ছোট্ট মিস এমব্রি।

—সকলে একসঙ্গে লিফটে উপরে উঠিলাম। ডাঃ এমব্রি এবং তাঁর পত্নী ফ্লাটের দরজায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুজনে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—নমস্তে।

বলিলাম—আপনি কি তবে ভারতে ছিলেন ?

—হাঁ, বেশ কিছুদিন আমরা ভারতে ছিলাম।

যিনি দরজা খোলার কায়দা বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্থানী ইতিহাসের অধ্যাপক। সঙ্গে তাঁর পত্নী।

আসন গ্রহণ করিয়া পাকিস্থানী ইতিহাসের অধ্যাপক—নামটা যতদুর মনে পড়িতেছে ডাঃ উইলকক্স—হাসিয়া বলিলেন—মিঃ বর্ম্মণ দরজা খোলা নিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন।

বলিলাম—আমিও ঠিক এইটিই বলতে যাচ্ছিলাম। এর মেকানিজম্‌টা কি ?

ডাঃ এমব্রি বলিলেন—দুবার কলিং বেল টেপায় আমিও বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সম্ভবতঃ অসুবিধা বোধ করছেন, তাই মেয়েকে পাঠিয়েছিলাম।

পরে এই জিনিষ আরও অনেক জায়গায় দেখিয়াছি। ব্যাপারটা সহজ এবং বাড়ীতে চোর প্রবেশে বাধা দানের পক্ষে অব্যর্থ। কলিং বেল টিপিলে ফ্লাটের ঘণ্টা বাজিবে। ফ্লাট হইতে সাড়া দিলে সদর দরজার ঘণ্টা ভ্যাঁ করিবে এবং যতক্ষণ ঐ শব্দ হইতে থাকিবে ততক্ষণের মধ্যে হাতল ঘুরাইলে দরজা খুলিবে। শব্দ না হইলেও দরজা খুলিবে না, শব্দ থামিয়া গেলেও খুলিবে না। বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া লোক ঢুকিতে গেলে কোন না কোন ফ্লাটের লোক জানিতে পারিবেই এবং যতটুকু সময়ের মধ্যে তার সেই ফ্লাটে আসা উচিত তার চেয়ে বেশী দেরী হইলেই বুঝিবে চোর ঢুকিয়াছে। এই সিকিউরিটি ব্যবস্থা অন্যান্য অনেক সহরেও ফ্লাটের বাড়ীতে দেখিয়াছি। ফিলাডেলফিয়ার এক বাড়ীতে দেখিয়াছি কলিং বেলের বোতামের পাশে জাল দিয়া ঢাকা একটি টেলিফোনের মত যন্ত্র। বোতাম টিপিলেই সেখানে গলার স্বর আসে—কে ওখানে ? নাম বলিলে পর দরজা ভ্যাঁ করে। এটা আরও পাকা ব্যবস্থা।

কলিকাতায় ফ্লাটের বাড়ীতে চুরি লাগিয়াই আছে। বাড়ীতে কে আসে কে যায় তার খবর কেহ রাখে না। এখানে উপরোক্ত ব্যবস্থা কিছুমাত্র কঠিন নয়, ব্যয়সাধ্যও নয়। ইহার উপযোগিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে,

চুরি খুব কমই হয় তবে তাহারা উহার কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। কলিকাতায় ফ্লাটের বাড়ীতে চুরি লাগিয়াই আছে কিন্তু আমরা কোন সতর্কতা অবলম্বনের কথা চিন্তাই করি না।

চীনা ইতিহাস এবং জাপানী ইতিহাসের অধ্যাপকেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুজনেই মহিলা। দ্বারভাঙ্গার একটি যুবক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. পড়িতেছিল। তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এটি এক বিচিত্র চীজ। দ্বারভাঙ্গার গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। আমেরিকায় আসিয়াই ছোট ছোট সভায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। নিজের কাহিনী বলিল—এই ভাবে বিভিন্ন সভায় ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন একটি তরুণীকে দেখিয়া তার প্রেমে পড়িয়া গেলাম। ঠিক করিলাম একে বিবাহ করিতে হইবে। আলাপ জমাইয়া জানিলাম মেয়েটি সুইডিশ। কয়েক দিনের চেষ্টাতেই মেয়েটি বিবাহে রাজি হইয়া গেল। বিবাহ হইল। এখন দুটি ছেলে হইয়াছে। সে নিজে ভারতীয় নাগরিক, পত্নী সুইডিশ নাগরিক, ছেলেরা আমেরিকান নাগরিক।

ডাঃ এমব্রি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—ইনি একটি Walking Encyclopedia। তার পরে আমার পাশ করা দশটি বিষয় নির্ভুল ভাবে একে একে বলিয়া গেলেন। অন্যান্য জায়গাতেও দেখিয়াছি অনেকে এই জিনিষটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এতগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে সময় কোথায় পাইলেন? ডাঃ এমব্রি এবং উইলকক্স দুজনেই বলিলেন—আপনি কখন এবং কতক্ষণ পড়েন?

—আমি ভোর ছয়টায় উঠি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পড়ার টেবিলে বসি। বেলা একটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করি। এর ব্যতিক্রম খুব কম হয়।

—প্রতিদিন অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা?

—হাঁ, নির্ঘাৎ।

পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি। এদের দেশে বিদ্যা যাচাই করার রীতি বড় ভয়ানক। কোন্ ক্লাস তাহা জিজ্ঞাসা করে না। জেরার চোটে বাজাইয়া নেয়। এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও ছাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে অধ্যাপকের ধারণা একটা মস্ত জিনিষ। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের প্রধান অধ্যাপকদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আলাপ করিয়াছি। এক একজন অধ্যাপক

একেবারে নাড়ী পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সব জায়গাতেই একটা ছাপ রাখিয়া আসিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য আমার প্রবেশ নিষেধ। অপরাধ—সেকেণ্ড ক্লাস এম.এ.।

ডাঃ এমব্রির বাড়ীতে পাকিস্থানী অধ্যাপকের উপরেই আমি বেশী চড়াও হইলাম। পাকিস্থান সম্বন্ধে এদের ধারণা কি, বিশ্ববিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিষয়ের অধ্যাপকের নিকট তাহা জানিয়া নেওয়ার সুযোগ হারাইতে চাহিলাম না। সিং একটা খুব উপকার করিয়াছিল। তার ভাঁড়ামো দ্বারা অন্যদের বেশ জমাইয়া নিয়াছিল।

পাকিস্থান সম্বন্ধে এদের জ্ঞান আদৌ গভীর নহে, পল্লবগ্রাহী। দুই জাতি থিওরীতে পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে, তবে ভারতে কোন মুসলমান এবং পাকিস্থানে কোন হিন্দুর বাস ঐ নীতিসঙ্গত হইতেছে কি না—এ কথাটা আমেরিকানরা গভীরভাবে চিন্তা করে না। ধরাইয়া দিলে ধরিতে পারে। বলিলাম—পাকিস্থান সৃষ্টির সময় ভারতে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে ৯ কোটি ছিল মুসলমান। জিন্না বলিলেন—হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পাশাপাশি বসবাস অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের আলাদা হোমল্যাণ্ড চাই। হোমল্যাণ্ড তাহারা পাইল কিন্তু চার কোটি মুসলমান ভারতে রহিয়া গেল। পূর্ব্ব পাকিস্থানে পড়িল সওয়া কোটি হিন্দু। পশ্চিম পাকিস্থানে ও ভারতে পুরাপুরি লোকবিনিময় হইয়া গেল। পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের তাহারা এক এক ধাক্কায় ভারতে পাঠাইতে লাগিল। এখন সেখানে হিন্দু টিঁকিয়াছে মাত্র ৭০ লক্ষ। দুই জাতি ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর তাহারা বলিতেছে ইসলামিক ষ্টেট, আমরা বলিতেছি সেকুলার ষ্টেট। তাহারা দৃঢ়হস্তে হিন্দু তাড়াইয়া পাকিস্থানকে একমাত্র মুসলমান অধ্যুষিত দেশ করিয়া তুলিতেছে। হিন্দুকে প্রথম হইতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তাহাদের দয়ার উপর অসহায় ভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। আর ভারতে মুসলমানেরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক রূপে পূর্ণ অধিকার ও মর্য্যাদা নিয়া বাস তো করিতেছেই বরং মাইনরিটিত্বের দাবীতে হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা অনেক দিক দিয়া আদায় করিতেছে। ভারত হইতে দেশ বিভাগের সময় অনেক মুসলমান পাকিস্থানে গিয়াছে, অবস্থা শান্ত হইবার পর আর যায় নাই। সুতরাং আমাদের সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভারতের মুসলমানদের একটি অংশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাইয়াছে এবং তাহাদের রাজ্যলাভের নীতি অনুসারে ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্থানে

নিয়া যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই, অথচ সমগ্র পাকিস্থান হিন্দুশূন্য করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে এবং আর বছর দশেকের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণ করিবে। ভারতে মুসলমানেরা আজও পাকিস্থানের দিকে তাকাইয়া আছে, পাকিস্থান তাহাদের মোড়লী করে, ইহাতে ভারতে অশান্তি হয়। মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে বাস করিতে পারে না—মুসলমানদের এই যে দাবী আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইল এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে কার্য্যে প্রযুক্ত হইল তাহা ভারতে পাকিস্থান সৃষ্টির পরেও একই অবস্থায় রহিয়া গেল। মুসলমানের সংখ্যা কিছু কমিল এই মাত্র। বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহের ফলে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক দ্রুত বাড়ে এবং ইহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি নাই। আর দুই বা তিন দশক বাদে আমাদের অবস্থা আবার ঠিক সেই ১৯৪৭-এ গিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু পাকিস্থানে ঐ সমস্যা থাকিবে না।

নৈশ ভোজের হাসি তামাসার ভিতর দিয়া এত গম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জমানো সহজ নয়, তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বেশ বুঝিলাম ভারতের পক্ষে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষিত মহলে—বিশেষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র পরিচালকদের সঙ্গে ভাল ভাবে আলোচনা চালাইলে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের প্রচারের ও ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে মোটেই সময় লাগে না।

হোটেলে ফিরিলাম। রাত্রি তখন প্রায় একটা। মনটা খচ খচ করিতে লাগিল। যে কাজ পারি তাহা করার সুযোগ নাই।

ডাঃ এমব্রিকে বলিয়াছিলাম—আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি জিনিষ দেখিতে চাই, লাইব্রেরী এবং স্কুল অফ জর্ণালিজ্‌ম্। ঐ দিনই অপরাহ্নে তার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। সেখানকার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রভর্ত্তির ডীন ফ্রীম্যানের সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা। রিভার ক্লাব হইতে ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে কাউন্সিল অফিসে পৌঁছিলাম। সেখানে কয়েক মিনিট ডাঃ হেনরী অব্রের সঙ্গে কথা বলিয়া রওনা হইলাম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

ফ্রীম্যান অপেক্ষা করিতেছিলেন। ফ্রীম্যানের টেবিলে দেখিলাম একটি বাঙ্গালী ছাত্রের দরখাস্ত। ঠিকানা ল্যান্সডাউন রোড। নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। ফ্রীম্যানের নিকট বিদায় নিয়া ডাঃ এমব্রির কাছে গেলাম।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীগুলির মধ্যে কলম্বিয়ার স্থান চতুর্থ—পুস্তক সংখ্যা ৩০ লক্ষের কিছু কম। হার্ভার্ড প্রথম—৬০ লক্ষ বই, ইয়েল দ্বিতীয়—৪৫ লক্ষ বই, ইলিনয় তৃতীয়—৩০ লক্ষ বই। লাইব্রেরীর প্রধান বাড়ীর নাম লো মেমোরিয়েল লাইব্রেরী। উহারই একটি কক্ষে ডাঃ এমব্রি বসেন।

লাইব্রেরীর জন্য ছাত্র পিছু খরচে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অবশ্য অনেকটা নীচে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর জন্য মাথাপিছু খরচের দৃষ্টান্ত :

হার্ভার্ড	বার্ষিক	২০৯	ডলার	বা ১০৪৫	টাকা
ইয়েল	,,	১৬৬	,,	৮৩০	,,
প্রিন্সটন	,,	১৬৬	,,	৮৩০	,,
চিকাগো	,,	১৫২	,,	৭৬০	,,
কলম্বিয়া	,,	১২০	,,	৬০০	,,

বছরে প্রতি ছাত্রের লাইব্রেরীর সুবিধার জন্য ৬০০ টাকার বেশী খরচ করিতে পারে না বলিয়া এরা দুঃখিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ খরচ বোধ হয় বছরে ছয় টাকাও নয়।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহার বইগুলি দেশের অন্য যে কোন লাইব্রেরীর তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হয়।

লাইব্রেরীর এশিয়া সংগ্রহে গেলাম। দুইটি বড় তাক বোঝাই দেখিলাম স্বামী বিবেকানন্দের নিজের লেখা এবং তাঁর সম্বন্ধে লেখা বই। স্বামীজী সম্বন্ধে এত বই এক জায়গায় আর কোথাও দেখি নাই। দুই একটি বই টানিয়া নিয়া দেখিলাম রীতিমত ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ এমব্রি আর একটি তাক দেখাইলেন। উহাতে রহিয়াছে রুশ ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের বই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়ার মত কত ছাত্র এখানে আছে?

এমব্রি হাসিয়া বলিলেন—এখন নাই, ভবিষ্যতে তো হতে পারে? তখন যদি বই না পাওয়া যায় তার জন্য বইগুলি এখন হতেই সংগ্রহ করা চলেছে।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রভক্তির নিদর্শন নাচ আর গান। ওদের দেশে রবীন্দ্র-ভক্তির নমুনা—তাঁর বই পাছে ভবিষ্যতে পাইতে অসুবিধা হয় তার জন্য এখন হইতেই সংগ্রহ।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্কুল অফ লাইব্রেরী সার্ভিস আছে। উহাতে

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা দেওয়া হয় এম. এস.। ডক্টর অফ লাইব্রেরী সায়েন্স ডিগ্রী দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে। লাইব্রেরী স্কুলে দুই প্রকার ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে—ফুল টাইম এবং পার্টটাইম। ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রের দ্বিগুণেরও বেশী। মোট প্রায় শ'পাঁচেক।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগিল—এরা লাইব্রেরী টেকনিক শিক্ষাকেই সর্ব্বস্ব মনে করে না, বরং লাইব্রেরী সায়েন্স কারিকুলামে উহার দিকে যাহাতে অযথা বেশী মনোযোগ (undue attention) না দেওয়া হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলে। এদের ধারণা লাইব্রেরী সায়েন্স শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে to concentrate on the intellectual ingredients of the librarian's task.

লাইব্রেরীতে এক চক্কর দিয়াই বুঝিলাম এটি দেখা দু তিন ঘণ্টা তো দূরের কথা, দুই তিন সপ্তাহেরও কর্ম্ম নয়। যেখানেই ঢুকিতাম সেখানেই সময়ের অভাব মনকে পীড়িত করিত। কিন্তু উপায় নাই। স্কুল অফ জর্ণালিজ্‌মে রওনা হইলাম।

সদর দরজায় ঢুকিয়াই নজর পড়িল একটি লেখার দিকে। ১৯০৪-এর মে মাসে "নর্থ আমেরিকান রিভিউ"-তে যোসেফ পুলিটজার লিখিয়াছিলেন—

> Our republic and its press will rise or fall together. An able disinterested, public spirited press, with trained intelligence to know the right and courage to do it, can preserve that public virtue without which popular government is a sham and a mockery. A cynical, mercenary, demagogic press will produce in time a people as base as itself. The power to mould the future of the republic will be in the hands of the journalists of future generations.

এমব্রিকে বলিলাম—একটু দাঁড়ান, এটা আমি টুকে নেব।

টুকিলাম। ভাবিলাম—মাত্র ১৫ বৎসরে গণতন্ত্রের যে অবনতি আমরা দেখিতেছি তাহার কারণ আজ হইতে ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে একজন আমেরিকান এমন নিখুঁত ভাবে কিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ডাঃ এমব্রি স্কুলের অফিসে নিয়া গেলেন। ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া

দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—মিঃ বর্ম্মণ পুলিটজারের বাণীতে খুব আগ্রহশীল, ওটি টুকে নিয়েছেন।

ডিরেক্টর একটি পুস্তিকা দিয়া বলিলেন—বৃথা পরিশ্রম করেছেন, ওটি এতে আছে। এই বাণী আমাদের জর্ণালিজ্‌ম স্কুলের মূলমন্ত্র।

জর্ণালিজ্‌ম শিক্ষা বলিতে এদের মোটামুটি কথা এইরূপ: ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি নাগরিকের উপর যে সমস্ত ঘটনার প্রভাব আসিয়া পড়ে তাহার তাৎপর্য্য সব সময় নিজে দেখিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তার থাকে না। দায়িত্বশীল গণ-তান্ত্রিক নাগরিকরূপে উহা উপলব্ধির জন্য যে ন্যূনতম জ্ঞান প্রয়োজন তার জন্য তাহাকে ওয়ার্কিং জর্ণালিষ্টের দক্ষতা ও সততার উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ডাক্তার বা উকীলের দক্ষতা ও সততার উপর রোগী বা মক্কেলকে যেরূপ নির্ভর করিতে হয়, ইহাও তদনুরূপ। ঘটনা সাজাইয়া উহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা, ইচ্ছা এবং ট্রেইণ্ড দক্ষতাই শুধু সাংবাদিকের পক্ষে যথেষ্ট নহে, উহা intellectual and social context-এ—বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিক পরি-প্রেক্ষিতে—তুলিয়া ধরিবার ক্ষমতা তার থাকিতে হইবে। এই দক্ষতার জন্যই সাংবাদিকতাকে আধুনিক জগতে ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি প্রাচীন পেশার সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবাদপত্রের কর্ম্মচারী মাত্র হইলে চলিবে না, তার সামাজিক কর্ত্তব্য—social function—সব সময় মনে রাখিয়া সেই আলোকে কাজ করিতে হইবে।

আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এত ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা করিতেছে, স্কুল কলেজের ভিতর দিয়া নবলব্ধ জ্ঞান ছড়াইয়া দিতেছে, সারাটা পৃথিবী সম্বন্ধে নব নব জ্ঞান আহরণে এবং বিস্তারে কেন তাহাদের এই ব্যাকুলতা—পুলিটজারের বাণীটিতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। এরা বলিতে চায়—তুমি নাগরিক, তর্কের অধিকার তোমার আছে কিন্তু জিনিষটা জানিয়া এবং বুঝিয়া তর্ক করিও।

আর আমাদের দেশে? যে যত বড় এন. পি. পি. (না পড়ে পণ্ডিত) তার গলার জোর এবং দাপট তত বেশী। মেহের আলি আমাদের দেশে এখন আর পাগলা নাই, সে এখন সেয়ানা। সকল ঘাঁটিতে তার অধিষ্ঠান। পাণ্ডিত্য দেখিলেই হাঁকিবে—তফাৎ যাও।

জর্ণালিজ্‌ম স্কুলে আর একটি কথা শিখিলাম—Age of Acceleration।

অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞান প্রতিদিন যে দুর্দ্ধর্ষ দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতেছে তাহাতে আধুনিক যুগের এই নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। পুলিটজার প্রাইজ আমেরিকান সাংবাদিকের সর্ব্বোচ্চ সম্মান। পুলিটজার স্কুল অফ জর্ণালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কুলের প্রথম প্রস্পেক্টাসেই ঐ বাণী মুদ্রিত হইয়াছে। দ্রুত টাইপ করিতে না জানিলে এই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায় না।

স্কুল মানেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট। ছাত্র সংখ্যা ৮০। অধ্যাপক ১২। অধ্যাপকেরা সকলে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাহাতেও কুলায় না। বছরে বাহিরের আরও ২৫ জন বিশেষজ্ঞকে লেকচার দিতে আনা হয়। এখানকার পাশকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭০ জন শুধু "নিউ ইয়র্ক টাইমসে" কাজ পাইয়াছে। ১৭৫ জনের বেশী অন্যান্য সংবাদপত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১০০ জনের বেশী আছে দ্বিতীয় ধাপে। পড়ার খরচ খুব মারাত্মক নয়। পড়া, থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সব শুদ্ধ বছরে ২৭০০ ডলার। সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিয়া টাকাটা উপার্জ্জন করিয়া আনিতে এরাই চেষ্টা করে। এই সময়টা কাজ করিলে পড়ার কোন ক্ষতি হয় না। হঠাৎ প্রয়োজনে নামমাত্র সুদে স্কুল হইতে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা তো আছেই, সাধারণ ব্যাঙ্ক হইতেও ঋণ এরাই পাওয়াইয়া দেয়। এই স্কুলে আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রদের পাঠাইয়া দিলে নিজেরাই খরচ চালাইয়া পাশ করিতে পারে, আমেরিকার বৃহত্তম সংবাদ-পত্রে কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেশের স্বার্থ দেখিতে পারে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী নহেন। তাঁহারা পিপীলিকার পশ্চাৎদেশ টিপিয়া গুড় উদ্ধারের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফরেণ রিলেসন্স কাউন্সিল

কাউন্সিল অন ফরেণ রিলেসন্স আমেরিকায় বৈদেশিক তথ্য সংগ্রহের একটি প্রধান কেন্দ্র। বিশ্ববিখ্যাত ত্রৈমাসিক "ফরেণ অ্যাফেয়ার্স" এদের মুখপত্র। রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রনায়কেরা এই ত্রৈমাসিকের লেখক।

কাউন্সিলের একজিকিউটিভ সেক্রেটারী জর্জ্জ ফ্রাঙ্কলিন তাঁর ঘরে নিয়া গেলেন। বাড়ীটি পুরাণো। নূতন সাজে উহাকে সাজানো হইতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ফরেণ অ্যাফেয়ার্সের পাঠক শুনিয়া উহার সম্পাদক হ্যামিলটন আর্ম্মষ্ট্রং-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। দূর বিদেশ হইতে একজন পাঠকের আগমনে সম্পাদক খুব আনন্দিত হইলেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ বৈঠকী আলাপ হইল। তার মধ্যে একটা নূতন মজার জিনিষ জানিলাম। কি নিয়া যেন চিঠি লেখার কথা হইল। ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন—আমাকে মাঝে মাঝে ইউরোপ বা এশিয়ায় যাইতে হয় কিন্তু আমি বাড়ীতে চিঠি লিখি না।

—সে কি? তাঁরাও লেখেন না?

—না।

—কতদিন বাইরে থাকেন?

—বেশ কয়েক মাস।

আমার চক্ষু ছানাবড়া হইতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—আমরা চিঠি লিখি না, কথা বলি।

—কি রকম?

—আমি দুটি ডিক্টাফোন কিনিয়াছি। একটি আমার সঙ্গে থাকে, একটি থাকে বাড়ীতে। আমার কথা বলা রীলটি বাড়ীতে পাঠাই, পত্নী পুত্র কন্যারা তাদের রীল আমাকে পাঠায়। আটলান্টিক অথবা প্যাসিফিকের দুপারে বসিয়া আমরা একে অপরের কথা শুনি। চিঠি লেখার কি দরকার?

এবার কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম—আমেরিকা এবং রাশিয়ার অর্থনীতির একটা ব্যালান্স শীট তৈরি করিতে চাই। গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই দুটি দেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন উন্নত করিতে চাহিতেছে। একটি গণতান্ত্রিক, অপরটি সোসালিষ্ট উপায়ে। দেশ হিসাবে অর্থ নৈতিক শক্তি এবং ব্যক্তি হিসাবে অর্থ নৈতিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এই দুই দিক দিয়াই আমি তুলনা করিতে চাই। কার্ণেগী এনডাওমেণ্টের ডাঃ ভান শ্লাইকের সহিত ইহা নিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি বইয়ের নাম দিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া সেগুলি পড়িব। কিন্তু সেগুলি Secondary Source এবং Study। মিস ওলগেমুথ ইনষ্টিটিউট অফ রাশিয়ান ষ্টাডিজের ডিরেক্টর ডাঃ পেনারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে কিন্তু আমি ঠিক যাহা চাহিতেছি তাহা তাঁর কাছেও পাই নাই। ইহাদের প্রধান গবেষণা কেন্দ্র মিউনিকে। যাওয়ার পথে মিউনিক হইয়া যাওয়ার এবং ঐ কেন্দ্র দেখিবার ইচ্ছা আছে। ফরেণ অ্যাফেয়ার্সে'র পাঠক হিসাবে আপনাদের সংগৃহীত তথ্যের ষ্টাণ্ডার্ড এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান আছে। এই জন্য আপনার কাছে আমি বিষয়টি জানিতে চাই।

—আপনি ঠিক জায়গাতেই প্রসঙ্গটি তুলিয়াছেন। ডাঃ ভান শ্লাইক যে সব বইয়ের নাম দিয়াছেন তাহা হইতে এবং ডাঃ পেনারের ইনষ্টিটিউট হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা। ইনষ্টিটিউট অফ রাশিয়ান ষ্টাডিজ রাশিয়া হইতে পলাতক (emigre) রাশিয়ানদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত। সঠিক তথ্য সেখানে পাইবেন, তবে তাঁদের মতামত একটু সাবধানে নিলে ভাল হইবে।

—তা ঠিক। পাকিস্থান হইবার পর emigre-দের কথা কতটা যাচাই করা দরকার তাহা আমরাও বুঝিয়াছি। তবে আমি কাহারও নিকট হইতেই মতামত নিব না, আমি শুধু তথ্য চাই। আপনাদের দেশের অর্থ নৈতিক শক্তির কথা বইয়ে পড়িয়াছি, এখন দেশের সাধারণ মানুষের প্রাচুর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য চোখে দেখিয়া গেলাম। রাশিয়ায় যাই নাই। রাশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রধান বাধা তাহাদের অর্থ নৈতিক সাহিত্যের অভাব। শোয়ার্জের "রাশিয়ার সোভিয়েত অর্থনীতির" মত বই খুব কম আছে। অথচ আমেরিকা ইংলণ্ড জার্ম্মেণী

জাপানের অর্থনীতি বিস্তৃত ভাবে জানিবার মত বই অপর্য্যাপ্ত। রাশিয়া সম্বন্ধে অন্য দেশের লেখকের বই বা প্রবন্ধ কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা বোঝাও খুব কঠিন। আমার একটি বিশেষ খটকা লাগিতেছে এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার পরে পশ্চিম জার্ম্মেণী এবং জাপান আবার আমেরিকার সাহায্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এটম বোমার আঘাতও জাপান কাটাইয়া উঠিতে পারিল কিন্তু রাশিয়ার সাহায্যে পূর্ব্ব জার্ম্মেণী এবং পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ষ্টাণ্ডার্ডে পৌঁছিতে পারিল না কেন? কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, রাশিয়া ইহাদের উন্নতি চায় না বলিয়া ইহাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বেশী সাহায্য দেয় নাই। আমার তাহা মনে হয় না। রাশিয়া ইহাদিগকে প্রচুর সাহায্য দিয়াছে, চীনকেও দিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে রাজনীতি থাকিবেই, আমি রাজনীতি বাদ দিয়া শুধু অর্থনৈতিক দিকটা বুঝিতে চাই।

—আপনি কি চাহিতেছেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। তবে আমি এখনই ঐ সমস্ত তথ্য দিতে পারিতেছি না, পরে পাঠাইয়া দিব।

ফ্রাঙ্কলিন কথা রাখিয়াছিলেন। অতিশয় আশ্চর্য্য এবং প্রামাণ্য তথ্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমেরিকান কংগ্রেসের একটি যুক্ত অর্থনৈতিক কমিটি বসিয়াছিল। ঐ কমিটি রাশিয়ান অর্থনীতি বিষয়ে পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়াছেন। আমেরিকার শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা প্রভৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা রাশিয়া সম্বন্ধে যত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কমিটি সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেকে তাঁর বক্তব্য বলিয়াছেন। তার পর উহা নিয়া কমিটিতে আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার প্রতিটি শব্দ কার্য্য বিবরণীতে ছাপা হইয়াছে। উহার চারিটি খণ্ড ফ্রাঙ্কলিন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। রাশিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যে কত কম এই বইগুলি তার জলন্ত নিদর্শন। বইগুলিতে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। স্কলারের জাতিভেদ নাই, জ্ঞান চর্চ্চা ও সাধনায় নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে, উহা ছাপিয়া বিশ্ব সমাজের সামনে তুলিয়া দিতে আমেরিকান স্কলারদের এমন কি গবর্ণমেণ্টেরও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। কমিটির আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর আলান ডালেস। তিনিও অনেক

বিষয়ে আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে বলিয়া গিয়াছেন। কমিটিতে প্রদত্ত আমেরিকান জাতীয় শিক্ষা এসোসিয়েসনের ডাঃ এশেলম্যানের রিপোর্টে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই এসোসিয়েসনের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ ডাঃ সামুয়েল ল্যাম্বার্টের সঙ্গে ওয়াশিংটনে আলাপ হইয়াছে।

ডাঃ এশেলম্যান রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় শিক্ষকদের বেতন ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব কম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান ইনষ্টিটিউটের ডাঃ নিকোলাস ডিউইট বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে রুশ ভাষায় লেখা ছয়টি বই এবং কয়েকটি জর্ণাল তিনি পাইয়াছেন, সেগুলি এখনও অনুবাদ করা হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে যে, আমেরিকান শিক্ষক অপেক্ষা রাশিয়ান শিক্ষকের আয় অনেক বেশী। আমেরিকার পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের গড়পড়তা বেতন ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল বার্ষিক ৪৬৫০ ডলার বা ২৩২৫০ টাকা। মাসে আমাদের প্রায় দুই হাজার টাকা। প্রারম্ভিক বেতন ধরিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আয়ের তুলনায় শিক্ষকের বেতন হয় এইরূপ :

ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৬১৬ ডলার
একাউণ্টেন্সি	৪৯৯২ ,,
সেলস	৪৯৪৪ ,,
সাধারণ ব্যবসা	৪৮৯৬ ,,
অন্যান্য	৫১৪৮ ,,
শিক্ষক	৩৬৫০ ,,

অর্থাৎ একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রারম্ভিক বেতন যেখানে মাসে প্রায় ৪৭০ ডলার, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকের প্রারম্ভিক বেতন ৩০০ ডলারের কিছু বেশী।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষকদের কাজের সময় মাধ্যমিক স্কুলে সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা, প্রাথমিক স্কুলে ২৪ ঘণ্টা। প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন আরম্ভ হয় মাসিক ৬৭০ রুবলে। এক রুবল আমাদের প্রায় পাঁচ সিকা। ৪১ সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজের বেতন, আমাদের হিসাবে প্রায় ৮০০ টাকা। নির্দিষ্ট সময়ের বেশী কাজ করিলে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকের সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা কাজের জন্য প্রারম্ভিক বেতন মাসে ৭৫০ রুবল। এই সময়ের অতিরিক্ত ক্লাস নিলে আলাদা টাকা পায়। প্রাথমিক শিক্ষকের সর্ব্বোচ্চ বেতন মাসে ৯০০ রুবল এবং মাধ্যমিক শিক্ষকের ১২০০ রুবল। ডাক্তারের প্রারম্ভিক বেতন এইরূপ। ছুতার

মিস্ত্রির বেতন মাসে ৫০০ হইতে ৬০০ রুবল, হোটেলের বয় ৪০০ রুবল (বকশিষ আলাদা), ষ্টোর ম্যানেজার ১০০০ রুবল ও তদূর্দ্ধ এবং রাস্তার ঝাড়ুদার ৩০০ রুবল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের (এই কলেজটি দেখাইয়া ডাঃ এমব্রি বলিয়াছিলেন—আপনাদের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী এখান হইতে পাশ করিয়া গিয়াছেন) অধ্যাপক জর্জ্জ বোরনে বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট শিক্ষকদের বেতন ডাক্তার ও উকীলদের সমান এবং সোভিয়েট শ্রমিক অপেক্ষা নিশ্চিত ভাবে বেশী। (Definitely superior to that of the Soviet workers) প্রিন্সটনের এডুকেশন টেষ্টিং সার্ভিসের ডাঃ হেনরী চন্সিরও ইহাই অভিমত। নিউইয়র্ক টাইমসের হ্যারিসন সলিসবার্গ বলিয়াছেন—সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাথমিক শিক্ষকের জীবনযাত্রার মান আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষকের সমান।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষকের মর্য্যাদা সম্পর্কে ডাঃ এশেলম্যান বলিতেছেন—সোভিয়েট শিক্ষক সাধারণ ভাবে সমস্ত স্তরে আমেরিকান শিক্ষক অপেক্ষা অধিকতর মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। (In terms of prestige, the Soviet teacher, generally speaking, has greater respect at all levels than the American teacher enjoys in the United States of America.) যে সমস্ত আমেরিকান পর্যাটক রাশিয়া গিয়াছেন এবং রাশিয়া হইতে সম্প্রতি যে দুইটি তরুণ দল ওয়াশিংটন আসিয়াছিল তাহাদের মন্তব্যেও ইহাই সমর্থিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০শে নবেম্বর একটি সোভিয়েট তরুণ পর্য্যটক অত্যন্ত গম্ভীরভাবে (in all seriousness) বলিয়াছিল—"আপনাদের শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিকট হইতে আরও বেশী সম্মান কেন পান না?" ডাঃ এশেলম্যান স্বীকার করিতেছেন যে, অন্ততঃ সহরাঞ্চলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের সম্মানবোধ জাগানো অনেক বেশী প্রয়োজন। কোন দেশ যদি শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে আন্তরিকতাপূর্ণ হয় তবে শিক্ষকের মর্য্যাদা ও সম্মান সে অধিক পরিমাণে দিতে বাধ্য। বেতন ও মর্য্যাদায় রাশিয়ার শিক্ষকের অবস্থা আমেরিকান শিক্ষক অপেক্ষা নিশ্চিত ভাবে ভাল, ইহা স্বীকার করিতে উচ্চতম পদাধিকারী আমেরিকানরাও সঙ্কুচিত হয় নাই।

ডাঃ পেনারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ফ্রাঙ্কলিন এবং প্যাট্রিসিয়া ওলগেমুথ দুজনেই করিয়া ছিলেন। পেনার টুডোর হোটেলে আসিয়া লাঞ্চের জন্য এক

রেস্তোরাঁয় নিয়া গেলেন। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রেস্তোরাঁর সামনে আমাকে নামাইয়া দিয়া পেনার গাড়ী রাখিবার জায়গা খুঁজিতে গেলেন। প্রায় আধঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—জায়গা পাইয়াছি তবে মাইল খানেক দূরে।

আমার ব্যালান্স শীট তৈরি নিয়া দীর্ঘ আলোচনা হইল। বহু কাগজপত্র দিলেন এবং পরে পাঠাইলেন। ফ্রাঙ্কলিন এবং পেনার প্রদত্ত বই এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে অর্থনৈতিক ব্যালান্স শীট মোটামুটি এইরূপ একটি খাড়া করিতে পারি :

ক্যাপিটালিষ্ট এবং সোসালিষ্ট দেশ সমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ চলিয়াছে। উভয়ের সংঘাত এখন চরমে উঠিয়াছে। এই সংঘাতে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, উভয়ের আদর্শ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া না গিয়া ক্রমশঃ যেন একই লক্ষ্যে গিয়া মিলিত হইতে চাহিতেছে। উভয়ের আদর্শের পার্থক্য ক্রমশঃ এবং খুব দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। উভয়ের সাফল্য কতটা হইয়াছে তার একটা মোটামুটি ব্যালান্স শীট তৈরী করা যাইতে পারে।

আমেরিকায় ১৯৬০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৩০০ ডলার বা ১১৫০০ টাকা। কেবলমাত্র মাথাপিছু আয়ের অঙ্কের দ্বারা কোন দেশের আর্থিক সম্পদ বা দারিদ্র্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। সমাজের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকেদের আয়ের হিসাব দেখিলে তবেই ঐ দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক চিত্র উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকার শিক্ষকদের বেতন এইরূপ :

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক	...	৩২৫ ডলার বা	১৬২৫ টাকা
মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক	...	৪৮০ ডলার বা	২৪০০ টাকা
কলেজ অধ্যাপক	...	৮০০ ডলার বা	৪০০০ টাকা

ইহা প্রারম্ভিক বেতন মাত্র।

যে সমস্ত লোক সাধারণ কাজ করে, টেকনিকাল দক্ষতা সম্পন্ন কাজ করে না, তাহারা ঘণ্টায় ২·২৬ ডলার বা ১১·৩০ টাকা উপার্জ্জন করে। দিনে ইহারা ছয় ঘণ্টা কাজ করিলেও দৈনিক আয় প্রায় ১৪ ডলার হয়। মাস হিসাবে আয় প্রায় দুই হাজার টাকায় দাঁড়ায়।

এই আয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সাধারণ মানুষের

আয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৬ সালে মাসে ৩০০০ ডলার বা ১৫০০০ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিত এরূপ লোকের অনুপাত ছিল শতকরা ৩০ জন, ১৯৫৩ সালে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ ১৭ বছরে উহা দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী তথ্য পাই নাই।

আমেরিকার আয়ের প্যাটার্ণে একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। উপরের দিকের আয় কমিতেছে, নীচের দিকের আয় বাড়িতেছে। ১৯২৯ সালে জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ মাত্র এক শতাংশ লোক ভোগ করিত। এখন সর্ব্বোচ্চ স্তরের এক শতাংশের ভাগ ৮ শতাংশ হইতেও কম হইয়াছে।

রাশিয়ার সহিত এই ধরণের তুলনা করিবার উপযুক্ত তথ্য এখনও বেশী পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অনেক পুরাতন তথ্য। ১৯৪৯ সালে আমেরিকার মাথাপিছু আয় ছিল ১৪৫৩ ডলার, রাশিয়ার ছিল ৩০৮ ডলার। ইহার পরবর্ত্তী অঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

আয়ের সহিত মূল্যমান যাচাই করার উপযুক্ত তথ্য আজকাল পাওয়া যায়। শ্রীমান ব্রাইসনের Outline of Man's Knowledge of the World বইটি হইতে এই তথ্যটি দিলাম :

এক ডজন ডিম এবং প্রত্যেকটি আধ কিলো করিয়া রুটি, মাখন, চীজ, আলু চিনি এবং চর্ব্বি কিনিতে হইলে নিম্নোক্ত পরিমাণ সময় কাজ করিয়া টাকা আনিতে হয় :

আমেরিকায়	৯৬	মিনিট
ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ইসরায়েল	২০০	মিনিট
রাশিয়ায়	৮৫২	মিনিট

অর্থাৎ দিনের খাদ্য সংগ্রহ করিতে একজন আমেরিকান শ্রমিককে যে পরিশ্রম করিতে হয়, একজন বৃটিশ শ্রমিককে করিতে হয় তার দ্বিগুণ, রাশিয়ানকে দশগুণ।

১৯৫৯ সালে আমেরিকান কংগ্রেস রাশিয়ার অর্থ নৈতিক অবস্থা বিচার এবং আমেরিকার সহিত তাহার তুলনার জন্য যে জয়েণ্ট কমিটি গঠন করিয়া দেন তার রিপোর্ট হইতে কয়েকটি তথ্য দিলাম। উহাই ফ্রাঙ্কলিন প্রদত্ত রিপোর্ট।

১৯৫৯-এ রাশিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের একজন শ্রমিকের মজুরী ছিল প্রায় ১২০০ রুবল। দশ রুবলে এক ডলার হয়। ডলারের হিসাবে ঐ মজুরী হয়

১২০ ডলার। ইহার উপর বোনাস আছে ২০ ডলার, মোট মজুরী হইল ১৪০ ডলার। আমেরিকায় ঐ সময়ে ঐরূপ শ্রমিকের মজুরী ছিল উহার তিন গুণ।

ঐ রিপোর্টে আমেরিকা এবং রাশিয়ায় বাসস্থান লোকে কতটা করিয়া পায় তার দৃষ্টান্ত আছে। রাশিয়ায় মাথাপিছু ৭৯ বর্গফিট হিসাবে জায়গা দেওয়া হয়। চারজনের পরিবার পায় মোট ৩১৬ বর্গফিট অর্থাৎ মোট ১৬ × ১৬ ফিট আয়তনের একটি বা দুটি ঘর। আমেরিকায় গড়পড়তা প্রত্যেকের বাস করিবার জায়গা ৩৭০ বর্গফিট অথবা চার জনের পরিবার ১৪৮০ বর্গ ফিট পায়। ঘরের হিসাবে উহা হয় ৩৮ × ৩৮ ফিট মোট আয়তনের তিন বা চারটি ঘর। আমেরিকায় ৬০ শতাংশ লোকের নিজস্ব আলাদা অনূ্যন চার কামরাযুক্ত বাড়ী আছে।

একটা দেশের লোকের আর্থিক সচ্ছলতা আছে কি না তাহা বুঝিতে হইলে আয় এবং ব্যয়ের বৈষম্য বিচার করিতে হয়। কেবলমাত্র আয় দেখিয়া সঠিক বোঝা যায় না। আয় খুব বেশী কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় তদপেক্ষাও অধিক হইলে সেই আয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বুঝায় না। আমেরিকায় এই জিনিষটি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের আয় বাড়িয়াছে চারগুণ, ব্যয় বাড়িয়াছে দ্বিগুণ। সুতরাং তাহাদের সাধারণ লোকের পকেটে বর্দ্ধিত আয়ের ২০০ পার্সেণ্ট থাকিয়া যাইতেছে এবং ঐ টাকা তাহারা জীবনযাত্রায় আরামের জন্য ব্যয় করিতে পারিতেছে।

আমেরিকান কংগ্রেসের উপরোক্ত কমিটিতে সাক্ষ্য দানের সময় অধ্যাপক লিন টার্গিয়ন একটি সুন্দর জিনিষ দেখান। আমেরিকা এবং রাশিয়ার প্রত্যেকের ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও যানবাহন ব্যয় এবং বীমার প্রিমিয়ামে এবং তার বাহিরে অন্যান্য খরচে প্রতি পরিবারের আয়ের কত শতাংশ ব্যয় হয়—সেই হিসাবটি অধ্যাপক টার্গিয়ন কষিয়াছেন। আমেরিকায় প্রতি পারিবারের আয়ের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধেকই ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া, চলাফেরা, চিকিৎসা এবং প্রিমিয়ামে চলিয়া যায়। রাশিয়ায় যায় ২০ শতাংশ। খাদ্য, বস্ত্র, টেলিভিসন, কাপড় ধোয়া এবং রান্না প্রভৃতির যন্ত্র (durable consumer goods), স্ফূর্তি প্রভৃতির জন্য আমেরিকান পরিবারের হাতে থাকে আয়ের অর্দ্ধেক, রাশিয়ার থাকে ৮০ শতাংশ অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশেরও বেশী। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, durable consumer goods প্রভৃতির দাম রাশিয়ায় এত বেশী যে অর্দ্ধেক অবশিষ্ট আয়ে একটি আমেরিকান পরিবার ঐ সমস্ত জিনিষ যে পরিমাণ কিনিতে পারে আয়ের

৮০ শতাংশ হাতে থাকিলেও রাশিয়ান পরিবার তার চেয়ে অনেক কম জিনিষ পায়। বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা এবং যানবাহনের সুবিধা আমেরিকা অপেক্ষা রাশিয়ায় বেশী। অধ্যাপক টার্গিয়ন বলেন যে খাদ্যের দাম রাশিয়ায় আমেরিকা অপেক্ষা অধিক, বস্ত্রের দাম অত্যধিক কিন্তু **durable consumer goods** এর দাম আমেরিকার তুলনায় বেশী ইহা বলা যায় না।

মোটরগাড়ী ব্যবহারের তারতম্য আধুনিক বিশ্বে জীবনযাত্রার মান তুলনা করার একটি উপায়। ১৯৫৯-এর অক্টোবরে ভ্লাডিভষ্টকে সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভ তাঁর বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়া ছিলেন। আমেরিকান কংগ্রেসের যুক্ত কমিটির রিপোর্টে বক্তৃতার ঐ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন :

"অধিকতর সংখ্যায় মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরাও বহু গাড়ী তৈরি করিব কিন্তু এখনই তাহা করিব না। ধনতান্ত্রিক দেশে মোটরগাড়ী ব্যবহারের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে আমরা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিব। আমেরিকা অপেক্ষা আমাদের দেশে মোটরগাড়ী অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যবহৃত হইবে। আমাদের দেশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ ট্যাক্সি পার্কে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। অত্যাবশ্যকীয় কাজের জন্য (**for essential purposes**) যে কোন লোক ঐখানে মোটর গাড়ী পাইবে।"

আমেরিকায় জনসাধারণের ৬০ শতাংশের নিজস্ব মোটরগাড়ী আছে। একটি বৃহৎ নূতন গাড়ীর দাম দুই হাজার হইতে ২৪০০ ডলার অথবা আমাদের ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার টাকা। সামান্য ব্যবহৃত গাড়ী ৫০০ ডলারের কমে অনেক সময় ১০০ ডলার দামেও পাওয়া যায়। বেশী ব্যবহৃত গাড়ী ৫০ ডলার অথবা আড়াই শত টাকায় বিক্রয় হয়। কাজেই যে কোন সাধারণ লোক গাড়ী কিনিতে পারে। পেট্রলের দাম সস্তা, আমাদের হিসাবে এক টাকা গ্যালন। দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইতেছে গাড়ী রাখিবার জায়গা। ট্যাক্সির খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্সি দুই প্রকার—রাস্তায় অজস্র ট্যাক্সি চলাচল করে, ডাকিলেই হইল। ট্যাক্সি ডাকিবার টেলিফোন রাস্তাতেই থাকে, তাহার দ্বারাও ট্যাক্সি ডাকা যায়। হার্টজ প্রভৃতি কতকগুলি অতিশয় বৃহৎ ট্যাক্সি কোম্পানী আছে, সেখানে একদিন, এক সপ্তাহ অথবা এক মাসের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়। আজকাল

মোটরগাড়ী লীজ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শেভ্রোলে বা ফোর্ড গাড়ী মাসিক ৭০ হইতে ১২৫ ডলার ভাড়ায় লীজ পাওয়া যায়। ১৯৭০ সাল নাগাদ যত নূতন মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে তার এক চতুর্থাংশ হইতে অর্দ্ধেক লোকে এই ভাবে লীজ নিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

সোভিয়েট নেতার উপরোক্ত বক্তৃতায় বেশ বোঝা যায় মোটরগাড়ী ব্যবহারে রাশিয়া আমেরিকা হইতে অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে—ইহা তিনি ভালই জানেন। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে মোটর গাড়ীর ট্যাক্সিরূপে ব্যবহারের কথা চিন্তা করিতেছেন। আমেরিকা পর্য্যাপ্ত ট্যাক্সি তো দিয়াছেই, তদুপরি ৬০ ভাগ লোকের ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী সরবরাহ করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বিষয়ে আমেরিকার কাছাকাছি আসিয়াছে এ দাবী অবশ্য ক্রুশ্চেভ করেন নাই, ট্যাক্সি ব্যবহারে রাশিয়া আমেরিকাকে অতিক্রম করিবে ইহাই শুধু বলিয়াছেন।

দুই দৈত্যের অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে একবিংশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েট নেতা বলিয়াছিলেন :

সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থনৈতিক উন্নতিতে আমেরিকাকে অতিক্রম করিতে চায়। উৎপাদনে আমেরিকাকে পিছনে ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ ধনতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ সূচক সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাওয়া।

১৯৭০ সালে, হয়ত তারও আগে মোট উৎপাদন এবং মাথাপিছু উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে এই ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে আমেরিকার লোক যে পরিমাণ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পাইয়াছে, রাশিয়ার লোক পাইয়াছে তার এক তৃতীয়াংশ। ১৯৫৯-এ জীবনযাত্রার মাথাপিছু মান যাহা ছিল, রাশিয়ার ছিল তার এক চতুর্থাংশ। ইহাতে দেখা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক বেশী।

ক্যাপিটালিষ্ট এবং সোসালিষ্ট অর্থনীতির প্রতিযোগিতা কি ভাবে চলিয়াছে উপরোক্ত বিবরণে তাহা কতকটা বোঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্যাপিটালিজ্‌ম বলিতে যাহা বুঝাইত এখন উহা তদপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ক্যাপিটালিজ্‌ম এখন দৃঢ়পদে সোসালিজ্‌ম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সোসালিজ্‌মের প্রধান উদ্দেশ্য শোষণের অবসান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্যাপিটালিজ্‌ম দ্রুতবেগে সেই একই লক্ষ্য অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, জাপান, আমেরিকা তার নিদর্শন। সোসালিজ্‌ম প্রথম দিকে ব্যক্তিগত

প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। লেনিন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনুমতি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সোসালিষ্ট দেশসমূহে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ভারত ক্যাপিটালিজ্‌ম অথবা অথবা সোসালিজ্‌ম কোনটাতেই বিশ্বাস করে না। মিশ্র অর্থনীতির নামে ভারতে এক অপূর্ব্ব ককটেল তৈরি হইয়াছে। মিশ্র অর্থনীতি উভয় পদ্ধতির দোষগুলি সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, উহাদের গুণের একটাও নিতে পারে নাই।

আমেরিকা যে লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছে এবং যে লক্ষ্যের দিকে রাশিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহা একই জিনিষ—স্বচ্ছল সমাজ (Affluent Society)। উভয়েই এমন সমাজ গড়িতে চায় যেখানে প্রতিটি সাধারণ লোক ভদ্র আরামপ্রদ জীবন-যাপনের গ্যারাণ্টি পাইবে এবং সেই সমাজে শোষণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। সোভিয়েট নেতা এই সুস্থ সমাজকেই কমুনিজ্‌ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ব্লকের প্রতিটি দেশ এই আদর্শ রূপায়িত করিতেই চেষ্টা করিবে। উভয়ের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৯৭০ সাল একটি অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ বৎসর হইবে। রাশিয়া ছুটিতেছে, আমেরিকাও বসিয়া থাকিতেছে না। অর্থ-নীতিক্ষেত্রে উভয়ের এই দৌড় প্রতিযোগিতা এমনই জিনিষ যে উহার ফল বিশ্বের প্রতিটি লোক ভোগ করিতে এবং উহার দ্বারা লাভবান হইতে পারিবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় উভয়ে এমন ভাবে সমান্তরাল লাইনে ধাবিত হইয়াছে যে কেহ কাহারও সঙ্গে কখনো মিলিবে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উভয়ে একই লক্ষ্য অভিমুখে ছুটিয়াছে, উভয়ের প্রভেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যেদিন উভয়ে আসিয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

টাইম এবং লাইফ

মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল টাইম এবং লাইফ অফিসে। পাবলিসিটি ডিরেক্টর জেমস পিট অভ্যর্থনা করিয়া তাঁর অফিসে নিয়া গেলেন। নিউ ইয়র্কের একেবারে কেন্দ্রস্থলে রকফেলার সেণ্টারে নূতন বাড়ী হইয়াছে ৪৮ তলা। যে লিফ্‌টে উঠিলাম সেটি এক্সপ্রেস লিফ্‌ট— ৩৬ তলা পর্য্যন্ত থামে না, তারপর প্রতি তলায় থামিয়া থামিয়া ওঠে। এরূপ এক্সপ্রেস লিফ্‌ট পরে আরও দেখিয়াছি। যে লিফ্‌ট প্রত্যেক তলায় থামিয়া উঠে তাহাকে বলে লোকাল লিফ্‌ট। নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিয়া গিয়াছিলেন অটো টাইটলার। টাইটলারের ওয়াল ষ্ট্রীট অফিসেও এক্সপ্রেস এবং লোকাল দুই জাতীয় লিফ্‌ট দেখিলাম। এ প্রায় বাঙ্গালের হাইকোর্ট দেখার অবস্থা। এতদিন জানিতাম ট্রেণই লোকাল এবং এক্সপ্রেস হয়, বড় জোর ষ্টেট বাস কিন্তু লিফ্‌ট সম্বন্ধে এই জ্ঞান ছিল না।

পিট প্রথমেই টাইমের ম্যানেজিং এডিটার অটো ফয়ারবিঙ্গারকে ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনজনে বেশ জমিয়া উঠিল কিন্তু ফয়ারবিঙ্গার থাকিতে পারিলেন না। সেদিন ছিল টাইম প্রকাশের আগের দিন, শেষ মেক আপ তাঁহাকে দেখিয়া দিতে হইবে। আমারও বরাত খারাপ, দিনটা এত বেখাপ্পা পড়িবে বুঝি নাই, নহিলে উহা বদলাইয়া নিতাম। আমেরিকার ইনটেলেকচুয়াল সমাজে "টাইম" বিশেষ প্রিয় নয়, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে উহার প্রচার ও প্রভাব অসাধারণ।

বাড়ীটির ছাদের কারুকার্য্যে একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। লাইফ তো প্রায় আগাগোড়া পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি। উহার ব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত ব্লকগুলি দিয়া ছাদের সিলিং এমন সুন্দর ভাবে তৈরী করিয়াছে যে, বিস্মিত হইতে হয়। পিটকে বলিলাম—এই কল্পনা যার তাকে তারিফ করিতে হয়।

টাইম পত্রিকার ইতিহাস এক অদ্ভুত বিস্ময়ের বস্তু। কয়েকটি শো কেসে টাইম-এর প্রথম সংখ্যা এবং উহার ইতিহাস সংক্রান্ত কাগজপত্র যত্নের সহিত

রাখা আছে। ১৯২৩-এর ৩রা মার্চ্চ টাইম প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময় উহার প্রচার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এখন টাইমের বারোটি সংস্করণ বাহির হয় এবং সমস্ত মিলাইয়া মোট প্রচার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ। আন্তর্জ্জাতিক সংস্করণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাইম কানাডা, টাইম লাটিন আমেরিকা, টাইম আটলান্টিক, টাইম এশিয়া এবং টাইম দক্ষিণ প্যাসিফিক। আগামী বৎসর হইতে একটি পশ্চিম এশিয়া-আফ্রিকা সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

নিউ ইয়র্কের কেন্দ্রস্থলে টাইমের ৪৮ তলা বাড়ী রকফেলারদের সঙ্গে যৌথ-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। খরচ পড়িয়াছে সাত কোটি ডলার বা ৩৫ কোটি টাকা। চল্লিশ বৎসরের কম সময়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার এই বৈভব আমাদের কল্পনার অতীত। আমাদের ১০ হাজার সার্কুলেসন বজায় রাখিতে এবং আয় ব্যয় সমান করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এক সংখ্যা যুগবাণী—দাম ১৬ নয়া পয়সা—২৫ হইতে ৫০ জনে পড়ে। টাইম দাম ২৫ সেণ্ট বা পাঁচ সিকা। একজনে কেনে, একজনেই পড়ে, পড়া হইলে ট্রাম, বাস বা ট্রেণে ফেলিয়া দিয়া যায়। একজনের পত্রিকার জন্য আর একজন হাত বাড়াইলে হাসে। এটি যাচাই করিয়াছিলাম। ট্রেণে এক ভদ্রলোক যথারীতি টাইম পড়া শেষ করিয়া উহা ফেলিয়া রাখিয়া নামিয়া গেলেন। তাঁর পরের সিটে ছিলাম আমি। পত্রিকাটির জন্য হাত বাড়াইলে ওপারের সিটের ভদ্রলোক উহা আগাইয়া দিলেন কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু দৃষ্টি এড়াইবার মত নয়। তাক করিয়া বসিয়া ছিলাম যে, পরিচয় জানিতে চাহিলে বলিব—আই অ্যাম ফ্রম প্যাকিস্থান। ভদ্রলোক কিছু বলিলেন না।

আমেরিকায় এবং বিদেশে টাইমের সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্র ২৯টি। ঐগুলিতে সংবাদদাতা এবং ফটোগ্রাফারের মোট সংখ্যা ১৪৯। পার্ট টাইম সংবাদদাতার সংখ্যা ৪৪২। এদের বলে Stringer। মূল অফিসে এক এক বিভাগের ভার-প্রাপ্ত আছেন এক একজন ডিরেক্টর। লণ্ডনে এবং আমষ্টার্ডামে এদের নিজস্ব বাড়ী আছে, প্যারিসে বাড়ী তৈরি হইতেছে। টাইম, লাইফ এবং ফরচুন ছাড়া এদের আরও পত্রিকা আছে—স্পোর্টস ইলাষ্ট্রেটেড, আর্কিটেকচারাল ফোরাম এবং হাউস এণ্ড হোম। পিট সমস্ত পত্রিকাগুলির কয়েকটি সংখ্যা হোটেলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এত ভাল পুরু আর্ট পেপারে সেগুলি ছাপা যে উহাদের

ওজন সের দশেক হইবে। ওয়াশিংটন যাত্রার সময় সবগুলিকে ফেলিয়া দিতে হইল, বোঝা বহিতে পারিব না, ষ্টেসনে কুলি মিলিবে না। ডাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়ার বুদ্ধিটা তখনও মাথায় খেলে নাই।

সম্প্রতি ইহারা পুস্তক প্রকাশের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। পিট তাঁহাদের প্রকাশিত একটি এটলাস দেখাইলেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তৈরি আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও দেখাইলেন। একটি কাগজের মিলের অর্দ্ধেক শেয়ার ইহারা কিনিয়া নিয়াছে। কাগজ আনিবার জন্য দুটি বড় জাহাজ কিনিয়াছে। এদের সার্কুলেশন অফিস নিউ ইয়র্কে নয়, চিকাগোতে অবস্থিত।

টাইমের জীবনের প্রথমদিকে লুস এবং হ্যাডেন দুজনে ছিলেন কর্ণধার। একবার একজন সম্পাদনা করিতেন, অপর জন হইতেন ম্যানেজার। ১৯২৯এ হ্যাডেন পরলোক গমন করিলে লুস সম্পাদক এবং ম্যানেজার উভয়েরই কাজ চালাইতে লাগিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর লুস আমেরিকার সাংবাদিক জীবনে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিলেন।

হেনরী লুস-এর যে জীবনকথা জানিলাম তাহা উপন্যাসের মত চমকপ্রদ। আমেরিকার Current Biography 1961 তাঁহাকে Giant of Twentieth Century American Journalism বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

প্রথম চার বৎসর টাইম লোকসানে চলিয়াছে। ১৯২৭-এ প্রথম লাভ হয় ৩৮৬০ ডলার। পরের বৎসরেই সার্কুলেসন দাঁড়াইয়া গেল ২,১৯,০০০ এবং লাভের অঙ্ক হইল ১,২৫,৭৮৭ ডলার। সংবাদপত্রের অগ্রগতির এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই। যুদ্ধের আগে আনন্দবাজার পত্রিকার সার্কুলেসন প্রায় এক লক্ষের কাছে গিয়াছিল। ১৬ পৃষ্ঠা পত্রিকা, দাম ছিল দুই পয়সা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল বোধ হইতেছে এক টাকা চার কিম্বা আট আনা ইঞ্চি। যুদ্ধের সময় হইতে আমাদের সংবাদপত্রের বৈভব আরম্ভ। সরকারী আদেশে কাগজের অভাবের অছিলায় সংবাদপত্রের আকার ১৬ পৃষ্ঠা হইতে কমাইয়া করা হইল ৮ পৃষ্ঠা এবং বিজ্ঞাপনের হার বাড়াইয়া ১৬ টাকা ইঞ্চি করিতে দেওয়া হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহে পত্রিকাসমূহ কৃতজ্ঞ হইল এবং বিয়াল্লিশের বিপ্লবে দৈনিক পত্রের মধ্যে একমাত্র কলিকাতার "ভারত" এবং লক্ষ্ণৌয়ের "ন্যাশনাল হেরাল্ড" ভিন্ন সমস্ত দৈনিক পত্রিকা সরকার পক্ষে চলিয়া পড়িল। ইংরেজ গিয়াছে কিন্তু এই সুযোগ আজও অব্যাহত রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে আমাদের

দৈনিক পত্রিকাসমূহের বৈভব সামান্ত নয় কিন্তু তাহা সদুপায়ে নিজেদের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ নয়। ইহাদের অপরিমিত বিত্তের কারণ হইতেছে সরকারী অনুগ্রহ।

১৯৬০-এ টাইমের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৩,০৫,৮৫,০০০ ডলার বা ১১৫ কোটি টাকার বেশী। আমাদের কল্পনারও অতীত।

খাওয়ার সময় আসিল। টাইমের নিজেদেরই রেস্তোঁরা। ৪৭ তলার উপর রেস্তোঁরা অবস্থিত। পিটের সঙ্গে সেখানে গেলাম। সম্পাদকদের মধ্যে আরও চারজন উপস্থিত ছিলেন। একজন ছিলেন মহিলা। ইনি টাইমের ডিরেক্টর অফ এডুকেশন মেরী টুইডি। নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত রেস্তোঁরায় খাইয়াছি। টাইম রেস্তোঁরা তাদের কারও অপেক্ষা কম যায় না। মেনু আসিলে দেখি সবই হয় গরু নয় শূকর মাংস। একটি আইটেম পাইলাম তলোয়ার মাছ—Sword fish। একে মাছ, তায় নূতন জাত এবং স্থান এত উঁচুদরের রেস্তোঁরা। পরমানন্দে উহাই নিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক চলিল। আলাপে বুঝিলাম এরা প্রত্যেকেই চরমপন্থী। যে ভাল তার সব ভাল, যে খারাপ তার সব খারাপ। তবে একটা জিনিষ ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে চায়। নিজেদের দেশ সম্বন্ধে এরা কি ভাবে তাহা জানিবার জন্য আমেরিকানদের প্রশংসা আরম্ভ করিলাম। সকলেই বলিলেন—শুধু ভদ্র সমাজে মিশিতেছ কি না, জান না এরা কি চীজ। ডলারের উপর লেখা In God We Trust নিয়া খোঁচা দিলাম। এরা কেহই তার উত্তর দিতে পারিলেন না। একজন বলিলেন—আমার মনে হয় সারাটা আমেরিকা ঘুরিয়া বেড়াইলেও ছয় জন লোক ইহার উত্তর দিতে পারিবে না। ভারত সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ প্রচুর। আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, ভাষা সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন পাঁচজনে মিলিয়া করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় খেই রাখিয়া আনুপূর্ব্বিক একটা বিষয় ভাল ভাবে বোঝান অসম্ভব। তবে এটুকু উপলব্ধি করিলাম যে, এরা জানিতে চায়, মিশিতে চায় এবং এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে পারিলে টাইম এবং লাইফে ভারত সম্বন্ধে ভুল সংবাদ ও ভারত বিরোধী মন্তব্য বন্ধ করানো অসম্ভব নয়। ভারতীয় দুতাবাসে উপযুক্ত লোক থাকিলে এই কাজ আদৌ কঠিন নয়। আমেরিকার তিনটি পত্রিকা—নিউ ইয়র্ক টাইমস, টাইম এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার আমাদের পক্ষে রাখিতে পারিলে ভারত সম্বন্ধে আমেরিকান

জনমত বদলাইয়া ফেলা যায়। উপযুক্ত একটি বা দুইটি লোক ইহা করিতে পারে।

ডিরেক্টর অফ এডুকেশন মহিলা এত খুশী হইয়াছিলেন যে, ঐদিনই তিনি নিউ ইয়র্কের 'কারেন্ট' সম্পাদক সিডনী হার্ট্‌জবার্গ-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। হার্ট্‌জবার্গ সন্ধ্যায় হোটেলে আসিয়া নিয়া গেলেন ওভারসিজ প্রেস ক্লাবে। এটি নিউ ইয়র্কের বৈদেশিক এবং আমেরিকান সাংবাদিকদের মিলন ক্ষেত্র। কাউন্টারে একটি খাতা আছে—নাম লিখিয়া ঢুকিতে হয়। ঠিকানার ঘরে কোন্‌টি দিব জিজ্ঞাসা করিতে হার্টজবার্গ খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন—দেশের ঠিকানা লেখ, ওটা এখানে রেকর্ডে থাক। ঐদিনই আমাকেও ক্লাবের সদস্য করিয়া নেওয়া হইল। পরদিন গিয়া কার্ড নিয়া আসিলাম। এখানে শুধু যে উঁচুদরের রেস্তোঁরা আছে তা নয়, থাকার খুব ভাল ব্যবস্থাও আছে। ক্লাবের সভ্য বিদেশী সাংবাদিকেরা হোটেলে না উঠিয়া এখানে থাকিতে পারেন।

রেস্তোঁরায় কফির টেবিলে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে মিশিয়া ভারত সম্বন্ধে সত্য কথা সকলকে জানাইবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ ভারত সরকার কেন নেন না?

থিওলজিকাল সেমিনারী

প্রতি রবিবার যে সহরেই থাকিতাম সেই সহরের কোন না কোন গির্জ্জায় যাইতাম। ধনকুবের এবং বস্তুতান্ত্রিক দেশ ধর্ম্ম কতটা মানে তাহা দেখিবার প্রবল আগ্রহ ছিল। গির্জ্জায় পাদ্রীদের উপদেশে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতাম—অত্যন্ত আধুনিক রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতির ভিত্তিতে উহা সমাধানের উপদেশ ছিল পাদ্রীদের বক্তৃতার প্রধান লক্ষ্য। সমস্ত জাতটাকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলার একটি আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে ইহা বেশ বোঝা যাইত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্কুল অফ ডিভিনিটির গুরুত্ব এবং মর্য্যাদা দেখিয়া বুঝিতাম পাদ্রীদের রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। স্কুল অফ ডিভিনিটি হইতেছে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার কেন্দ্র; আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষা কোথায় কি ভাবে হয় তাহা জানিতে খুব আগ্রহ হইল। ফিলাডেলফিয়ায় ভারত সুহৃদ সমিতিকে লিখিলাম এরূপ কোন স্কুল বা কলেজ দেখার বন্দোবস্ত যেন তাঁরা করিয়া দেন।

সেদিন সকালে যাওয়ার কথা ছিল এশিয়া হাউসে। দুপুরে ছিল ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে লাঞ্চ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ফিলাডেলফিয়া হইতে ট্রাঙ্ক কল পাইলাম—সকাল দশটায় ইউনিয়ন থিওলজিকাল সেমিনারীতে ডাঃ হ্যাণ্ডি ধর্ম্ম শিক্ষার যে ক্লাস নিবেন তাহাতে আমি উপস্থিত থাকিব বলিয়া জানানো হইয়াছে। সেমিনারীর দক্ষিণ দরজায় উপস্থিত হইলে এক মহিলাকে দেখিতে পাইব, তিনি আমাকে ডাঃ হ্যাণ্ডির ক্লাসে পৌঁছিয়া দিবেন। এশিয়া হাউস পরিদর্শন বাতিল হইয়াছে।

সকাল নয়টায় বাহির হইবার জন্য উঠিয়াছি এমন সময় আবার টেলিফোন। এবার টেলিফোন করিতেছেন এশিয়া হাউসের ডিরেক্টর মিস মিন্‌জ। আমার এশিয়া হাউসে যাওয়া বাতিল হইয়াছে বলিয়া ফিলাডেলফিয়া হইতে টেলিফোনে তাঁহাকেও জানানো হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ওখানে যাওয়ার জন্য একটু সময় কি করিতে পারি না?

আমার মনোভাব ছিল—গবেষণা কেন্দ্র দেখিবার সুযোগ যেখানেই পাইব

সেখানেই যাইব, ইহার একটি সুযোগও ছাড়া হইবে না। মিস মিন্‌জকে বলিলাম—থিওলজিকাল সেমিনারী হইতে আমি সাড়ে এগারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই বাহির হইব। বারোটায় এশিয়া হাউসে পৌঁছিব। একটায় রিভার ক্লাবে পৌঁছিলেই হইবে। এশিয়া হাউস হইতে রিভার ক্লাব বেশী দুর নয়। মিস মিন্‌জ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—আমি না পৌঁছা পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন।

ঠিক দশটায় সেমিনারীতে পৌঁছিলাম। এটি নিউ ইয়র্কের বৃহত্তম ধর্ম্ম শিক্ষার স্কুল। এরা আমাদের মত সেকুলারিজমের ডঙ্কা বাজাইয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্মবিরোধী কাজে এবং সঙ্কীর্ণতম ধর্ম্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দানে মত্ত হয় না। ধর্ম্ম শিক্ষার স্কুল হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স পর্য্যন্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এরা চালাইয়াছে।

ডাঃ হ্যাণ্ডির ক্লাশে পৌঁছিলাম। এখানে একটি নূতন ধরণের কম্বাইণ্ড টেবিল চেয়ার দেখিলাম। চেয়ারের ডানদিকের হাতলটা এমন ভাবে তৈরি যে, উহাতে খাতা বা কাগজ রাখিয়া নোট নেওয়া যায়। সামনে কোন ডেস্ক দরকার হয় না। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে এই ধরণের চেয়ার প্রবর্ত্তিত হইলে বেঞ্চ এবং ডেস্কের প্রয়োজন হইবে না। কাঠের এই দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্ম্মূল্যতার দিনে কাঠ ও খরচ দুই-ই অনেক বাঁচিবে। পরে দেখিয়াছিলাম আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্লাসে সর্ব্বত্র উহাই ব্যবহৃত হয়। ক্লাস ঘরের নম্বর ছিল ২১৪; ইহা হইতে সেমিনারীর আয়তন খানিকটা বোঝা যাইবে।

ডাঃ হ্যাণ্ডির বক্তৃতার বিষয় ছিল—খৃষ্টধর্ম্মের আধুনিক ইতিহাস। আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রসারের উপরেই বেশী ঝোঁক ছিল। ১৬৬৩ সালে হার্ব্বার্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। তার পর ঈশ্বরের উপাসনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইল। অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইল উপাসনার প্রধান অঙ্গ। পাপের জন্য অনুতাপ এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তির ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোঁড়ামির প্রতীক ছিলেন বাটলার, Rational Supernaturalism মানিতেন টিলটসন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন হার্ব্বার্ট, খৃষ্টবিরোধী ছিলেন ভলটেয়ার এবং নিরীশ্বরবাদী হইয়াছিলেন হোলবাক। খৃষ্টধর্ম্মের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিক ডাঃ হ্যাণ্ডি অতি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিয়া দিলেন। Revelationকে তিনি বলিলেন—Natural reason enlarged।

বক্তৃতা শেষে ডাঃ হ্যাণ্ডি আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং

বলিলেন—সেমিনারীর ডীন ডাঃ জন বেনেট আমার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক। তখন বেলা এগারোটা। ভাবিলাম আধ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কথা বলিতে পারিব। একটি ছাত্র ডাঃ বেনেটের ঘরে পৌঁছিয়া দিল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার কবীর রোডের বৈঠকখানার অবস্থা। চতুর্দ্দিকে স্তুপাকার বই এবং জর্ণাল। সমস্ত অগোছালো। তারই মাঝখানে বসিয়া আছেন ডাঃ বেনেট। দশ মিনিট আলাপেই বুঝিলাম এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের জ্ঞান কত গভীর ও ব্যাপক। এই প্রথম জহরলাল নেহরু সম্বন্ধে একজন মনীষীর প্রশ্নের সম্মুখীন হইলাম। নেহরু সম্বন্ধে ডি. এফ. কারাকার বই দেখিলাম ডাঃ বেনেটের পড়া। নেহরু সম্পর্কে অবশ্য সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়াই তিনি কথা বলিলেন; আমিও দুই কারণে আলোচনা দীর্ঘ করিতে চাহিলাম না। প্রথমতঃ এশিয়া হাউসে যাইতে হইবে বলিয়া সময়াভাব এবং দ্বিতীয়তঃ বিদেশ। ডাঃ বেনেটের সঙ্গে জমাইয়া বসিতে অতিশয় লোভ হইতেছিল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করিলাম। ধর্ম্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বুঝিলাম ধর্ম্ম শিক্ষাকে এরা শুধু বাইবেল পড়ানো বলিয়া মনে করে না। আধুনিক জগতের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ভিন্ন বিশ্বের কোন সমস্যার উপযুক্ত অলোচনা করা যায় না এবং ধর্ম্ম ও সুনীতির ভিত্তিতে পথ নির্দ্দেশও সম্ভব হয় না। বোষ্টনে ডাঃ হেলভারসনের সঙ্গে আলাপে ঠিক এই জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি। ওয়াশিংটনে ডাঃ ডানকান হাওলেটের উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিয়াছি মানুষের প্রতি কি গভীর ভালবাসা নিয়া এবং মানব জাতির কল্যাণের আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়া উচ্চতম রাজনীতির সমালোচনা কত সুন্দরভাবে করা যায়। রাশিয়া সমগ্র বিশ্বের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া আকাশে মেগাটন বোমা ফাটাইয়া চলিয়াছে, উহার বিরুদ্ধে পাদ্রীদের কণ্ঠে তীব্র কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু সে প্রতিবাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষের সুর নাই।

ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন কোন যুগে কোন দেশে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সুশৃঙ্খল সমাজ গঠিত হইতে পারে নাই। সমগ্র পৃথিবীকে এই বাণী শুনাইয়াছে এবং এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে ভারত। ভারত আত্মার এই বাণী আজ সারাটা পৃথিবী খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বেদান্ত উপনিষদ গীতার শাশ্বত বাণী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর ভারতের শাসকেরা করেন নাই, সমাজপতি শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার দাবীও

তোলেন নাই। অথচ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাইবেল ছিল আমাদের কলেজের অবশ্যপাঠ্য। ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া ছয় হাজার বৎসরের সভ্যতা সমন্বিত এক সুপ্রাচীন জাতি মাত্র ১৫ বছরে কি ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতে পারে আমরাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এশিয়া হাউস

এশিয়া হাউসে যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মিস মিন্‌জ এশিয়া সোসাইটির মোটামুটি পরিচয় দিলেন। জন রকফেলার উহার প্রেসিডেণ্ট এবং ফিলিপস টলবট ভাইস প্রেসিডেণ্ট। টলবট ভারতে আসিয়াছেন এবং ভারত সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান রাখেন। নিউইয়র্কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। টলবট এখন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী এবং প্রায়ই ওয়াশিংটনে থাকেন। এশিয়া সোসাইটির ট্রাষ্টিদের মধ্যে রহিয়াছেন চেষ্টার বোলজ, মিসেস শেরম্যান কুপার, আর্থার ডীন, মিস মেরিয়ান এণ্ডার্সন প্রভৃতি। এশিয়া হাউসে লাইব্রেরী, লেকচার হল, এশীয় আর্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি সবই আছে। লেকচার হলে ফিল্ম ও শ্লাইড দেখানো এবং গ্রামোফোন রেকর্ড ও টেপরেকর্ড বাজাইয়া শোনানোর ব্যবস্থা আছে।

এশিয়া হাউসে জাপান সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। জাপান সোসাইটির অফিস যে ঘরটিতে অবস্থিত তার কারুকার্য্য জাপানী। সিলিংটি অতি সুন্দর। আসবাবপত্র সমস্ত জাপানী। ঘরটিতে প্রবেশ করিলেই মনে হইবে জাপান আসিয়াছি এবং এক মুহূর্ত্তে জাপানী স্থাপত্য এবং জাপানী রুচির পরিচয় মিলিবে।

একজন ভারতীয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম এশিয়া হাউস ভারত বিরোধী প্রচার কার্য্যের একটি ঘাঁটি। আমার সে ধারণা হইল না। মিস মিন্‌জের কথায় এবং তাঁর দেওয়া কাগজপত্রে বুঝিলাম তাঁহারা ভারতীয় তথ্যের জন্য একান্ত আগ্রহশীল কিন্তু তাহা উপযুক্তভাবে পান না। এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক একটি বোঝাপড়া একান্ত জরুরী প্রয়োজন এই বিশ্বাসে এশিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। এশিয়া এবং আমেরিকার জনসাধারণ যাহাতে একে অপরের জীবন-যাত্রার কথা জানিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারে তার জন্য উভয়ের জনসাধারণকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এশিয়া সোসাইটির কাজ প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ: (১) আমেরিকার স্কুল কলেজ এবং বয়স্কদের

মধ্যে এশীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জনের সুযোগ ও উৎসাহ দান, (২) এশিয়া হইতে যাঁহারা আমেরিকায় আসেন তাঁহাদিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান এবং (৩) এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়।

এশিয়া হাউসে পাকিস্থান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী পজিসন করিয়া নিয়াছে, ভারত একেবারে পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং বৈদেশিক প্রচারকার্য্যে পাকিস্থানী তৎপরতার পরিচয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এশিয়া হাউসের উদ্যোগে বোষ্টন এবং ওয়াশিংটনে এশীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। এশিয়া হাউসেও একটি হইয়াছিল। উহাতে চিত্র, ভাস্কর্য্য, মৃন্ময় পাত্র, সুচীশিল্প প্রভৃতি সবই ছিল। ভারতীয় শিল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল মোগল আমলের কতকগুলি জিনিষ। বোষ্টনের মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসের গৃহে যে প্রদর্শনী হয় তাহাতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট পাঠাইয়াছিল গান্ধার শিল্পের নিদর্শন। ভারতের প্রাচীনতম শিল্পকলার নিদর্শন বিদেশে পাঠাইয়া বাহাদুরি নেয় পাকিস্থান, আমাদের গবর্ণমেণ্ট মোগল যুগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখিতে পান না। ভারত সরকারের উদ্যোগে লিখিত এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত তারাচাঁদ সম্পাদিত ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসেও বলা হইয়াছে মোগল যুগই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে জিন্না এবং আয়ুব খাঁর ছবির কথা আগেই বলিয়াছি।

মিস মিন্‌জ যে সমস্ত কাগজপত্র দিলেন তাহাতে নিউ ইয়র্কের আব্রাহাম লিঙ্কন হাইস্কুলের শিক্ষক ইসিডোর রবিনোভিঝের একটি প্রবন্ধ ছিল। উহাতে জানিলাম যে আমেরিকার স্কুলপাঠ্য বইয়ে এশিয়া সম্বন্ধে তথ্য অধিকতর পরিমাণে সন্নিবেশিত হইতেছে এবং এশিয়া সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন কোর্সে হাইস্কুলের শিক্ষকদের সমবেত করিয়া তাহাদিগকে এশিয়া সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞান দানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল যাবৎ এশিয়া বলিতে বুঝাইয়াছে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের কলোনি। সুতরাং এশিয়ার ইতিহাস বলিতে বুঝাইত সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার কাহিনী। রবিনোভিঝ বলিতেছেন— এই পুরাণো এবং সঙ্কীর্ণ মনোভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিক্রিয়া এশিয়ায় কি ভাবে হইতেছে এবং স্বাধীন এশিয়া কোন্ দিকে কিরূপে জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহার সন্ধান জানিতে হইবে। প্রাচ্য কি ভাবে পাশ্চাত্যের উপর পাল্টা আক্রমণ সুরু

করিয়াছে তাহারও বিশদ পরিচয় নিতে হইবে। রবিনোভিঝ সুস্পষ্টভাষায় বলিতেছেন যে, এশীয় জ্ঞানের Creative and philosophical phases আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজে পড়ানোর দিকে far more serious consideration দিতে হইবে। রবিনোভিঝ অসঙ্কোচে বলিতেছেন—আমেরিকার ইনটেলেকচুয়াল নেতাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক বৌদ্ধ চিন্তাধারা বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্ম্মোপলব্ধির ক্ষমতা রাখেন। আমেরিকার ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে, বিশেষভাবে স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের মধ্যে, নিজেদের ইতিহাস ও চিন্তাধারা ঢুকাইয়া দেওয়ার এই অপূর্ব্ব সুযোগ আমরা গ্রহণ করি নাই। পাকিস্থান উহা করিতেছে এবং আমরা আর্ত্তনাদ করিতেছি—এশিয়া হাউস ভারত বিরোধী প্রচার কার্য্যের ঘাঁটি। পাকিস্থান নিজের কথা যতটা না বলে তার শতগুণ বেশী করে ভারত বিদ্বেষ প্রচার। ৪৪ কোটি লোকের দেশ ৪৪টি প্রচারকও পাঠাইবে না, বরং বিদেশ যাত্রায় যত পারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দেশকে বর্ব্বর যুগে ফিরাইয়া নেওয়ার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিবে।

এশিয়া হাউসের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি সমিতির নাম হইতেছে এশীয় সঙ্গীত সোসাইটি। এই সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় এশিয়া সোসাইটির সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় হেনরী কাওয়েলের অর্কেষ্ট্রা অতিশয় জনপ্রিয় এবং উচ্চাঙ্গের বলিয়া স্বীকৃত। এশীয় সঙ্গীত সোসাইটি উহার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন পান্নালাল ঘোষের অর্কেষ্ট্রাকে। বাঙ্গলাদেশ হইতে কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে কুশলী লোক পাঠাইয়া আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজকে সন্তুষ্ট করা যাইত এবং তাহা করিলে আমেরিকায় সম্প্রতি প্রাচ্য সঙ্গীত চর্চ্চায় যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারতের স্থান অনেক উচ্চে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইত কিন্তু ভারত সরকার বা বাঙ্গলা সরকার সে দিক মাড়ান নাই। ইন্দ্রাণী রহমানের নাচের দল পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর রসিক সমাজে ছাপ রাখিতে পারেন নাই। আলাউদ্দিন খাঁর শরোদ এবং রবিশঙ্করের সেতার আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে।

সঙ্গীত সোসাইটির চেয়ারম্যান উইলিয়াম আর্চ্চার ফেয়ার্লে ডিকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। এশিয়া হাউস তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আর্চ্চার লিখিয়াছেন—হাইস্কুলের ছেলেরা বলি

দ্বীপের সঙ্গীত শুনিতে চাহিবে কিন্তু স্কলার ছাড়া রাগের মাধুর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না, তাহাও একজন স্কলার তিন বা চারজন সঙ্গীতজ্ঞকে দিয়া একই রাগ গাওয়াইয়া মিলাইয়া তবে সন্তুষ্ট হইবে। এশীয় সঙ্গীত সোসাইটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এশিয়ার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আমেরিকায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনা। এখানে বিশিষ্ট (Distinguished) শব্দটির উপর তাঁহারা খুব বেশী জোর দিয়াছেন। নৃত্যের মধ্যে ভরত নাট্যমের মুদ্রা এবং চোখের ভঙ্গীর কথা তাঁহারা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সারেঙ্গীর প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ খুব বেশী। সারেঙ্গীর বাজনাকে তাঁহারা **nasal, haunting and magical tone** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

লণ্ডনের এশীয় সঙ্গীত সার্কেলের সঙ্গে নিউইয়র্কের এশীয় সঙ্গীত সোসাইটির যোগ আছে। লণ্ডনের সঙ্গীত সমাজ অনেক প্রাচীন এবং উহার পরিচালক ইয়েহুদি মেনুহিন।

সুপরিকল্পিত ভাবে এশিয়া হাউসে ঢুকিয়া গেলে আমরা নিজেদের কথা বলিতে পারিতাম, পাকিস্থানের নষ্টামি কমাইতে পারিতাম, কিন্তু কিছুই আমরা করি নাই। নিজেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিব, পাকিস্থান ফাঁকা মাঠে গোল দিবে, তখন সুরু হইবে আমাদের আর্ত্তনাদ—এশিয়া হাউস বড়ই ভারত বিরোধী। কথাটা বলিয়াছিলেন ভারতের একটি প্রধান দৈনিক পত্রের সম্পাদক। এশিয়া হাউসে তিনিও গিয়াছিলেন।

মিস মিন্জের নিকট যখন বিদায় নিলাম তখন একটা বাজিতে দশ মিনিট। রিভার ক্লাবে পৌঁছিয়া দেখি ফ্রাঙ্কলিন অপেক্ষা করিতেছেন।

জাতিসঙ্ঘ

নিউ ইয়র্ক অবস্থিতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখনও জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন দেখা হয় নাই। আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর ডিরেক্টর ডাঃ আইকেলবার্গারের সঙ্গে আলাপের সময় বলিলাম—আমার যে জাতিসঙ্ঘ এখনও দেখা হয় নাই।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর একজন সেক্রেটারীকে—এঁরও নাম মিস উইনস্লো—ডাকিয়া জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন দেখিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। ডাঃ আইকেলবার্গারের সঙ্গে বেশী সময় আলাপ করা গেল না। পণ্ডিত নেহরুর নিউ ইয়র্ক আগমন উপলক্ষ্যে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ আইকেলবার্গার সেই কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। জাতিসঙ্ঘ গত পনেরো বৎসরে কি ভাবে চলিয়াছে, কি ভাবে উন্নতি করিয়াছে, কি ভাবে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ও বিরোধ মীমাংসা করিয়াছে তার বিবরণ দিয়া তিনি একখানি বই লিখিয়াছেন—UN and the first fifteen years. বইখানি আমাকে দিলেন এবং মিস উইনস্লোর হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া বিদায় নিলেন।

আমি সাধারণ অধিবেশন এবং কমিটি বৈঠক দুই-ই দেখিতে চাই জানিয়া নিয়া মিস উইনস্লো পরদিন আসিতে বলিলেন। টিকিট তিনিই আনিয়া রাখিবেন। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিস উইনস্লো সঙ্গে নিয়া জাতিসঙ্ঘে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং একেবারে লিফ্‌টে তুলিয়া দিয়া বিদায় নিলেন। সাধারণ অধিবেশনে সেদিন ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট কেকোনেনের বক্তৃতা দেওয়ার কথা। প্রকাণ্ড হল। বসিবার আসনে সদস্য দেশগুলির নাম লেখা। গ্যালারীতে বসাইবার লোক আছে। দর্শক কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর লোক তাহা জানিয়া নিয়া বসায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—ইংরেজি? আমরা গ্যালারীর যে অংশে বসিয়াছিলাম সেখানেই লোক

সংখ্যা বেশী। বক্তা তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেন, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে অনুবাদ হইয়া তাহা বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকের কানে তার ভাষায় গিয়া পৌঁছায়। এই জন্য প্রত্যেককে একটি হেডফোন কানে লাগাইয়া বসিতে হয়। প্রতিটি আসনের সঙ্গে হেডফোন আছে। অনুবাদক যন্ত্রের অনুবাদ ঐ হেডফোন মারফৎ কানে আসিয়া পৌঁছায়। কি ভাবে এই অনুবাদ হয় কিছুদিন আগে ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মেল সংস্কৃত কলেজে এক সেমিনারে তাহা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন এই যান্ত্রিক অনুবাদ সমাসবদ্ধ পদের জন্য সংস্কৃত ভাষার বেলায় করা যায় না।

সাধারণ অধিবেশনে সেদিন কোন তর্ক বিতর্ক ছিল না, কৃষ্ণ মেননের হাত পা ছোঁড়া বা মূর্চ্ছা দেখারও সুযোগ ছিল না। কৃষ্ণ মেনন সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। কেক্কোনেনের বক্তৃতার পরেই অধিবেশন শেষ হইয়া গেল।

গেলাম কমিটি দেখিতে। কমিটির ঘর ছোট। সেখানেও কোন আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম ছিল না। কমিটি ঘরের দেয়াল কাঁচের, বাহির হইতেই সব দেখা যায়। উৎসাহ পাইলাম না বলিয়া ঢুকিলাম না। কমিটি অধিবেশনের টিকিটটি বাঁচাইয়া পকেটে নিয়া বাহিরে আসিলাম।

ডাঃ আইকেলবার্গার এবং মিস উইনস্লোর সহিত যেটুকু সময় কথা বলিয়াছি তার মধ্যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম— এশিয়া এবং আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামে এবং মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জাতিসঙ্ঘ কতটা সফল হইয়াছে? দুইজনেই বলিলেন—ডাঃ আইকেলবার্গারের বইতে দুটি প্রশ্নেরই জবাব মিলিবে।

ঘরে ফিরিয়া বইটি খুলিতে প্রথমেই উহার ৬৫ পৃষ্ঠায় ঐ জায়গাতেই চোখ পড়িল। লেখক বলিতেছেন—সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশভুক্ত জনসাধারণের স্বাধীনতার সঙ্গে মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের এই দুই দায়িত্বের উল্লেখ ডাঃ আইকেলবার্গার তাঁর বইয়ে অতি সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর ৭০ কোটি লোক—বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ—স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহা ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান সামাজিক বিপ্লব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যে আফ্রিকা "অন্ধকার মহাদেশ" বলিয়া অভিহিত হইত সেখানে স্বাধীনতার আগুন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। ১৯৬০ সালে লেখা বইয়ে ডাঃ

আইকেলবার্গার বলিতেছেন—আর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িটি নূতন স্বাধীন সার্ব্বভৌম দেশ জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করিবে। জাতিসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা একশত অতিক্রম করিবে। কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় নাই, বই প্রকাশের বছর খানেকের মধ্যেই জাতিসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা একশত অতিক্রম করিয়াছে। ডাঃ আইকেলবার্গারের মতে জাতিসঙ্ঘের চার্টারের মধ্যেই পরাধীন দেসসমূহের স্বাধীনতার দায়িত্ব নিহিত ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেই স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করিয়া দিয়াছে। তবে স্বাধীনতা লাভের দুটি উপায় ছিল—প্রথম, হানাহানি ও অরাজকতার পথে স্বাধীনতা লাভ এবং দ্বিতীয়, আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনের ভিতর দিয়া সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা লাভ। ডাঃ আইকেলবার্গারের মতে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন এখন অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জাতিসঙ্ঘের সাহায্যেই পরাধীন দেশসমূহ শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। জাতিসঙ্ঘ যেন হাতছানি দিয়া বিশ্বের পরাধীন দেশসমূহকে উহার সদস্য হইবার জন্য ডাকিতেছে।

নূতন স্বাধীন দেশগুলিতে উহাদের গবর্ণমেণ্টদের হাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার—মানুষের অধিকার—অব্যাহত থাকিবে কি না সে প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা যাহাতে থাকে, জাতি ধর্ম্ম দেশ নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষ যাহাতে মানুষের অধিকার নিয়া বসবাস ও চলাফেরা করিতে পারে তাহার গ্যারাণ্টি দানের জন্য জাতিসঙ্ঘ Universal Declaration of Human Rights—মানুষের অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাব পাশ করিলেন। কিরূপে ঐ অধিকারের ঘোষণা কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে তাহা নিয়া মতভেদ হইয়াছে। দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম, জেনোসাইড, নারীসমাজকে রাজনীতিক অধিকার দানে অস্বীকৃতি প্রভৃতি বিষয় ঐ ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্বাধীন দেশ কর্ত্তৃক উহা অনুমোদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে দেশ ঐ ঘোষণা অনুমোদন করিবে তাহাকে নিজ দেশে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও কর্ম্মসংস্থান, শিক্ষা প্রভৃতিতে বৈষম্য অবসানের কথাও ঐ ঘোষণায় আছে। যে সমস্ত দেশ উহা ratify বা অনুমোদন করে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর তাহাকে উহার কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা জাতিসঙ্ঘকে জানাইতে হয়। পাকিস্থান কাশ্মীর নিয়া জাতিসঙ্ঘে আমাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছে, আমরাও Declaration of Human Rights-

এর genocide ধারাটি নিয়া জাতিসঙ্ঘের সভায় পাকিস্থানকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারিতাম।

নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে দুই প্রকার দেশ আছে—অতি প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস সমন্বিত দেশ এবং নিতান্ত সাধারণ উপজাতি স্তরের দেশ। প্রথমোক্তদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভারতের নাম করিয়া ডাঃ আইকেলবার্গার বলিয়াছেন—ভারতের শতাব্দীর পর শতাব্দীর ঐতিহ্যের ইতিহাস রহিয়াছে, আন্তর্জাতিক সমাজ রচনায় ভারতের দান খুব গুরুত্বপূর্ণ হইবে। নিজের দেশ আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি বলিতে ছাড়েন নাই—Declaration of Human Rights-এর অনেক অংশ আমেরিকা অনুমোদন করে নাই, ইহা উল্লেখযোগ্য।

জাতিসঙ্ঘের আয়তন বৃদ্ধিতে বৃহৎ শক্তিদের খুব অসুবিধা ঘটিয়াছে, ইহাও আইকেলবার্গার স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। এখন কোন বৃহৎ শক্তি জেনারেল এসেম্বলিতে দুই তৃতীয়াংশ ভোট সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে না, আমেরিকাও না। আবার প্রতিপক্ষের কোন প্রস্তাব দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হওয়াতে বাধাদানের জন্য এক তৃতীয়াংশের একটি বেশী ভোট সংগ্রহও অতিশয় কঠিন।

সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভেটোতে আটকা পড়িলে বৃহৎ দেশেরা কেন দুই তৃতীয়াংশ ভোটে ভেটো নাকচ করিতে জেনারেল এসেম্বলিতে যায় না, ডাঃ আইকেলবার্গারের কথাতেই তাহা বেশ বোঝা যায়।

নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ফিল্ড ষ্টাফ নামে একটি প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। বৈদেশিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশেষজ্ঞদের গবেষণা প্রবন্ধাকারে এই সিরিজে প্রকাশিত হয়। ফিলিপ্‌স টলবট উহার একজিকিউটিভ ডিরেক্টার। ১৯৩৮ সাল হইতে দীর্ঘকাল তিনি দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছিলেন। দিল্লীতে ছিলেন বহুদিন। গত বৎসর ভারত সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ ঐ সিরিজে প্রকাশিত হয়। টলবটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়িতে চাহিলাম না।

টলবটের অফিসে উপস্থিত হইলে এক প্রবীণ ভদ্রলোক প্রথমেই আসিয়া বলিলেন—নমস্তে।

—আপনিই কি মিঃ টলবট?

—না, আমি খুব দুঃখিত যে, তিনি এখানে নাই। তিনি এখন প্রেসিডেন্ট কেনেডির এসিসটান্ট সেক্রেটারী এবং বেশীর ভাগ সময় ওয়াশিংটনে থাকেন।

সেখান হইতে সোজা যাওয়ার কথা নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে। ওয়াল ষ্ট্রীটে অটো টাইটলারের অফিসে প্রথমে যাইতে হইবে। তিনি নিয়া যাইবেন ষ্টক এক্সচেঞ্জে। বিশ্বের বৃহত্তম দুটি ষ্টক এক্সচেঞ্জ, নিউ ইয়র্ক এবং লণ্ডন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এক বিরাট বনিয়াদ হইতেছে ষ্টক এক্সচেঞ্জ।

টলবটের অফিসে আলাপে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। যিনি কথা বলিতেছিলেন তাঁর নামটি ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু প্রতিটি কথায় ভারতের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই মানুষের সঙ্গে আলাপের মাঝখানে অসভ্যের মত উঠিতে মন চাহিতেছিল না। টাইটলার জানিতেন এখানে আগে যাইব, তারপরে তাঁর অফিস। বারোটায় টাইটলারের টেলিফোন আসিল—তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। এবার ভদ্রভাবেই উঠিতে পারিলাম।

টাইটলারের অফিসে যখন পৌঁছিলাম তখন সাড়ে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ওয়াল ষ্ট্রীটেই তাঁর অফিস। টাইটলার বলিলেন—ষ্টক এক্সচেঞ্জ দেখিতে সময় লাগিবে, আগে মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

টাইটলার নিয়া গেলেন ওয়াল ষ্ট্রীটের ধনকুবেরদের রেস্তোরাঁয়। আলোচনা কি ধরণের হয় লক্ষ্য করিলাম। যতটা শুনিলাম তাহাতে ষ্টক এক্সচেঞ্জের কথা নাই, অন্য বিষয়ে আলাপ চলিতেছে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে উপরে উঠিয়া প্রথমে সংবাদ দানের কাউন্টার। একটি তরুণী বসিয়া আছে, পরণে টকটকে লাল কাপড়ের জামা। টাইটলারের বয়স অল্প, খুব বেশী হয় তো ত্রিশ হইবে। কথাবার্ত্তায় চোখেমুখে এখনও দুষ্টু ছেলের ছাপ। তরুণীটির সামনে দাঁড়াইয়াই প্রথম কথা—

—এ কি, তুমি এখানে ?

আমি ভাবিলাম তরুণীটি বোধ হয় তার পরিচিত। তরুণীটি কতকটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া সবিস্ময়ে তাকাইল। অতঃপর টাইটলারের দ্বিতীয় কথা—

—আমেরিকান ক্যাপিটালিজ্‌মের একেবারে ঘাঁটিতে তুমি কমুনিষ্ট জামা পরে বসে আছ, তোমাকে এখনও এরা মস্কো চালান দেয় নি ?

মেয়েটির অবস্থা তখন সঙ্গীন। তার জামা বেশী লাল না মুখ বেশী লাল বোঝা কঠিন।

বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটি কতকগুলি পুস্তিকা টাইটলারের হাতে তুলিয়া দিল। আমিও তাহাকে এক ঠেলা দিয়া বলিলাম—ঢের হয়েছে, আর রসিকতা করতে হবে না, চল।

ষ্টক এক্সচেঞ্জে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার। যে হলে কেনাবেচা হয় সেই ঘরে অবশ্য দালাল ছাড়া কেহ ঢুকিতে পায় না। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা খুব পরিষ্কার ভাবে দেখার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। চীৎকার হট্টগোল আমাদেরই ষ্টক এক্সচেঞ্জের মত। সারাটা মেঝে পরিত্যক্ত কাগজের টুকরায় ছাইয়া গিয়াছে। হলের উপরে একটি টেপ ধীরে ধীরে চলিতেছে, উহাতে বিভিন্ন শেয়ারের দাম ফুটিয়া উঠিতেছে। উহাকে বলে Ticker Tape। এই টেপে দামের উল্লেখ দেখিয়া বেচাকেনা চলিতেছে।

যাহারা ষ্টক এক্সচেঞ্জ দেখিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে শেয়ার এবং বণ্ড কেনার লাভ বুঝাইবার চেষ্টা অসামান্য আন্তরিকতার সঙ্গে চলিয়াছে। ঘরে ফিরিয়া পুস্তিকাগুলি পড়িয়া বুঝিলাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের জটিল বিষয় সাধারণ লোকের নিকট কত সহজে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়।

দেশের লোক সঞ্চয়ের টাকা যখন মূলধনে লগ্নী করিতে আসে তখনই সে দেশের

শিল্পোন্নতি দ্রুত এবং সহজ হয়। আমেরিকায় কয়েক বছর আগেও শুধু ধনীরাই শেয়ার কিনিত। এখন সওয়া এক কোটি আমেরিকান বিভিন্ন কোম্পানীর অংশীদার। গত সাত বৎসর গড়ে প্রতি বৎসর ৮৬০,০০০ নূতন লোক শেয়ার কিনিতেছে। এখন কোম্পানীসমূহের অংশীদারদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। বৃহৎ কোম্পানীদের মালিকানা এখন ধনীদের হাত হইতে মধ্যবিত্তদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। অংশীদারদের প্রায় অর্দ্ধেকের লভ্যাংশ হইতে আয় সপ্তাহে ১০০ হইতে ২০০ ডলার অথবা ৫০০ হইতে এক হাজার টাকা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কোন্ ধরণের লোক আজকাল শেয়ার কিনিতেছে এবং কতটা লাভবান হইতেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত একটি পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। পেনশিলভানিয়ার এক সহরে একজন লোক পত্নী এবং দুইটি কন্যা নিয়া বাস করিতেন। তাঁর বয়স ৪৫। মেয়ে দুটির বয়স ১০ এবং ১২। একটি বীমা কোম্পানীতে কাজ করিয়া ভদ্রলোক মাসে ৭৫০ অথবা বছরে ৯০০০ ডলার বেতন পান। মেয়ে দুটিকে কলেজে ভর্ত্তি করিবার সময় শীঘ্রই আসিবে। নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা দেখিয়া তিনি চারিটি কোম্পানীর শেয়ার কিনিলেন এবং তাঁর সঞ্চয় হইতে ২০০০ ডলার লগ্নী করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি একসঙ্গে ৪০০ ডলার জমিলেই শেয়ার কিনিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯৬০ সাল হইতেই লভ্যাংশ বাবদ তাঁহার আয় বার্ষিক ১৫০ ডলার দাঁড়াইয়া গেল। ঐ বৎসর তাঁর মোট লগ্নী ছিল ৭০০০ ডলার এবং ঐ পরিমাণ শেয়ারের বাজার দর হইয়াছিল ১৩ হাজার ডলার। ১৯৬৬ হইতে ১৯৭২ পর্য্যন্ত মেয়েরা কলেজে পড়িবে। এই সময়ে শেয়ারের একাংশ বিক্রয় করিয়া তিনি অনায়াসে তাহাদের খরচ চালাইতে পারিবেন। যাহারা একটু বেশী সতর্ক তাহারা শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বণ্ড কিনিয়া থাকে। সরকারী বা আধা সরকারী ঋণপত্রকে বণ্ড বলা হয়। কোম্পানী হঠাৎ পড়িয়া গিয়া শেয়ারের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে কিন্তু বণ্ড কখনো নষ্ট হয় না।

আমেরিকার ১৮ কোটি লোকের মধ্যে সওয়া কোটি লোকের হাতে শেয়ার আছে ইহা মনে রাখিলে শেয়ার মার্কেট ওঠানামায় বা ওয়াল ষ্ট্রীট crash-এ জনসাধারণ কেন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে তাহা বোঝা যায়।

কিস্তিতে শেয়ার কেনারও ব্যবস্থা আছে। শেয়ার দালালের অফিসে বন্দোবস্ত

করিয়া মাসে বা তিন মাসে ৪০ ডলার দিয়া লোকে শেয়ার কিনিতে পারে। ইহাকে বলা হয় Monthly Instalment Plan.

নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ অতিশয় কঠোর হস্তে উহার সততা রক্ষা করিয়া চলে। গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তো আছেই, কিন্তু ষ্টক এক্সচেঞ্জ নিজেও দালালদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে যাহাতে একটি লোকও বঞ্চিত বা প্রবঞ্চিত না হইতে পারে। শুধু বেআইনি কাজ নয়, সুনীতি বিগর্হিত (Unethical) কাজ কেহ করিলে তাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়।

ষ্টক একচেঞ্জ হইতে বাহির হইয়া ওয়াল ষ্ট্রীটের এক ব্রোকার বা দালালের অফিস দেখিলাম। সেখানেও সেই Ticker Tape চলিতেছে এবং তার দিকে তাকাইয়া বহু লোক বসিয়া রহিয়াছে। যার যেমন ইচ্ছা সেই ভাবে অর্ডার দিতেছে। আমাদের দেশে শেয়ার দালালের অফিসে এরকম কোন বন্দোবস্ত নাই।

আবার ফিলাডেলফিয়া

নিউ ইয়র্ক হইতে আবার ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়া আমেরিকার বৃহত্তম সহরগুলির মধ্যে একটি – লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ। সহরে ট্রাম ছিল, তুলিয়া দিয়াছে। বাস ট্যাক্সি পর্য্যাপ্ত। অধিকাংশ রাস্তাই এখনকার যানবাহনের তুলনায় সরু হইয়া পড়িয়াছে এবং একমুখো করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন সুন্দর পরিকল্পিত উপায়ে রাস্তাগুলিকে একমুখো করিয়াছে যে, ট্যাক্সিতে অনাবশ্যক মিটার ওঠে না, বাস হইতে গন্তব্য স্থলেও বেশী হাঁটিতে হয় না।

ফিলাডেলফিয়ার মিউনিসিপালিটিও সিটি গবর্ণমেণ্ট—বোষ্টনের মত। সাধারণ নাগরিককে মিউনিসিপালিটি কত অসংখ্য উপায়ে সাহায্য করিতে পারে তার দৃষ্টান্ত এখানে আসিয়া পাইলাম। কয়েকটি নমুনা দিলে তাহা বোঝা যাইবে।

সংবাদ সরবরাহ এবং অভিযোগ শোনার জন্য মেয়রের একটি অফিস আছে। সোমবার হইতে শুক্রবার সপ্তাহে পাঁচদিন সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে যে কোন লোক যে কোন সংবাদ জানিতে বা অভিযোগ জানাইতে আসিতে পারে। টেলিফোনে তাহা করা যায়। টেলিফোন ব্যবস্থা খুব ভাল। যদি কোন সংবাদ এরা নিজেরা না দিতে পারে তবে কোথায় তাহা জানা যাইবে তাহা বলিয়া দেয়। রাস্তায় কোথাও হয়ত আবর্জ্জনা জমিয়াছে অথবা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে-কোন নাগরিক সেই সংবাদ মেয়রের অফিসে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের জন্য লোক আসে। এদের ডাষ্টবিনে সর্ব্বপ্রধান আবর্জ্জনা দেখিতাম পরিত্যক্ত সংবাদপত্র। পুরাণো খবরের কাগজ কেহ বিক্রী করে না, ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দেয়। আমাদের মত বিক্রীওয়ালার ব্যবসা কোথাও দেখিলাম না। আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিতে সঙ্কোচ হইল। কোন বাড়ীতে ধোঁয়া ঢুকিতেছে, কোথাও দুর্গন্ধ আসিতেছে, কোথাও ইঁদুর দেখা গিয়াছে ইত্যাদি সংবাদও লোকে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার হয়।

স্বাস্থ্য বিষয়ে এরা ভয়ানক সতর্ক। সিটি হলে স্বাস্থ্য বিভাগের অফিস

আছে। রোগ সম্পর্কে যে কোন সংবাদ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এখানে জানিয়া নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে কোন কারণে নার্স প্রয়োজন হইলে এখানে টেলিফোন করিলেই তাহা পাওয়া যায়। কোন সন্ত প্রসূতি হয়ত শিশুর তাল সামলাইতে পারিতেছে না, কর টেলিফোন স্বাস্থ্য বিভাগে। তৎক্ষণাৎ সুশিক্ষিতা নার্স আসিবে এবং যে কয়দিন বাড়ীতে থাকিয়া জননীকে শিশু পরিচর্য্যা শিখানো প্রয়োজন হইবে ততদিন সেখানে থাকিবে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিবে। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না—কর টেলিফোন স্বাস্থ্য বিভাগে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিয়া তার চিকিৎসা এবং টীকা দেওয়া প্রয়োজন হইলে টীকা দিয়া যাইবে। শিশু পরিচর্য্যার আলাদা ক্লিনিকও আছে। আসন্নপ্রসবা মেয়েদের দেখাশোনার ভাল বন্দোবস্ত আছে। শিশুকাল হইতে দাঁত খারাপ একটা ভয়ানক রোগ। দাঁতের চিকিৎসার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে। সংবাদ দেওয়া মাত্র ব্যবস্থা হয়। যাহারা পয়সা দিতে অক্ষম তাহাদের চিকিৎসা বিনা পয়সায় হয়। সহরের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, যখন খুসী গিয়া দেখাইলেই হইল। যে কোন লোক বিনা পয়সায় বুকের এক্স-রে করাইতে পারে। স্বাস্থ্য জেলা দশটি।

এখানে দুইটি নূতন ধরণের কাজের কথা জানিলাম—হোম মেকার এবং বেবী সিটার। কোন বাড়ীতে যদি গৃহকর্ত্রীর অসুখ করিয়া তিনি শয্যাগতা হইয়া পড়েন এবং বাড়ীতে যদি শিশু সন্তান থাকে ও তাহাদের দেখাশোনার কেহ না থাকে তবে স্বাস্থ্য বিভাগে টেলিফোন করিলেই হোম মেকার আসেন। ইনি গৃহকর্ত্রীর সমস্ত কাজ করিয়া দেন। কর্ত্রী সুস্থ হইলে তিনি চলিয়া যান। কোন বাড়ীতে হঠাৎ জননীর মৃত্যু হইলে যদি শিশু সন্তানেরা অসহায় হইয়া পড়ে তখনও হোম মেকার আসেন এবং শিশুদের পরবর্ত্তী ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ের কাজ করিয়া যান। বাড়ীতে শিশুসন্তান রাখিয়া পিতামাতাকে বাহিরে পার্টিতে বা সিনেমা থিয়েটারে যাইতে হইলে বেবী সিটারের জন্য সংবাদ দেওয়া হয় এবং একজন মহিলা আসিয়া শিশুদের ঐ সময়টা সামলান। বেবী সিটার (Baby Sitter) পাওয়ার ব্যবস্থা সব সহরে আছে।

ফিলাডেলফিয়া হাউসিং অথরিটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বাড়ী ভাড়া চাই অথচ পছন্দমত বাড়ী মিলিতেছে না—কর টেলিফোন অথরিটির কেন্দ্রীয় রেণ্টাল অফিসে। এক গাদা বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাইবে, খুসীমত একটি বাছিয়া নিলেই হইল। ফিলাডেলফিয়ার বহু অপরিচ্ছন্ন ঘিঞ্জি এলাকা ভাঙ্গিয়া

নূতন ভাল ভাল বাড়ী তৈরি হইতেছে। যাহারা উচ্ছেদ হইতেছে তাহাদের কোন অসুবিধা নাই। ঐ রেণ্টাল অফিসে সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং বিকাল ১টা হইতে ৪টার মধ্যে হাজির হইলেই বিকল্প বাসস্থানের সংবাদ তাহারা দিয়া দিবে। বাড়ীভাড়া সম্বন্ধে অভিযোগ এখানে করা যায়।

বাড়ীর কোন অদল বদল করিতে হইলে মিউনিসিপালিটির অনুমতি নিতে হয়। পারমিট প্রাপ্ত লোক ছাড়া আর কেহ কণ্ট্রাক্টর বা প্লাম্বারের কাজ করিতে পারে না। কোন বাড়ী অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক হইয়া পড়িতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য ইন্সপেক্টর আছে। এরা সাহায্য করিতে আসে, হাত লম্বা করিয়া ঘরে ঢোকে না।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলাম এদের বেকারের কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থা। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, কেরাণী, ইন্সপেক্টর, উকীল, ষ্টেনোগ্রাফার, ডাক্তার যে কোন রকমের কাজ লোকে চায় তার জন্য মিউনিসিপালিটির কর্ম্মসংস্থান (Recruitment) ডিরেক্টরের কাছে গেলেই হইল। সোমবার হইতে শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে তাঁর অফিসে গিয়া ঢুকিলেই হইল। কাজ জুটিবেই, দুদিন আগে আর দুদিন পরে। প্রতিদিন ধর্ণা দেওয়ারও প্রয়োজন নাই, নাম ঠিকানা রাখিয়া আসিলেই যথেষ্ট। কাজের সন্ধান মিলিবামাত্র চিঠি আসিবে।

১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবকদের বেলায় একটু কড়াকড়ি আছে। তাহারা হাই স্কুলের অথবা কোন ভোকেসনাল বা টেকনিকাল স্কুলের সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে কাজ পায় না। ফিলাডেলফিয়ার চ্যারিটি স্কুল হইতে এদের কাজের সন্ধান নিতে হয়, মিউনিসিপালিটি হইতে নহে।

১৭ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য একটি দারুণ কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে। রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত এই বয়সের কোন বালক বালিকা কোন পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইতে বা থাকিতে পারে না। অভিভাবকের সঙ্গে অথবা অভিভাবক তাহাকে কোন কাজে পাঠাইলে তবে যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় কারফিউ। এই কারফিউ অমান্য করিলে প্রথমবার অভিভাবককে লিখিত নোটিশ দিয়া সতর্ক করা হয়, দ্বিতীয়বার ধরা পড়িলে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা জেল হইতে পারে। ফিলাডেল-

ফিরা সিনেমা হলের সামনে নোটিশ দেখিয়াছি ম্যাটিনী শো'তে বালক বালিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কেহ মামলায় পড়িলে এবং মামলার খরচ চালাইতে না পারিলে তার জন্য লিগাল এইড সোসাইটি আছে। গরীবের পক্ষ সমর্থনের জন্য এরা বিনা পয়সায় উকীল দেয়। লিগাল এইড সোসাইটির অফিসে ডিরেক্টর আব্রাহামের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। সব পার্টিই দেখিলাম নিগ্রো। জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কেহ যদি অবস্থা গোপন করিয়া গরীব সাজিয়া আসে তখন কি করেন? আব্রাহাম বলিলেন—এ রকম যে হয় না তা নয়; আমরা পার্টির চালচলনের উপর লক্ষ্য রাখি এবং আমাদের সাহায্যের একটি সর্ত্ত এই যে, পার্টি খয়রাতি সাহায্যের যোগ্য নয় বুঝিতে পারিলেই আমরা ঐ মামলা হইতে উকীল সরাইয়া নিব। মধ্যবিত্তদের জন্য অল্প ফীতে উকীল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ফিলাডেলফিয়া সহরে একশত খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, ক্যাম্পিং-এর স্থান প্রভৃতি আছে। লাইব্রেরীও কম নয়। লাইব্রেরীতে শুধু বই নয়, ফিল্ম, ভাষা শেখার রেকর্ড প্রভৃতিও আছে। চাহিবামাত্র লাইব্রেরী কার্ড পাওয়া যায়।

বিবাহের ঘটকালির বন্দোবস্তও এরা করিয়াছে। একটি বিবাহ লাইসেন্স বুরো আছে। এদের সমস্ত অফিস শনি রবি দুইদিন বন্ধ। একমাত্র বিবাহ বুরো শনিবার সকাল ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত খোলা। এদের বিবাহে লাইসেন্স নিতে হয়, সেটা এই বুরো দেয়।

গরীবদের খাদ্য বিতরণের যে দরাজ ব্যবস্থা এখানে দেখিলাম তাহা অতুলনীয়। আমাদের এখানে বিলি হয় বড়জোর গুঁড়া দুধ এবং দুই সের আটা। এরা বিলি করে রুটি, মাংস, সব্জী, মাখন, দুধ প্রভৃতি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য। পরিমাণও অপর্য্যাপ্ত। অনেকগুলি বিতরণ কেন্দ্র আছে। বিতরণ কেন্দ্রসমূহের কর্ত্তা ও কর্ত্রীদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সিটি গবর্ণমেণ্টের ওয়েলফেয়ার কমিশনার আসিয়া উহাদের অভিযোগ শুনিবার কথা। আমি একটু আগেই গিয়াছিলাম। ইউনাইটেড ফাণ্ডের মিঃ বসওয়ার্থ আমার পরিচয় দিলে সকলেই ভারত সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিল। প্রায় দশ মিনিট বলিলাম। শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো উভয়ই উপস্থিত ছিল। খয়রাতি খাদ্য গ্রহীতা সবই নিগ্রো। যে সমস্ত ধরণের অভিযোগ ইহারা কমিশনারের নিকট করিল তাহাতে মনে হইল এরা যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। শুকনো কড়াইশুঁটি ভাল ছিল না—ইহাও এক বিরাট অভিযোগ।

কমিশনার সকলের অভিযোগ শুনিলেন এবং প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষ্য করিলাম যে, অভিযোগ করিতে আসিলেও পারস্পরিক বিশ্বাসটা এদের মধ্যে আছে।

বসওয়ার্থ মধ্যবিত্ত গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা দেখাইলেন। ইউনাইটেড ফাণ্ডের টাকায় এক একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুযায়ী বাড়ী তৈরি হয় এবং পরে দীর্ঘ কিস্তিবন্দীতে তাহারা টাকা শোধ করে। বাড়ী তৈরির সময় তাহারা নিজেরা খাটিয়া উহা নির্ম্মাণে সাহায্য করে। ইউনাইটেড ফাণ্ড লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা তোলে এবং সেই টাকা গরীব ও মধ্যবিত্তদের সাহায্যে খরচ করে।

ওয়েলফেয়ার কমিশনার তাঁর গাড়িতে ইউনাইটেড ফাণ্ডের ডিরেক্টর ডেভিসনের নিকট পৌঁছিয়া দিলেন। তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। ডেভিসন একটি প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁয় নিয়া গেলেন। খাদ্য তালিকায় দেখি কেবলই গরু আর শূয়র। ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া ডেভিসন বলিলেন—কিছু মনে করিবেন না, আপনার খাওয়ার মত কিছু না থাকিলে চলুন অন্য রেস্তোরাঁয় যাই।

তাহাই হইল। আর একটিতে গেলাম এবং সেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইলাম।

কোয়েকার প্রতিষ্ঠান

ফিলাডেলফিয়ায় প্রথমে আসিয়াই স্বাধীনতা হল এবং লিবার্টি বেল দেখিয়াছিলাম। সে কথা একেবারে গোড়ার দিকে লিখিয়াছি। আদালতের কথাও লিখিয়াছি। এবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখিলাম—ইউনাইটেড ফাণ্ড, আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস এবং আমেরিকান দর্শন সোসাইটি। নানাদিক দিয়া জনকল্যাণ ইউনাইটেড ফাণ্ডের কাজ। আমার কাছে নূতনত্ব লাগিল মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নতির চেষ্টা, বিশেষভাবে এই সমাজের লোকের জন্য গৃহনির্ম্মাণ ব্যবস্থা। লক্ষ লক্ষ ডলার এরা দানস্বরূপ চায় এবং পায়। ইউনাইটেড ফাণ্ড টার্গেট পূর্ণ করিতে সকল স্তরের লোকের উৎসাহ আছে। ঐ সময়ে এদের একটা ফাণ্ড তোলা হইতেছিল, বোধ হইতেছে পাঁচ কোটি ডলার। মাস দুয়েকের চেষ্টায় সমস্ত টাকাটা উঠিয়া গেল। ছোট বড় সকল প্রকার সংবাদপত্র ইউনাইটেড ফাণ্ড টার্গেট পূরণ করিবার কাজে সাহায্য করিল। প্রতিদিন আবেদন এবং টাকা প্রাপ্তির সংবাদ ছাপাইয়া দিল।

আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। এটি কোয়েকার খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার বহু স্থানে শুনিয়াছি এখনও যদি প্রকৃত খৃষ্টান কেহ থাকিয়া থাকে তবে সে কোয়েকার সম্প্রদায়। ওয়াশিংটনে এদেরই একটি বাড়ীতে ছিলাম এবং কোয়েকারদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমেরিকান ফ্রেণ্ড সার্ভিসের তরুণ তরুণীরা ভারতের বহুস্থানে আসিয়াছে এবং কায়িক শ্রমের দ্বারা অনেক স্কুলের বাড়ী এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ঘর তুলিয়া দেওয়ার কাজ করিয়াছে। মধ্যমগ্রামেও এরূপ একটি দল আসিয়া কাজ করিয়া গিয়াছে।

উইলিয়াম ইভন্স সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি দেখাইলেন। অল্প সময়ের আলাপেই বুঝা যায় সমগ্র মানবজাতির প্রতি এদের কি গভীর সহানুভূতি এবং ভালবাসা। এশিয়া এবং আফ্রিকার মুক্তি এবং উন্নতি ভিন্ন মানবজাতির কল্যাণ নাই, পাশ্চাত্য জগতেরও শান্তি নাই—ইহা এদের মুখের কথা

নয়, সমগ্র অন্তরাত্মা দিয়া কোয়েকার সম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করেন। এরা বলেন যে, কোন বিশেষ মতবাদ বা সত্য সম্বন্ধে কোন একটি ধারণা, তা সে যতই গভীর এবং গালভরা বুলি সমন্বিতই হউক না কেন, মানুষকে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী বা প্রকৃত খৃষ্টান করিতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নিজের সমগ্র মন এবং সত্বাকে নিঃশেষে সমর্পণ এবং কথাবার্ত্তায় পবিত্রতা কঠোর ভাবে সংরক্ষণই মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান করিয়া তোলে। কথাবার্ত্তায় পবিত্রতা—holiness of conversation—এই বস্তুটির উপর এরা খুব বেশী জোর দেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলার যখন ডিপ্লোমা দেন তখন নূতন গ্রাজুয়েটদের কথাবার্ত্তায় ঐ ডিপ্লোমার উপযুক্ত হইতে বলেন। ভদ্র এবং শালীনতা পূর্ণ আলাপ একদিকে সৎ চিন্তা অপরদিকে সৎ কাজে উৎসাহ দেয়, কুচিন্তা এবং কুকাজ নিবারণে সাহায্য করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মন্ত্র কে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন জানি না। আমেরিকার কোয়েকার সমাজ দেখিলাম এই একটি ছোট্ট মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস করেন।

গান্ধী বলিতেন কোয়েকার সম্প্রদায় অহিংসায় বিশ্বাস করেন। এই সুযোগে অহিংসা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব জানিয়া নিলাম। কোয়েকাররা বলেন যে, সাধারণ ভাবে তাঁহারা বলপ্রয়োগের বিরোধী, অনাবশ্যক বল প্রয়োগের তো ঘোর বিরোধী কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের বিরোধী তাঁহারা নহেন। সমাজের শত্রুরা যদি সামাজিক আইন বা নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং রাষ্ট্র যদি তাহাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন মনে করে তবে সেই বলপ্রয়োগকে তাঁহারা হিংসা মনে করেন না। তবে তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, জনমত যদি প্রগতিশীল এবং সুগঠিত (enlightened and vigorous) হয় তাহা হইলে সমাজ আপন শক্তিতেই সৎ পথে চলিবে, যুদ্ধেরও কোন প্রয়োজন হইবে না। এঁরা বলেন যে, মানব সমাজকে অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা হইতে বুদ্ধিমান,নীতিজ্ঞান সম্পন্ন এবং সাহসী স্ত্রীপুরুষেরাই মুক্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের মতে জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক উভয়বিধ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এঁরা বলেন রাজকার্য্যে সততা এবং পরিশ্রম (integrity and diligence) এই দুটি গুণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ফ্রেণ্ডস সার্ভিসের লোকেরা রাজকার্য্যে কোন পদ অধিকার করিলে কোন কারণেই এই দুটি নীতি হইতে বিচ্যুত হন না। শুধু সরকারী কাজে নয়, বেসরকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানেই আমেরিকানরা ঐ দুটি

গুণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাই উহার কোনরূপ বিচ্যুতি সহ্য করেন না। ঐ দুটি গুণ ভিন্ন কোন জাতির কোন দেশের রাজকার্য্য চলিতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান প্রায়-অচল অবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ সরকারী কাজে সততা এবং শ্রমশীলতার অভাব।

Faith and Practice নামে এদের একটি বই আছে। উহাকে কোয়েকারদের গীতা বলা যায়। মিঃ ইভ্‌স বইটির এক কপি দিলেন।

দর্শন সোসাইটি

আমেরিকান দর্শন সোসাইটির (American Philosophical Society) বাড়ীটি স্বাধীনতা স্কোয়ারে অবস্থিত। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ধাঁচের বাড়ী। বাড়ী মেরামত করিয়া সুদৃঢ় করা হইয়াছে কিন্তু আকৃতি সেই একই রহিয়াছে। লাই-ব্রেরীর স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া পুরাণো বাড়ীর বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারে একটি নূতন বাড়ী তৈরি হইয়াছে। সেটি অবশ্য নূতন ষ্টাইলের।

আমেরিকান দর্শন সোসাইটি দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সমিতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমিতিগুলির অন্যতম। ১৭৪৩ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন উহা স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৬৬২ সালে। কতকটা রয়েল সোসাইটির আদর্শে এই দর্শন সমিতি স্থাপিত হয়।

সমিতির প্রেসিডেণ্ট সমস্ত ঘরগুলি দেখাইলেন। পুরাণো জিনিষ রক্ষার প্রতি আমেরিকানদের আগ্রহের পরিচয় এখানেও পরিস্ফুট। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হলে যেমন জর্জ্জ ওয়াশিংটনের চেয়ার, দোয়াত কলম প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে, এখানেও তেমনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের চেয়ার প্রভৃতি যত্নের সহিত রাখা আছে। প্রেসিডেণ্ট ঐগুলি খুব গর্ব্বের সঙ্গে দেখাইলেন। সমিতির বৈজ্ঞানিক সভ্যেরা যে সমস্ত প্রাচীন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেগুলিও যত্নের সাহত রক্ষিত আছে।

দর্শন সমিতি শুধু দর্শনমাত্র নয়, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই গবেষণা সুরু করিয়া দিয়াছিল। সমিতি প্রতিষ্ঠার ২৬ বৎসর পর উহাতে এই ছয়টি সেকসন তৈরি হয় :

(১) ভূগোল, অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান,

(২) চিকিৎসা এবং এনাটমি,

(৩) প্রকৃতির ইতিহাস এবং রসায়ন,

(৪) ব্যবসা ও বাণিজ্য,

(৫) মেকানিক্‌স এবং স্থপতিবিদ্যা,

(৬) কৃষি।

১৮১৫ সালে সপ্তম সেকসন তৈরি হয়। উহার আলোচ্য বিষয় ছিল ইতিহাস, নীতিবিজ্ঞান এবং সাধারণ সাহিত্য।

১৯৩৬-এ সেকসনগুলি পুনর্গঠিত হয় এবং উহাদিগকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) অর্থ এবং পদার্থবিজ্ঞান,

(২) ভূতত্ত্ব এবং প্রাণীবিজ্ঞান,

(৩) সমাজ বিজ্ঞান,

(৪) হিউম্যানিটিজ।

আমেরিকার দর্শন সোসাইটি হইতে পরে আমেরিকার আরও অনেক সোসাইটির উদ্ভব হইয়াছে। এই কারণে উহাকে বহু সোসাইটির জননী বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সোসাইটির লাইব্রেরীতে বই বেশী নাই—মাত্র এক লক্ষ, কিন্তু পাণ্ডুলিপি আছে আড়াই লক্ষ। তা ছাড়া অজস্র পুস্তিকা এবং মানচিত্র আছে। এ দিক দিয়া লাইব্রেরীটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরী রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আমেরিকার গত দুই শতাব্দীর ইনটেলেকচুয়াল অগ্রগতির যে সমস্ত দলিল এখানে আছে, এমন আর কোথাও নাই। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের লাইব্রেরী এবং তাঁর সমস্ত কাগজপত্র এখানে আছে। ১৯৫৩ সাল হইতে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সোসাইটি Papers of Benjamin Franklin প্রকাশ করিতেছেন। জেফারসন নিজের হাতে স্বাধীনতার সনদের—Declaration of Independence—যে খসড়াটি করিয়াছিলেন সেটি দেখিলাম।

একদিন বিকালের দিকে একটু সময় ছিল। মিস ফোলের জিজ্ঞাসা করিলেন, ফিলাডেলফিয়ার বৃহত্তম পাবলিশিং কোম্পানী কার্টিস পাবলিশিং হাউস দেখিতে চাই কি না। এরা স্যাটার্ডে ইভনিং নিউজ নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক। স্যাটার্ডে ইভনিং নিউজের একটি বিশেষত্ব আছে; Adventures of the Mind নামে এরা একটি সিরিজ ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করে। মানব সমাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক অতি সুন্দর সহজবোধ্য প্রবন্ধ এই সিরিজে প্রকাশিত হইয়া

থাকে। প্রবন্ধগুলি কত বিভিন্ন স্তরের এবং উঁচুদরের, কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে—

(১) সাধারণ লোকের জন্য পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্ক

(২) মানুষের মস্তিষ্ক

(৩) কবিতা কি ভাবে লেখে

(৪) স্বাধীনতার দায়িত্ব

(৫) বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতি

(৬) গণতন্ত্রের বিপদ

(৭) মানুষ ও মূলধন

(৮) অর্থনৈতিক বিপ্লব

(৯) তোমার মস্তিষ্ক এবং তোমার ব্যবহার

(১০) সংস্কৃতির সংঘর্ষ ইত্যাদি।

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই সমস্ত প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে। স্যাটার্ডে ইভনিং পোষ্টের সম্পাদক রিচার্ড থ্রয়েলসনের সঙ্গে পরিচয় হইল। দুখানি বই-ই তিনি উপহার দিলেন। ইভনিং পোষ্ট পড়ি এবং ঐ সিরিজটি খুব ভাল লাগে, উহা পড়িয়া উপকৃত হই—ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক খুব খুসী। এদের প্রকাণ্ড ছাপাখানা আছে। ওয়াশিংটন যাওয়ার পথে রেললাইনের ধারে উহা দেখা যাইবে বলিয়া দিলেন। দেখিয়াছিলাম।

সম্পাদক একটি প্রশ্ন করিলেন—নেহরুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হইবেন?

বলিলাম—ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। আপনাদেরই মত আমাদের দেশেও গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের দ্বারা নেতা নির্ব্বাচিত হয়। আপনারা ইলেকটোরেল কলেজ মারফৎ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করেন এবং প্রেসিডেন্ট গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। আমাদের দেশে আগে পার্লামেণ্টের সমুদয় সদস্য নির্ব্বাচিত হন, তার পর যে পার্টি পার্লামেণ্টে মেজরিটি আসন লাভ করেন তাঁহারা নিজেদের নেতা নির্ব্বাচন করেন এবং সেই নেতা প্রধানমন্ত্রী হইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। নেহরু অমর নহেন। একদিন তাঁর মৃত্যুতে অথবা অবসর গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবেই এবং পার্লামেণ্টের মেজরিটি পার্টি সেদিন যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন তাঁহাকেই নেতা

নির্ব্বাচিত করিবেন। নেহরুর পর সেই লোক কে হইবেন তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

সম্পাদক বলিলেন—অনেক ভারতীয়কে এই প্রশ্ন করিয়াছি। সকলেই কোন না কোন নাম করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন মোরারাজ দেশাই, কেহ বা কৃষ্ণ মেনন। কিন্তু আপনার এই জবাবই যথার্থ। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাহার জনপ্রিয়তা সর্ব্বাধিক হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না।

বাহির হইবার সময় আমার জন্য তৈরি বইয়ের যে বাণ্ডিল দেখিলাম তাহা বহন করিয়া নিয়া যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। উহা ডাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় নিলাম।

আদালত

আমেরিকার আদালতের কাজ কি ভাবে চলে দেখিতে চাহিয়াছিলাম। ফিলাডেলফিয়ার জজ স্পলডিং আদালতের ডিরেক্টর অফ প্রোবেশন ডাঃ জন রাইনম্যানকে চিঠি দিয়া দিলেন। সকাল ৯টায় মিউনিসিপাল আদালতে উপস্থিত হইলাম। ডাঃ রাইনম্যানকে কোথায় পাই ভাবিতেছি এমন সময় আদালতের এক অফিসার আসিয়া বলিল—আমি কি কোন সাহায্য করিতে পারি?

বলিলাম—নিশ্চয় পার। ডাঃ রাইনম্যানের অফিসটা দেখাইয়া দাও।

সেই লোক তাঁর অফিসে পৌঁছিয়া দিল। ডাঃ রাইনম্যান তাঁর সেক্রেটারী মিসেস রুথ নেফকে সঙ্গে দিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিলেন। আদালত চারিটি—বালক আদালত (Juvenile Court), পারিবারিক কলহ আদালত (Domestic Relation Court), সিভিল আদালত এবং ফৌজদারী আদালত। প্রথম দুটি এক বাড়ীতে, দ্বিতীয় দুটি অপর বাড়ীতে। তিন জন জজের কাছে চিঠিতে স্পলডিং আমার পরিচয় দিয়া দিলেন। চতুর্থ আদালতের জজ তিনি স্বয়ং।

প্রথম গেলাম বালক আদালতে। একেই বলে বিচার আদালত। বাড়ীটি সুন্দর এবং সর্ব্বত্র এক গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। কোথাও কোন গোলমাল ধাকাধাক্কি নাই। বাদী, বিবাদী এবং সাক্ষীদের বসিবার প্রশস্ত সুন্দর ঘর। প্রত্যেকের জন্য ভাল চেয়ার। কোন আদালতে কোন কাঠগড়া নাই। মামলার ডাক হইলে বেঞ্চ ক্লার্ক নম্বর বলিয়া দেয়। একজন অফিসার প্রতীক্ষা কক্ষের দরজায় দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক স্বরে তার তালিকা হইতে বাদী বিবাদীর নাম ডাকে। তাহারা আদালত কক্ষে প্রবেশ করিয়া জজের সামনে দাঁড়ায়। অনেকগুলি মামলায় দেখিলাম, পিতামাতা সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে প্রথমে বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করে। জজ আবেদন পত্র পড়িয়া আগেই প্রস্তুত হইয়া নেন। কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে জেলা এটর্ণীকে প্রশ্ন করিয়া সবটা জানিয়া নেন। তার পর নিজেই পিতা মাতা এবং বালক, ফৌজদারী মামলা হইলে পুলিশ, সকলকে প্রশ্ন করেন। সাধারণ মামলার মীমাংসা হইতে মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগে না। দুইটি মামলায় একটু বিশেষত্ব ছিল।

প্রথমটিতে পিতা পুত্রের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছে, পত্নীকেও কষ্ট দেয়। জজ

পিতাকে চাপিয়া ধরিলেন এবং সে সাফাই গাহিতে সুরু করিলে ধমক দিয়া বলিলেন—এই বালক কতখানি বেপরোয়া (desperate) হইয়া আদালতে আসিয়াছে তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। তুমি কর্ত্তব্য পালন না করিলে তোমাকে আমি জেলে পাঠাইব। বালকটি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিল। তার মাও কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোর্ট অফিসারেরা আসিয়া দুইজনকে সরাইয়া নিয়া গেল। তবু পিতার বেয়াড়াপনা ভাঙ্গে না দেখিয়া জজ তাকে চার মাসের কারাবাসের আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় মামলা উঠিল। একটি ১৭ বৎসরের বালক তার একটি সঙ্গী নিয়া ট্যাক্সি চড়িয়াছে। কিছুদূর গিয়া দুইজনে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পিছন হইতে আঘাত করিয়া তার টাকা নিয়া চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। পলাইতে পারে নাই। ধরা পড়িয়াছে।

জজের প্রশ্নের উত্তরে বালক বলিল—তাহাদের দুইজনের ট্যাক্সি চড়িবার সখ হইয়াছিল, কিন্তু পকেটে পয়সা ছিল না। দুজনে যুক্তি করিয়াছিল যে, ট্যাক্সি ড্রাইভারের নিকট হইতে টাকা নিয়া তাহাকে ভাড়া মিটাইবে। তাই তাহার ব্যাগ কাড়িয়া নিয়াছিল এবং হট্টগোলে ভয় পাইয়া ছুট দিয়াছিল।

জজ ইহাতে খুব বিচলিত বোধ করিলেন এবং বলিলেন—দেশের লোক এখানে আসিয়া দেখুক আমাদের ছেলেরা আজ কোন্ জাহান্নমে চলিয়াছে। বালকটিকে তিনি ২১ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত কারাবাসের আদেশ দিলেন। কোর্ট অফিসার তাহাকে সরাইয়া নিতে আসিলে বালকটি কিল চড় লাথি মারিয়া এক ভয়ানক হল্লা সুরু করিয়া দিল। তাহাকে টানিয়া সরাইতে হইল। এক মহিলা কাঁদিতে কাঁদিতে জজকে বলিলেন—এটি আমার ছেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মাথার গোলমাল হইয়াছে, এ এরকম ছিল না।

জজ হফম্যান বলিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার ছেলেকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠাইব এবং সত্যই যদি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ধরা পড়ে তাহা হইলে তাহাকে জেল হইতে মুক্তি দিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিব।

মিসেস নেফ আসিয়া পিছন হইতে স্কন্ধে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। এর পর পারিবারিক কলহ আদালত। বালক আদালতে উকীল মোক্তার নাই। এখানে আছে।

পারিবারিক কলহের পরিণতি সাধারণতঃ ডাইভোর্সে পর্য্যবসিত হয়। দরখাস্ত পড়িলে প্রথমে সালিশী অফিসারেরা মীমাংসার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তখন মামলা আদালতে ওঠে।

আদালতে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি মামলা চলিতেছে। জজ কালিক শুনিতেছেন। বাদী স্ত্রী, বিবাদী স্বামী, দুজনের পাশে দুজনের উকীল। এক উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে অন্য উকীল বলিবেন এবং বাদী বিবদী চুপ করিয়া শুনিবে, বড় জোর নিজের উকীলের কানে ফিস ফিস করিবে, এই নিয়ম দেখিলাম না। এক উকীলের বক্তৃতা খানিকটা শুনিয়া জজ অপর উকীলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মাঝে মাঝে নিজে বাদী বিবাদীকে প্রশ্ন করিতেছেন। এই মামলায় পত্নী খোরপোষের যে টাকা দাবী করিয়াছে স্বামী তাহা দিতে পারিবে না বলিয়া বলিতেছে। স্বামীর আয় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য তখনই তার ব্যবসার অংশীদারকে সাক্ষী ডাকা হইল। জজ নিজে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। স্ত্রী বলিল—ভল্টে ওর অনেক টাকা আছে। জজ ভল্ট পরীক্ষার জন্য দুই দিন সময় দিলেন।

আমি আদালতকক্ষে প্রবেশ করিবার পর মিসেস নেফ কোর্ট অফিসারকে দিয়া ডাঃ রাইনম্যানের চিঠি জজ কালিককে পাঠাইয়া দিলেন। চিঠি পড়িয়া জজ বিচারের মাঝখানেই সকলকে আমার পরিচয় দিলেন এবং বসিতে বলিলেন। পিছনের চেয়ারে বসিতে উদ্যত হইলে সামনের আসনে বসিতে বলিলেন। যেখানে বসিলাম সেখানে পাশে ছিলেন এক মহিলা। তিনি বলিলেন—আমি নার্স। অনেক মামলায় মেয়েরা এত বিচলিত হইয়া পড়ে যে তাহাদের সামলানো কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, সেই জন্য আমাকে আদালতে থাকিতে হয়।

উপরোক্ত মামলা শেষ হইলে সিভিল ও ক্রিমিনাল আদালতে গেলাম। এবার মিসেস নেফ সঙ্গে রহিলেন। প্রথমে জজ স্পলডিং-এর আদালত। একটি মামলার বিচার চলিতেছে। সাক্ষীর পর সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা চলিতেছে। যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, তাহারাও আদালত কক্ষেই বসিয়া রহিয়াছে। সাক্ষীরা শপথ নেওয়ার পর বসিতেছে এবং উকীলরা বসিয়া তাহাদের জেরা করিতেছেন। জজ নিজে জবানবন্দী লেখেন না, অন্য লোক লেখে। কদাচ তাঁকে নোট নিতে দেখিলাম।

জজ স্পলডিং বার বার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন কিন্তু আদালত

কক্ষে কিছু বলিলেন না। পোষাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। ক্রিমিনাল কোর্টে যাওয়ার জন্য বাহিরে আসিবামাত্র একজন কোর্ট অফিসার ছুটিয়া আসিয়া বলিল—জজ স্পলডিং আপনাকে তাঁর খাস কামরায় একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।

গেলাম। জজ স্পলডিং আদালত হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আলাপ করিতে পারিলাম না; আজ নিউ ইয়র্কে আপীল আদালতে একজন জজের শপথ গ্রহণ হইবে, আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

বলিলাম—দেশে ফিরিবার পথে আবার এখানে আসিব এবং তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনাদের আদালত সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানিবার আছে, অনেক কিছু নূতন এখানে দেখিতেছি। আপনার সহিত আলাপ করিলে আমি উপকৃত হইবে।

তাহাই স্থির হইল। এবার চলিলাম ক্রিমিনাল আদালতে। এখানে জজ ক্যারল বিচারাসনে। একটি খুনের মামলা চলিতেছে। মিসেস নেক জজের কাছে চিঠি পাঠাইলেন। দুজনে পিছনের দিকে বসিলাম। চিঠি পড়িয়াই জজ ক্যারল বলিলেন—আপনি সামনে আসিয়া জুরীর আসনে বসুন। আদালতের সকলকে বলিলেন—ভারত হইতে আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু আসিয়াছেন। উঠিয়া জুরীর আসনে বসিতে গেলে বলিলেন—না না, ওখানে না, একেবারে সামনের প্রথম চেয়ারে বসুন।

খুনী একটি নিগ্রো। এখানেও কোন কাঠগড়া নাই। মামলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, সব শেষে খুনীকে সাক্ষীর আসনে তোলা হইয়াছে। সরকারী উকীল, খুনীর উকীল এবং জজ তিনজনে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন। সরকারী উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘটনার দিনে কয় গেলাস টেনেছিলে? খুনী বলিল—না, বেশী খাই নাই, একটা বারে ঢুকে মাত্র এক গেলাস খেয়েছিলাম।

খুনী নামিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। উকীল, সাক্ষী, খুনী সকলের জন্য সামনে চেয়ার। দর্শকদের চেয়ার পিছনে। রায় হইল—দ্বিতীয় ডিগ্রী খুন, ১৭ বছর জেল।

এর পর ডাক হইল একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলার। আসামী, সাক্ষী প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে আসিয়া বসিল। জজ ইচ্ছামত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এখানেও জেরার সময় উকীল এবং সাক্ষী দুজনেই বসেন, জজের সঙ্গে কথা বলিতে হইলে উঠিয়া দাঁড়ান।

একটা বাজে। ডাঃ রাইনম্যান মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। উঠিয়া জজের নিকট বিদায় চাহিলাম। অত সামনে হইতে সড়াৎ করিয়া সরিয়া পড়া অসম্ভব।

জজ নিকটে ডাকিলেন। মামলার মাঝখানেই কথা বলিলেন। করমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিলেন।

আমাদের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে এদের একটি অতি বড় তফাৎ লক্ষ্য করিলাম। এরা ঘটনাটাকে আগে খুব ভাল করিয়া দেখে এবং মোটামুটি ন্যায়বিচার কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা ধারণা করিয়া নেয়। জজেরা কাগজপত্র অত্যন্ত ভাল করিয়া দেখিয়া আসেন। ঐ খুনের মামলায় আসামীর উকীল অনুকম্পার কথা বলিলে জজ বলিয়া উঠিলেন—না, না, সে এর আগে পাঁচবার জেল খেটেছে, এই লোক দাগী আসামী, কোন দয়া এর প্রাপ্য নয়।

একজন কোর্ট অফিসার আসিয়া আমার কানে কানে বলিয়া গেল—এই কথাটা কিন্তু সরকারী উকীলও বলেন নাই,। দেখ জজ কত খবর রাখে।

সমস্ত আদালতটিতে একটা সুস্থ ভদ্র আবহাওয়া বিরাজিত থাকে। লাল-পাগড়ী নাই। কোর্ট অফিসারই কনেষ্টবল। সাধারণ পোষাক, বুকে একটা ছোট ব্যাজ। অতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। সাধারণ কাঠের চেয়ারই বেশী। কাঠগড়া এবং খাঁচা না থাকিলে আদালত কক্ষ কত মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন দেখায় তাহা না দেখিলে বুঝা মুস্কিল। আমাদের আলিপুর বা শিয়ালদার আদালত কক্ষ গোয়ালঘর বা গ্যারেজ কি না ঠাহর করিতে কষ্ট হয়। উকীল, সাক্ষী বা আসামী কাহাকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না। মনে আছে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে এক ডাক্তারকে পুলিশ মোটরগাড়ী চাপা দেওয়ার মামলায় জড়াইয়াছিল। একদিন ডাক্তারকে বসিতে দেওয়ার অনুমতি চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট রাজারাম বিশ্বাস বলিয়াছিলেন—Why? সেই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল।

আর এখানে খুনী আসামীকেও বসিতে দেয়।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকান জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জনের জন্য পাকিস্থান প্রাণপণ যত্ন করিতেছে। ভারতের পক্ষে কিছুই করা হইতেছে না। অথচ ভারতের প্রতি একটি আন্তরিক সহানুভূতি আমেরিকানদের মধ্যে আছে। অনেক জায়গায় ট্যাক্সি ড্রাইভার বা রেস্তোঁরার লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আর ইউ ফ্রম প্যাকিস্তান? আমি ভারতীয়—একথা বলিবামাত্র পরম আগ্রহের সঙ্গে কথা বলিয়াছে। এমন অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে যাহারা যুদ্ধের সময় ভারতে ছিল।

"ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার" আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ইনটেলেকচুয়াল দৈনিক সংবাদপত্র। উহাতে প্রায়ই দেখিতাম পাকিস্তানের কথা পূর্ণ পৃষ্ঠা বাহির হয়। ভারতের কথাও অবশ্য ভালই প্রকাশিত হয়, কিন্তু পাকিস্থানের মত অত ফলাও করিয়া নয়। সারোখ সাবভালা ভারতে তাহাদের প্রতিনিধি। মণিটার অফিসে গিয়া উহার প্রধান সম্পাদক আরউইন কানহামের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমেরিকার সাংবাদিক জীবনে কানহামেরস্থান খুব উচ্চে। ভারত সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি জানেন, আরও জানিতে চাহিলেন। নিজেই সঙ্গে করিয়া পেঁছাইয় দিলেন ভারত ও পাকিস্থানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রিচার্ড নেফ-এর টেবিলে। পাশের বইয়ের তাকে দেখিলাম ভারত সম্বন্ধে ভাল রেফারেন্স বই আছে। তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম, ভারত সম্পর্কে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিবরণ প্রকাশের জন্য যে পরিমাণ তথ্য পাওয়া দরকার তাহা সংগ্রহের সুযোগ কম, পাকিস্থান তার বন্দোবস্ত করিয়াছে। ইনটেলকচুয়ালদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিলে আমেরিকায় তাহাদের প্রচারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে ইহা তাহারা বুঝিয়াছে।

কতটা বুঝিয়াছে তার দ্বিতীয় পরিচয় পাইলাম বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে। এই লাইব্রেরীটি আমেরিকার পণ্ডিত সমাজের একটি মস্ত বড় ঘাঁটি। রিডিং রুম দোতলায়। সিঁড়িটি এক তলা হইতে অর্দ্ধেক উঠিয়া দুই দিকে ভাগ হইয়া গিয়াছে। বাম দিক দিয়া উঠিলে অর্দ্ধপথে আছে একটি শো কেস। তাহাতে পাকিস্থানী কতকগুলি প্রচারপত্র এবং জিন্নার একটি বড় ছবি। দোতলায় রিডিং

রুমে প্রবেশ দ্বারের দুপাশে তিনটি করিয়া শো কেস। পাকিস্থানী প্রচারপত্রে ভর্ত্তি ডান দিকের সিঁড়ির মাঝখানে তাকাইয়া দেখি সেখানেও একটি শো কেস। নামিয়া গিয়া দেখিলাম একই ব্যাপার। সেটিও পাকিস্থানী শো কেস, তাহাতে রহিয়াছে আয়ুব খাঁর ছবি। বিশ্বের দুটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড এবং বোষ্টন এই সহরে অবস্থিত। এই লাইব্রেরীতে আসেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক এবং ছাত্রদল। বাম দিকে জিন্না, ডান দিকে আয়ুব খাঁকে সেলাম না করিয়া লাইব্রেরীতে ঢোকা যায় না। ভারত তো দূরের কথা, অন্য কোন দেশের শো কেস নাই।

ওয়াশিংটন দূতাবাসে কর্ত্তাদের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইল তখন এই সংবাদ জানাইয়া জবাব পাইলাম—তাই নাকি? আমাদের তো কেহ বলে নাই? বলিলাম—ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারে পাকিস্থানী প্রচার দেখিয়াও কি আপনারা বোষ্টনে উহাদের কর্ম্মতৎপরতায় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই? উঁহাদের মতলব বুঝিতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ঐ সংবাদপত্র বা লাইব্রেরীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ ইহার প্রতিকার নহে। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিলে এবং লাইব্রেরীতে শো কেসগুলি রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে রাখা হইয়াছে ইহা তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেই প্রতিকার হইবে। ভারতীয় দূতাবাস লড়িয়াছেন কি না এবং প্রতিকার হইয়াছে কি না জানি না।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্থানী তৎপরতার আরও পরিচয় পাইলাম। গিয়াছিলাম ডাঃ নরমান ব্রাউনের কাছে। তিনি বলিলেন—আজ এখানে এশিয়া বিভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আছে; আপনি কি যোগ দিতে চাহেন? এ সুযোগ কি আমি ছাড়ি? গেলাম তাঁর সঙ্গে সেমিনারে।

ডাঃ শর্টবার্গ নামে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এক বৎসর ভারতে ছিলেন গবেষণার কাজে। গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা। ভারতের অনেকগুলি জায়গায় তিনি থাকিয়াছেন এবং বিষয়টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁর বইয়ের সারাংশ তৈরি হইয়াছে এবং উহা তিনি ঐ সেমিনারে পড়িবেন। পাকিস্থান এই সংবাদ রাখিয়াছে। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুসলমান অধ্যাপককে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহারা ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে বসাইয়া রাখিয়াছে এবং ঐদিন সিলেট কলেজের এক হিন্দু অধ্যাপককে সেখানে পাঠাইয়াছে। ভারতের পক্ষে কেহ নাই। নিছক ঘটনাচক্রে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছি।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে শর্টবার্গ ঠিকভাবেই বলিলেন। ভারতীয় মুসলমানেরা কোথা হইতে আসিল সে সম্বন্ধে শর্টবার্গ বলিলেন—ইহারা আরব হইতে আসিয়াছে বলিয়া দাবী করে।

যখন বলিলাম—ভারতীয় মুসলমানেরা আরব হইতে আসে নাই, তাহারা ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু মাত্র; তখন রাজসাহীর অধ্যাপকটি বলিয়া উঠিলেন—জীবনে প্রথম আমি এই কথা শুনিলাম।

বলিলাম—তিনটি বইয়ের উল্লেখ আমি এই প্রসঙ্গে করিতেছি। রিজলি ও গেইটের ভারতীয় সেন্সাস রিপোর্ট, পোর্টারের বঙ্গীয় সেন্সাস রিপোর্ট এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোলাম হোসেন লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাস রিয়াজুস সালাতিন। এই তিনখানি বইয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা কি ভাবে কত সংখ্যায় এবং কবে ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ আছে।

শর্টবার্গ বলিলেন—রিজলি রিপোর্ট আমার কাছে আছে কিন্তু উহা আমি ভাল করিয়া পড়ি নাই। আর দুটি বই আমি দেখি নাই।

বলিলাম—একটি অঙ্ক কষিয়া দেখুন। আরবের লোকসংখ্যা কত, মানুষ কি হারে বাড়িতে পারে, এই হারে আরবের সব লোক বাড়িলেও ভারতের মুসলমান সংখ্যার সমান হইতে পারে কি না?

ডাঃ ল্যাম্বার্ট নামে পেনসিলভানিয়ার আর এক অধ্যাপক সেমিনারে ছিলেন। তিনি পাইপ ফুঁকিতে ফুঁকিতে বলিলেন—হাঁ, আমরা বুঝিয়াছি। আরব হইতে আগত লোক এত বাড়িতে পারে না, ইহারা ধর্ম্মান্তরিতও নয়, এরা নিশ্চয়ই আকাশ হইতে পড়িয়াছে। (They must have dropped from the sky.)

শর্টবার্গ তিনটি বইয়েরই পূরো নাম, লেখকের নাম এবং কোথায় পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিয়া নিলেন।

পাকিস্থানী কূটনীতির আরও পরিচয় পাইলাম সেমিনারের পর। সেমিনার ভাঙ্গিবামাত্র পাকিস্থানী অধ্যাপক মালেক আসিয়া হ্যাণ্ডশেক করিলেন। একজন আমেরিকান অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন—Two friends after a vigorous debate। মালেক সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন। আগেই আর একটি নিমন্ত্রণ নিয়াছিলাম বলিয়া নিতান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও মালেকের অনুরোধ রাখিতে পরিলাম না।

সমালোচককে দূর হইতে কটূক্তি বর্ষণের ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতা আধুনিক জগতে আর নাই,—এই কথাটি আমরা আজও বুঝি নাই, পাকিস্থান ভাল ভাবেই বুঝিয়াছে। ভদ্র সমাজে সংযোগ রক্ষার জন্য তাহারা সর্ব্বত্র লোক পাঠাইতেছে। সমালোচকের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা তাহাকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আধুনিক সমাজের নিয়ম। ইহাই আধুনিক বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপ্লোম্যাসি। পাকিস্থানীরা আরবের খাস বংশধর—এই ভুল ইতিহাস প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহারা আগ্রহশীল এবং সতর্ক। আর আমরা নিজেদের প্রাচীন, মহান, গৌরবময় ঐতিহ্য বিদেশে প্রচারের কোন চেষ্টা করি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া বিভাগে অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে দেখি আনন্দবাজার পত্রিকা। জিজ্ঞাসা করিলাম—এটা দিয়ে তোমরা কি কর?

ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা আমরা আনি এবং মাইক্রোফিলম করিয়া সেগুলি রাখি।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া বিভাগের জ্ঞানান্বেষণ কত ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। আর দেখিলাম পাকিস্থান উহার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহশীল, ভারত উদাসীন।

ওয়াশিংটন

ফিলাডেলফিয়া হইতে রওনা হইব ওয়াশিংটন। সেদিন ছিল রবিবার। ওয়াশিংটনে ডেভিস হাউসে উঠিব। সকাল বেলা হঠাৎ মনে পড়িল ডেভিস হাউসের ঠিকানা তো আনি নাই। ফিলাডেলফিয়ায় ছিলাম রুজভেল্ট হোটেলে। হোটেলের সঙ্গে ছিল রুজভেল্ট কফি শপ। চা খাইতাম সেখানে। নীচে আসিয়া হোটেলের কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করিলাম ওয়াশিংটনে ডেভিস হাউসের ঠিকানা তাহারা জানে কি না। হোটেল ডিরেক্টরী দেখিয়া বলিল—না, এতে তো নাম নাই। হোটেল হইলে নিশ্চয়ই নাম থাকিত।

ধাঁধায় পড়িলাম। কফি শপে চা খাইতে গেলাম। কফি শপের একজন পরিচারিকা এবং মালিকের সঙ্গে খুব আলাপ হইয়া গিয়াছিল। আমাকে দেখিলেই মহিলা আগে আসিয়া কি চাই জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন কোথা হইতে আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতীয় শুনিয়া যেন আরও দর বাড়িয়া গেল। একদিন মহিলা বলিলেন তাঁর এক ছেলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আর এক ছেলে মিলিটারীতে আছে। লক্ষ্য করিতাম তিনি নিজের গাড়ীতে আসিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মা হোটেলের পরিবেশিকার কাজ করিতেছেন। শ্রমের মর্য্যাদার এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। কফি শপের মালিকও গাড়ীতে আসিতেন। তাঁর সঙ্গে থাকিতেন একটি মহিলা এবং একটি বছর পনেরো বয়সের ছেলে। এরাও পরিবেশনের কাজ করিতেন। তিন জনেরই মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইত এরা খুব ভদ্র পরিবারের লোক। ইংলণ্ডে না গিয়া আমি কেমন করিয়া এত ভাল ইংরেজি শিখিলাম ইহাতে ভদ্রলোক খুব আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন।

যেদিন ফিলাডেলফিয়া হইতে রওনা হইতেছি সেদিন মালিকের পত্নী আসেন নাই। কি একটা অপারেসনের জন্য হাসপাতালে ছিলেন। ছেলেও আসে নাই। সেই মহিলা এবং মালিকের নিকট বিদায় নিলাম। হোটেল কাউণ্টারের মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—ট্যাক্সি চাই তো? দেখিলাম মহিলা একটি সুইচ টিপিলেন। তার পর মিনিট কয়েক চুপ চাপ। ভাবিতেছি—কই ট্যাক্সি ডাকিতে তো কাহাকেও বলিলেন না? এমনি সময় ট্যাক্সি আসিয়া গেল। তখন জানিলাম

সুইচ টিপিলে হোটেলের চূড়ায় একটি আলো জ্বলে। উহা দেখিলেই ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা বুঝিতে পারে হোটেল ট্যাক্সি চাহিতেছে।

ঠিকানা সমস্যার সমাধান নিজের মনেই করিয়া নিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম টেলিফোন গাইডে ডেভিস হাউস নিশ্চয়ই পাইব এবং উহাতে ঠিকানা মিলিবেই। তাহাই হইল। ওয়াশিংটনে নামিয়া প্রথমেই পাবলিক টেলিফোনের খোপে ঢুকিলাম। সারি সারি খোপ। প্রত্যেক খোপে একটি করিয়া টেলিফোন গাইড। খুলিয়া ডেভিস হাউসের ঠিকানা টুকিয়া নিলাম।

এইবার ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড। অল্প কয়েকটি ট্যাক্সি দাঁড়ানো। একজন সার্জ্জেণ্ট গন্তব্যস্থল জিজ্ঞাসা করিল। বলিলাম। সে সঙ্গে নিয়া একটি ট্যাক্সিতে পৌঁছিয়া দিল। উহাতে এক মহিলা বসিয়া ছিলেন। সার্জ্জেণ্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলিয়া দিল—এরা দুজনে একই দিকে যাইবে, নিয়া যাও।

ওয়াশিংটনের ট্যাক্সিতে মিটার নাই। সমগ্র সহরটি চার ভাগে বিভক্ত—উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব। একটি এলাকার মধ্যে যেখানেই যাও এক ভাড়া। এক এলাকা পার হইয়া অন্য এলাকার প্রথম রাস্তায় যে ভাড়া শেষ রাস্তাতেও তাই। ট্যাক্সির মধ্যে একটি ম্যাপ আছে, সুতরাং কোন্ এলাকায় আছি বা ঢুকিতেছি বুঝিতে কষ্ট হয় না। একা গেলে ৭৫ সেণ্ট, দুজন গেলে প্রত্যেকে ৫০ সেণ্ট।

ট্যাক্সি চলিল। মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোন্ দেশের লোক? ভারতীয় বলিতেই একেবারে খাড়া হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন—আমি ভারতের ভাষা সমস্যা বিষয়ে খুব আগ্রহশীল; তার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই।

—বেশ, বলুন, কি জানিতে চান?

—ভারতে শুনিয়াছি অসংখ্য ভাষা প্রচলিত এবং সব কয়টি ভাষাগোষ্ঠীতে ভয়ানক ঝগড়া মারামারি। সত্যি কথাটা কি?

—সত্যি কথাটা হইতেছে এই যে, ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষা চৌদ্দটি এবং উপভাষা প্রায় দুই শত। ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ কিছুই নাই, প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের একটা শাসনতান্ত্রিক ইউনিট বা প্রদেশ চায়। সেই দাবীর যৌক্তিকতা নিয়া মতভেদ আছে। কেহ মনে করেন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ ভাল, তাহাতে সকল প্রকার কাজকর্ম্ম এবং প্রতিভা বিকাশের সুবিধা হয়; আবার অন্য দল মনে করেন ইহাতে বিরোধ আরও বাড়ে।

—আচ্ছা, আগে ভাষাগুলোর নাম বলুন।

—বাজলা, হিন্দী…

—দাঁড়ান দাঁড়ান। কি বললেন? বাং…বাং…বাং-লা? হি কি?—হি …ন্ দি…।

—ওড়িয়া, মহারাষ্ট্রী—

এইবার মহিলা মহারাষ্ট্রীতে আসিয়া সেই যে আছাড় খাইলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। ষ্ট্র উচ্চারণ কিছুতেই হয় না। প্রতি বারই বলেন—মহোরাট্রি আমি বলি—না, মহারাষ্ট্রী। মোহারাট্রি—। আবার বলি—, মহারাষ্ট্রী। মহিলা নাছোড়বান্দা। ক্রমাগত সঠিক উচ্চারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিবার ব্যর্থ হইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমিও তর্ক হইতে রেহাই পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম।

ট্যাক্সি ডেভিস হাউসে পৌঁছিয়া গেল। বাড়ীর গায়ে নাম লেখা দেখিয়া বুঝিলাম ঠিকই আসিয়াছি। বাড়ীর সামনে ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা, বলিলেন—মিঃ বর্ম্মণ?

—হাঁ।

—আমি মিসেস চামার্স।

ডেভিস হাউসে মিসেস চামার্স সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন ইহা জানিতাম। ট্যাক্সির সেই মহিলার নিকট বিদায় নিতে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলাম।

—এটা কি জিনিষ?

—এই আমাদের দেশের অভিবাদনের রীতি, আমরা সেই সঙ্গে বলি নমস্কার।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

ডেভিস হাউস হোটেল নহে। কোয়েকারদের একটি বাড়ী। মিঃ এবং মিসেস চামার্স এখানে থাকেন। বাড়ীটিতে কয়েকজন অতিথি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কম খরচ, সুন্দর ব্যবস্থা এবং অতিশয় ভদ্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য এই বাড়ীর সন্ধান যাঁরা জানেন তাঁহারাই এখানে আসেন এবং বন্ধুবান্ধবকে আসিতে বলেন। অবস্থিতিও সহরের কেন্দ্রস্থলে। এখানকার একটি সুবিধা এই যে, সকালে ব্রেকফাষ্ট এবং বিকালে চা পাওয়া যায়। চার্জ্জও কম।

সকাল আটটায় দশ মিনিটের জন্য একটি প্রার্থনা বৈঠক হয়। একটি নির্দ্দিষ্ট ঘরে সকলে সমবেত হয় এবং পাঁচ মিনিট শুধু নীরবে বসিয়া থাকে। তারপর

পাঁচ মিনিট মিঃ অথবা মিসেস চামাল বাইবেল হইতে কোন অংশ পাঠ করেন। পাঠ অন্তে সমবেত সকলে গোল হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তার পর ব্রেকফাষ্ট টেবিলে রওনা হয়। ভাল একটি রিডিং রুম আছে। অনেক ভাল ম্যাগাজিন আসে।

ব্রেকফাষ্ট টেবিলে প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন অতিথির দর্শন মিলিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকান রাজিও দম্পতির সঙ্গে আলাপ হইল। ইরাণী, জাপানী, হাবসী প্রভৃতি অনেক জাতের লোকের সঙ্গে এক সপ্তাহের মধ্যে পরিচয় হইয়া গেল।

ডেভিস হাউসে অফিসের কাজ করিত একটি শাড়ীপরা তরুণী। হায়দরাবাদে বাড়ী, মুসলমান এবং এখন পাকিস্থানী নাগরিক। স্বামী হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে, পত্নী চাকরি করিয়া খরচ চালাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—হাসানের পড়া শেষ হইলে কি দেশে চলিয়া যাইবে? মেয়েটি বলিল—না, তখন হাসান চাকরি করিবে এবং সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবে। দুজনের ডিগ্রী নেওয়া শেষ হইলে তখন একসঙ্গে দেশে ফিরিবে।

আমেরিকার আরও বহু স্থানে এই জিনিষটি দেখিয়াছি; স্বামী চাকরি করিয়া পত্নীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতেছে; তার পড়া শেষ হইলে নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতেছে এবং পত্নী কাজ জুটাইয়া তাহার খরচ চালাইতেছে। সব গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের তরুণ তরুণীদের এই সুযোগ নিতে দেয়, দেয় না একা ভারত। অসংখ্য ভারতীয়, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী তরুণ তরুণী এই সুযোগ নিতে পারে। এরূপ চেষ্টায় বিশ্বের সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট সহায় হয়, আমোদের দেশে "ডেমোক্রাটিক' গবর্ণমেণ্টই এই উদ্যমশীলতার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

হোয়াইট হাউস

ম্যাডেন হোয়াইট হাউস দেখার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গিয়া দেখিলাম অনুমতি পাওয়া অতি সহজ, শুধু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইতে হয়। কার্ড লাগে না। গেটে তালিকা হাতে সার্জ্জেন্ট থাকে। নাম বলিলেই ঢুকিতে দেয়। আগে হইতে সময় ঠিক করিয়া নিতে হয় এই মাত্র। দশ বারোজন লোক জমিলে একজন সার্জ্জেন্ট তাহাদিগকে নিয়া রওনা হয়। বাড়ীটি আমাদের গবর্ণমেণ্ট হাউসের চেয়ে ছোট। আয়তন ১৭০ ফিট লম্বা এবং ৮৫ ফিট চওড়া। তিন তলায় প্রেসিডেণ্ট থাকেন, নীচের দুই তলায় অফিস। অফিস ঘরগুলির প্রত্যেকটি সকলকে দেখিতে দেয়। দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রধান হলে যে কারুকার্য্য এবং চাকচিক্য আছে হোয়াইট হাউসে তার কিছুই নাই। যে হলে রাজদূত প্রভৃতির অভ্যর্থনা বা বল নাচ প্রভৃতি হয় সেটি বড়, তাও আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবন বা গবর্ণমেণ্ট হাউসের তুলনায় অনেক ছোট। অফিস ঘরগুলি বেশ ছোট।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন বাদে আর প্রত্যেক প্রেসিডেণ্ট এই বাড়ীতে বাস করিয়াছেন। ১৭ একর জমির উপর বাড়ী। এটিই ওয়াশিংটনের সব চেয়ে পুরাণো ভবন। ১৭৯২ সালে প্রেসিডেণ্ট ভবনের ডিজাইনের এক প্রতিযোগিতা হয়। জেমস হোবান নামক জনৈক আইরিশ-আমেরিকানের ডিজাইন গৃহীত হয় এবং তিনি ৫০০ ডলার পুরস্কার পান। বাড়ীটি প্রথমে সাদা ছিল না। ছাই রং-এর স্যাণ্ডষ্টোনে তৈরি হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় উহারা বাড়ীটিতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং তাহাতে বাহিরের চেহারা নষ্ট হইয়া যায়। এর পর চুণকাম করিয়া বাড়ীর চেহারা সাদা করা হয়। বাড়ীটি তিনতলা, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে দোতলা মনে হয়। ১৯৪৯-এ বাড়ীটি বিপজ্জনক হইয়া উঠে। তখন তিনতলা বাদে বাকি দুই তলা একেবারে বদলাইয়া নূতন করিয়া ফেলা হয়। জেফারসন, লিঙ্কন প্রভৃতি যে সব ঘরে বসিয়া কাজ করিয়াছেন, যে ঘরে লিঙ্কন নিগ্রোদের মুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন

সেগুলি এখন আর নাই। পুরানো প্রেসিডেন্টদের ব্যবহৃত অনেক জিনিষপত্র আলমারীতে সাজানো আছে। সেদিক হইতে বাড়ীটিকে একটি মিউজিয়ামও বলা যায়। অনেকগুলি ঐতিহাসিক ছবিও আছে।

লক্ষ্য করিলাম প্রথম ঘরে রাষ্ট্রীয় শীলমোহরে ঈগলের মুখ বাম দিকে অর্থাৎ তীরের দিকে ফেরানো রহিয়াছে। পরে আর একটি ঘরে উহা বদলাইয়া গিয়াছে, ঈগলের মুখ ডান দিকে অর্থাৎ ওলিভ-গুচ্ছের দিকে ফিরিয়াছে। মনে হইল আমেরিকা যুদ্ধ হইতে শান্তির দিকে ফিরিয়াছে ইহাই হয়ত নূতন শীলমোহরের তাৎপর্য্য। সার্জ্জেণ্ট প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া উহার পরিচয় দিতেছিল। অত লোকের মধ্যে শীলের তাৎপর্য্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। পরে আমেরিকান ঐতিহাসিক এসোসিয়েসনে ডাঃ শেফারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং জানিয়াছিলাম আমার আন্দাজই ঠিক।

আসবাবপত্র খুব একটা মূল্যবান বলিয়া মনে হইল না। কম্পাউণ্ডে সর্ব্বত্র গাছের পাতা ছড়ানো। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনের তুলনায় হোয়াইট হাউসের বাগান অতিশয় নগণ্য। এদিক দিয়া দরিদ্র দেশের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী ধনকুবেরের দেশের প্রেসিডেণ্টের বাড়ীকে হার মানাইয়া দিয়াছে।

আমেরিকান কংগ্রেসের বাড়ী তৈরি হয় ১৮০০ সালে। ১৮১৪ সালে এটিতেও ইংরেজরা আগুন ধরাইয়া দেয় এবং বাড়ীটি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেরামত করিতে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। কংগ্রেসের বাড়ীকে এরা বলে ক্যাপিটল। বেশ উঁচু জায়গার উপর ৪ একর জমি নিয়া এই বাড়ী। দৈর্ঘ্য ৭৫০ ফিট, প্রস্থ ১৪০ ফিট, উচ্চতা ২৮৭ ফিট। ক্যাপিটলের ডিজাইন নিয়াও প্রতিযোগিতা হয় এবং সৌখীন আর্কিটেক্ট উইলিয়াম থর্ণটনের ডিজাইন মনোনীত হয়।

ক্যাপিটলের ভূগর্ভস্থ কারুকার্য্য অদ্ভুত। মাটির তলার পথ দিয়া কোথা হইতে কোথায় নিয়া চলিয়াছে অত অল্প সময়ে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। মাটির তলার রাস্তা দিয়া লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ। কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা অফিস ঘর। প্রত্যেকের আলাদা ষ্টাফ। আমেরিকার একমাত্র ভারতীয় কংগ্রেসম্যান দলীপ সিং সাউন্দের ঘরে গেলাম। তিনি ছিলেন না, নির্ব্বাচনকেন্দ্র কালিফোর্নিয়ায় গিয়াছিলেন।

প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট দুটিরই হল দেখিলাম। ডিজাইন আমাদের

পার্লামেন্টের মতই কিন্তু এখানেও আমরা আমেরিকাকে হার মানাইয়াছি। আসবাবপত্র আমাদের চেয়ে অনেক নিরেশ। অধিবেশন তখন ছিল না বলিয়া শুধু বাড়ীঘর দেখিয়াই ফিরিতে হইল।

ডেমোক্রাটিক পার্টি

ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি – আমেরিকার দুটি মাত্র রাজনৈতিক পার্টি। ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ারম্যান তখন ছিলেন জন বেইলি এবং রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান উইলিয়াম মিলার। ডেমোক্রাটিক পার্টি অফিস দর্শন এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা ফিলাডেলফিয়া অফিস করিয়া দিয়াছিল। রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ তাহারা করিয়াছিল কিন্তু পাকাপাকি সময় ঠিক করিতে পারে নাই, আমাকে করিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমার পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং কেবলমাত্র ডেমোক্রাটিক পার্টি অফিস দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

তখন নির্ব্বাচন চলিতেছে। চেয়ারম্যান বেইলি ওয়াশিংটনে ছিলেন না। কিন্তু কোন অসুবিধা হইল না। অফিসের আকারের কথা বলিয়া লাভ নাই। প্রকারটা কিছু তাৎপর্য্যপূর্ণ। একটি ঘরে লাইব্রেরীর মত কার্ড ইনডেক্স। কোন্ পার্টি কর্ম্মী কখন কোথায় আছে, কি কাজ করিতেছে তাহা সেই কার্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতে পারে। পার্টির প্রতি কেন্দ্রের প্রতি মিনিটের কাজের সঠিক বিবরণ রাখা যায়, ইহা না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত হইত।

আর একটি বস্তু নূতন ঠেকিল। একজনের কাছে নিয়া গেল এবং পরিচয় করাইয়া দিল—ইনি আমাদের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ। এঁর ঘরটি ছোট, বই এবং পত্রিকায় ঠাসা। পার্টি অফিসে ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ আমাদের কাছে একেবারে নূতন বস্তু। আমাদের দেশে দিল্লীতে কংগ্রেস পার্টির হেড অফিস দেখিয়াছি। সেখানে এই দুই বস্তুর একটিও নাই।

ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ বৃটিশ পার্লামেণ্টারি এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্র নিয়া আলোচনা হইল। আমার একটি ফরমূলা আছে—যে দেশ সামাজিক চেতনা এবং সামাজিক বিবেক (Social consciousness and social conscience) উচ্চমানে তুলিতে পারে নাই, সেখানে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র সফল হইতে

পারে না। বৃটেনকে এই স্তরে পৌঁছিতে দুই শতাব্দী সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ভারতের ন্যায় দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার মান কোনটিই এখনও পাতাল হইতে বেশী উপরে উঠিতে পারে নাই, সেখানে বৃটিশ পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করাই ভুল। বৃটিশ পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির সাফল্যের আর একটি উপাদান সদাজাগ্রত সতত নির্ভীক স্বাধীন সংবাদপত্র। এটি আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পর উহা লোপ পাইয়াছে। স্বাধীন সাংবাদিকতা এখন আর নাই।

আমেরিকানরা গ্রামে বৃটিশ পদ্ধতি নিয়াই যাত্রা সুরু করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাহাদের সংবিধান আমূল বদলাইয়া ফেলে। আইন, শাসন এবং বিচার রাষ্ট্রের এই তিন অঙ্গ কে কাহার উপর কতটা নির্ভর করিবে তাহা আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন। তখন আমেরিকাতেও আমাদেরই মত ছত্রিশ জাত, ছাপ্পান্ন ভাষা এবং অনেকগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যেই অজস্র ভেদ ছিল। জর্জ্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, প্রভৃতি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিলেন যার ফলে রাষ্ট্রের এই তিন অঙ্গ একেবারে পৃথক থাকিবে এবং একে অপরের উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। বৃটিশ পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে এই তিন অঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং তিনটির উপরেই শাসন বিভাগ কর্ত্তৃত্ব করে। আইন সভার নেতা গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। গবর্ণমেণ্ট আইনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে আনেন। আইন সভার সভ্য হইয়া ঢুকিতে পারিলে মন্ত্রী হইবার সুযোগ থাকে এবং বিরোধী দলের লোক হইলেও গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আইন সভার সভ্যের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টকে দিয়া ব্যক্তি বা কোম্পানী-গত স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া দেওয়ার সুযোগ থাকে বলিয়া নিজস্ব লোক আইন সভায় প্রেরণে কায়েমী স্বার্থদের আগ্রহ থাকে। বিচার বিভাগের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না বটে কিন্তু পার্লামেণ্ট মারফৎ গবর্ণমেণ্ট আদালতের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে পারে।

ভারতে বৃটিশ পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। এখানেও আইনসভা এবং আদালতের উপর গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা। একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। সেই সময়ে বেরুবাড়ী আন্দোলন চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থানকে বেরুবাড়ী দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন—সংবিধান মতে তাহা করা

যায় না। গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে বিল আনিয়া সংবিধান সংশোধন করিলেন। আবার মামলা হইল। এবার সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন সংবিধান মতে বেরুবাড়ী দেওয়া যায়।

আমেরিকান সংবিধানের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ পৃথক। আইন সভা আইন এবং বাজেট তৈরি করিবে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবে না, গবর্ণমেণ্টের নিকট তার কাজের কৈফিয়তও চাহিতে পারিবে না। চার বছর বাদে একবার জনসাধারণকে ডাকিয়া বলা হয়—তোমরা একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন কর; দেশ শাসনের সকল প্রকার দায়িত্ব তাঁহার হাতে অর্পণ করিতে হইবে। শাসনের ভাল মন্দ সব কিছুর দায়িত্ব একা তাঁহাকেই নিতে হইবে। যদি তিনি ব্যর্থ হন তবে চার বছর বাদে তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইবে। যদি সফল হন তবে তিন টার্মে বারো বছর পর্য্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইতে পারিবে। আইন সভা যে আইন এবং বাজেট তৈরি করিবে প্রেসিডেণ্টকে তার চৌহদ্দির মধ্যে থাকিতে হইবে। তিনি নিজের মনোমত দশ জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন, ইঁহারা আইন সভায় ঢুকিবেন না। সেক্রেটারীর নিয়োগ এবং পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে প্রেসিডেণ্টের উপর নির্ভর করিবে। আইন প্রণেতা এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বাধ্যবাধকতার ঘনিষ্ঠতা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ পার্লামেণ্টারি প্রথায় গবর্ণমেণ্টকে পার্লামেণ্টের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং এম. পি-দের তোয়াজ করিতে হয়। আমেরিকান পদ্ধতিতে এই সম্পর্ক নাই। আইন সভা অথবা গবর্ণমেণ্ট সংবিধান বিরোধী কাজ করিতেছে মনে করিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। সংবিধান বদলানো আমাদের মত সহজ নয়। আমাদের মত গবর্ণমেণ্টের খুসী মাফিক সুপ্রীম কোর্টের হাত পা বাঁধিবার উপায় আমেরিকার নাই। সংবিধান পরিবর্ত্তন সহজ করা পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির অন্যতম বিশেষত্ব এবং আমেরিকান পদ্ধতির বিশেষত্ব সংবিধান পরিবর্ত্তনের কঠোরতা।

ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ আমার এই বিশ্লেষণ সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন—অনগ্রসর দেশে বৃটিশ পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি প্রবর্ত্তন সফল হইয়াছে ইহা বলা যায় না।

বলিলাম—মিশর হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত দেখুন, এশিয়ার যত দেশে বৃটিশ পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তার একটিতেও উহা টিঁকে নাই। হয়

সামরিক ডিক্টেটরশিপ নয় তো কমুনিষ্ট ডিক্টেটরশিপ আসিয়াছে। ভারতে যাহা চলিতেছে তাহাকেও ডিক্টেটরশিপেরই একটি রূপ বলা যায়।

—আমিও ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি। আপনাদের দেশে যাহা চলিতেছে তাহাকে প্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপ (Disguised dictatorship) বলা যায়।

অনেক কথায় যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা তিনি দুটি মাত্র শব্দে বুঝাইয়া দিলেন।

লাইব্রেরীটিও কম বড় নয়। যিনি অফিস দেখাইতেছিলেন (নামটা মনে নাই) তিনি চা আনিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের পার্টির প্রতীক গাধা কেন? রিপাবলিকান পার্টির প্রতীকই বা হাতী কেন?

—প্রায় দুশো বছর আগে পার্টি যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ভোটদাতারা হয় ছিল গাধার মত বোকা, নয় তো হাতীর মত মন্থর। পার্টি প্রতীকে ভোট-দাতাদের চরিত্র প্রতিফলিত করা উচিত—হয়তো ইহা মনে করিয়াই প্রাচীনেরা ঐ দুই প্রতীক বছিয়া নিয়াছিলেন।

তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তবে একটা কথা। হাতী আর গাধা দুটোরই বুদ্ধি মুলতঃ একই, দুটোই সমান বোকা। দুটোই ভোটদাতাদের একই চরিত্রের প্রতীক।

বলিলাম—এখনও কি ভোটারদের বুদ্ধি খুব বেশী বাড়িয়াছে?

উইমেন ভোটার লীগ

লীগ অব উইমেন ভোটার্‌স অফিস। এটি আমেরিকার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। মেয়েরা এটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমেরিকান নারী ভোটারদের কি ভাবে ভোট দেওয়া উচিত তাহা শিখানো এঁদের কাজ। এঁরা রাজনীতির চূড়ান্ত করেন কিন্তু দলাদলি একেবারেই নাই। আমি সেখানে থাকার সময়েই এক নাইজেরিয়ান সাংবাদিক মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

—আপনারা তো দেশের রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামান; আপনাদের নিজেদের নির্ব্বাচনে রাজনীতি হয় না?

আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিসেস সিমরেল। তিনি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—আমাদের নির্ব্বাচনে রাজনীতির মানে?

—মানে আপনাদের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী নির্ব্বাচনে দলাদলি হয় না?

—মোটেই না। আমাদের নিয়ম আছে যে, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী বা বোর্ডের কোন সভ্যা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সভ্যা থাকতে পারবেন না। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে কে কোন্ দলের সঙ্গে জড়িত তা আমরাই অনেকে জানি না। আমাদের নিজেদের কর্ম্মকর্ত্রী নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা নিয়ে কোন ভোটাভুটি হয় না। নিজেরাই ঠিক করে নেই।

—সে কি কথা। আমাদের দেশে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী নির্ব্বাচন নিয়েই তো কাটাকাটি হয়ে যাবে।

বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ আবার কি রকম প্রতিষ্ঠান? মেয়েমানুষ ঝগড়া করে না—এও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? খুব তীব্র ভাবেই মিসেস সিমরেলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, এটা অভিনয় নয়।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সিমরেল জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের দেশেও কি এ রকম দলাদলি হয়?

তাহা মিথ্যা কথা বলিলাম—মোটেই না, আমাদের দেশে অনেক রকম নারী প্রতিষ্ঠান আছে, ঠিক এ রকম অবশ্য নাই। তারা তো দলাদলি করে না?

নাইজিরিয়ান মহিলাটি তরুণী এবং খুব চটপটে। সে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

মহিলা বলিলেন—আপনি কাল দুপুরে এখানে আসুন, কাল আমাদের দেশব্যাপী নির্ব্বাচনের দিন। আপনাকে আমাদের নির্ব্বাচন দেখাব।

প্রস্তাবটি নিতান্ত লোভনীয়, কিন্তু সেদিনই শ্রমিক ফেডারেশনের পোলকের সঙ্গে বেলা ১২-১৫ মিনিটে মধ্যাহ্ন ভোজন ঠিক করিয়াছি। সকাল সাড়ে দশটায় সুপ্রীম কোর্ট।

বলিলাম—দুপুর বেলা কখন?

—একটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে এলেই হবে। এখান থেকে কিছু দূরে আরলিংটন সহরে আপনাকে নিয়ে যাব।

হিসাব করিয়া দেখিলাম সুপ্রীম কোর্টে এক ঘণ্টা থাকিয়া যদি বাহির হই এবং পোলকের কাছে ১২টায় যাই তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এদের আফিসে হাজির হইতে পারিব। রাজি হইয়া বাহির হইলাম।

সেদিন মঙ্গলবার। সকাল ১০॥ টায় সুপ্রীম কোর্ট। প্রকাণ্ড বাড়ী। মাথায় লেখা Equal Justice Under Law—আইনের অধীনে সমান বিচার। আমাদের লাটভবনের মত অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হয়। প্রথমেই প্রায় ৫০ ফুট চওড়া এবং ২০০ ফুট লম্বা এক প্রকাণ্ড হল। হলের দুই প্রান্তে দুই সার্জ্জেণ্ট দণ্ডায়মান, আর একটিও লোক নাই। ভাবিলাম—তবে কি আজ ছুটি? ভয়ে ভয়ে প্রথম সার্জ্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল—না, হলের ঐ প্রান্তে আদালত কক্ষ, ঐ সার্জ্জেণ্ট আপনাকে নিয়া বসাইয়া দিবে।

অপর প্রান্তের সার্জ্জেণ্ট আর একজনকে সোপর্দ্দ করিয়া দিল। সে নিয়া আদালত কক্ষে বসাইল। একটি মাত্র আদালত কক্ষ। নয় জন বিচারক সমাসীন। মাঝখানে প্রধান বিচারপতি, দুপাশে চারজন করিয়া বিচারক। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মাইক। তাঁদের সামনে এটর্ণীর দাঁড়াইবার

স্থান। তাঁর সামনেও একটি মাইক। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রত্যেকের কথা শোনা যায়।

একজন এটর্ণী কথা বলিতেছিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হইল। প্রধান বিচারপতি অপরপক্ষের এটর্ণীকে ডাকিলেন—ইয়েস, মিঃ অমুক।

তিনি আদালতকে সম্বোধন করিলেন—মিঃ চীফ জাষ্টিস্ এণ্ড আদার জাজেস। কোথায় 'মে ইট প্লীজ ইয়োর লর্ডশিপ', কোথায় বা 'ইয়োর অনার'! আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টে এখনও লর্ডশিপের ছড়াছড়ি। কথা বলিতে উঠিলেই ইয়েস মি লর্ড, নো মি লর্ড, আই মি লর্ড, সে মি লর্ড, দিস মি লর্ড ইত্যাদি। এখানে প্রধান বিচারপতি এটর্ণীকে প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিতেছেন—ইয়েস মিঃ চীফ জাষ্টিস ওয়ারেন। অপর কোন বিচারক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছেন—নো, মিঃ জাষ্টিস ডগলাস। অনেক সময় শুধু ইয়েস বা শুধু নো।

বুঝিলাম, এরা গণতন্ত্র মানে আর আমরা স্বাধীনতার পাইয়া গণতন্ত্র স্থাপনের চৌদ্দ বৎসর পরেও বিলাতী মেকি লর্ড সাজিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেছি। কাল যে ব্যারিষ্টার বা এডভোকেট ছিলেন কমরেড বা বন্ধু, আজ বেঞ্চে চড়িয়াই তিনি হইয়া যান লর্ড।

সুপ্রীম কোর্টেও উকীলের কোন পোষাক বা গাউন নাই। আর আমরা এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশে বিলাতী হাই কলার, কোট প্যাণ্ট এবং গাউনের বোঝা বহিয়া মরিতেছি। গণতন্ত্রের বুলি ফুটিতে দেরী হয় না, কিন্তু গণতন্ত্র মস্তিষ্কে ঢুকিতে রীতিমত সময় লাগে।

ঠিক বারোটায় পোলকের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপদের কথা বলিলাম—মাত্র ৫০ মিনিট সময় আছে। তৎক্ষণাৎ দুজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই ভাল রেস্তোঁরা। আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি এবং শ্রমিক নীতি নিয়া অনেক আলোচনা হইল। কোথায় ৫০ মিনিট? রেস্তোঁরা হইতে যখন বাহির হইলাম তখন ১টা বাজিয়া দশ মিনিট। লীগের অফিস সেখান হইতে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। পোলক সে পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেলেন। অতি অমায়িক এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই পোলক। বিদায় গ্রহণের সময় বলিলেন—আবার কলিকাতায় দেখা হইবে।

লীগের অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখি মহিলারা অপেক্ষা করিতেছেন।

লীগের আরলিংটন শাখার সভানেত্রী মিসেস নউম্যান নিজেই আসিয়াছেন আমাকে নিতে। ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর দেরী নয়, চলুন।

অফিস হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই পাশের একটি বড় বাড়ীতে ঢুকিলেন। সেটা মনুষ্যবাসের বাড়ী নয়, গাড়ী রাখার আট কি দশতলা বাড়ী। লিফটে গাড়ী নামিল এক বিশাল ক্যাডিলাক। মহিলাটি পাতলা ছিপছিপে। গাড়ী এবং মহিলার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি ড্রাইভার কোথায়—ততক্ষণে মহিলা স্টিয়ারিং ধরিয়াছেন এবং দরজা খুলিয়া দিয়া বলিতেছেন, কই আসুন।

গাড়ী চলিল। ভয়ই করিতেছিল প্রথমটা, কিন্তু মহিলার দক্ষতা দেখিয়া কয়েক মিনিটেই ভয় কাটিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়েমানুষ গাড়ী চালাচ্ছে, ভয় করছে না তো?

—প্রথমটা একটু করছিল, এখন কেটে গেছে। আপনাদের এখানে তো দেখছি মেয়েরা গাড়ী কেন, ট্রামগাড়ী, ট্যাক্সি পর্য্যন্ত চালাচ্ছে।

—ট্যাক্সি চালাবার সাহস অবশ্য আমার নেই, তবে নিজেদের গাড়ী আজকাল বাড়ীর মেয়েরা না চালালে উপায় নেই। আমাকে দুবার করে চার বার গাড়ী নিয়ে বেরোতে হয়। সকাল নয়টায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসি। তার পর আবার দশটায় আমার স্বামীকে অফিসে পৌঁছাতে যাই। স্কুলে এবং অফিসে কোথাও গাড়ী রাখার জায়গা নাই। কাজেই পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়ী বাড়ীতে নিয়ে আসতে হয়। বিকালে আবার তাদের আনতে যাই। বাড়ীতে আজকাল কেউ ঝি চাকর রাখতে পারে না। রান্না, বাসন ধোয়া সমস্ত কাজ নিজেদের করতে হয়। তার উপর গিন্নীদের আর এক কাজ বেড়েছে—ড্রাইভারগিরি।

আরলিংটন পৌঁছাইলাম। পোলিং বুথে জনা বারো বিদেশী উপস্থিত। তুরস্ক, ইরাণ, যুগোস্লাভিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি অনেক দেশের লোক। একজন ভারতীয়—হায়দরাবাদের অধিবাসী। এঁরা সবাই এখানকার সরকারের অতিথি, একমাত্র আমি বেসরকারী অতিথি, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। পোলিং বুথ দেখা হইল। আজকাল আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে ভোট নেওয়া হয়। ইহাতে ভুল ভোট, জাল ভোট প্রভৃতি হইতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনাও হইয়া যায়। ভোট গ্রহণ শেষ হইবার

দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফল ঘোষণা করা যায়। বোষ্টনে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলাম, সুতরাং এখানে এটা আমার কাছে নূতন নয়।

হায়দরাবাদের ভদ্রলোকটি আমাকে তাঁদের সঙ্গে বাসে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। বাসের চেহারা দেখিয়া ভক্তি চটিয়া গেল। এ দেশের বাস অতি সুন্দর, অথচ ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট এদের পাঠাইয়াছে ছোট এবং রাঁচীর মানসিক হাসপাতালের চেহারার বাসে। মিসেস নউম্যান বোধ হয় আমার মুখ দেখিয়াই মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—না, না, মিঃ বর্ম্মণের জন্য আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ওঁকে ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেব।

বিকাল ৪টায় ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম। কোন মতে মালপত্র নিয়া ছুট দিলাম বাস ষ্টেশনে। উইলিয়ামসবার্গ প্রায় দুশো মাইলের পথ। বাসে যাইতে হইবে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বুঝিয়াছিলাম এই বাস জেট বোয়িং ৭০৭-এর ভায়রাভাই। ওতে দুশো-কেন, দু হাজার মাইল গেলেও কষ্ট নাই।

স্বাধীন দেশের মেয়েরা নিজ দেশের রাজনৈতিক জীবনে শুধু নয়, সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, রাজনীতিকে সুস্থ পথে পরিচালিত করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আপন করিতে পারেন তাহার প্রমাণ আমেরিকার লীগ অফ উইমেন ভোটার।

লীগের অফিসে তিনটি মহিলার সহিত আলাপ হইয়াছিল—মিসেস গুইওল, মিসেস সিমরেল এবং মিসেস নওম্যান। লীগের উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপদ্ধতি যাহাতে বুঝিতে পারি তার জন্য মিসেস সিমরেল কয়েকটি পুস্তিকা দিয়াছিলেন। এঁদের সমস্ত পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতি মেয়েরা নিজেরা লেখেন। লীগের অফিসে কর্ত্রীপদে কোন নবীনা দেখি নাই, সবাই দেখিয়াছিলাম প্রবীণা। লীগের প্রধান পুস্তিকার নাম Hard Choices; একটি ৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় আমেরিকার ন্যায় দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, এবং বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলির উপর তার প্রভাব এত সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ করিয়া লেখা যায় ইহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। পুস্তিকাটির প্রধান বিশেষত্ব—নিজের দেশের সব ভাল আর অন্য দেশের সব খারাপ এই মনোভাব উহার কোথাও নাই। ওয়াশিংটন হইতে সানফ্রান্সিস্কো পর্য্যন্ত সারাটা দেশে অনেকের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিয়াছি লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর অগাধ বিশ্বাস। পুস্তিকাগুলি পড়িয়া বুঝিলাম বিশ্বাস অমূলক নয়। আমেরিকান গণতন্ত্রে সম্প্রতি একটি বিশেষ নূতন

ধারা প্রচলিত হইতেছে—রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমশঃ পার্টি নেতাদের হাত হইতে সাধারণ লোকের হাতে সরিয়া আসিতেছে। কংগ্রেস অর্থাৎ আমেরিকান পার্লামেণ্টে ভোটাভুটি আজকাল আর ঠিক পার্টি লাইনে হইতেছে না। আমেরিকান জনমতের উপর শিক্ষিত সমাজের প্রভাবের কথা আগে বলিয়াছি। শিক্ষিত লোকেরা লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন ইহাও দেখিয়াছি। অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি লীগ পার্টি স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠিতে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমগ্র জাতির স্বার্থের দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারিতেছে; সুতরাং সুস্থ নিরপেক্ষ মতের জন্য সকলেই লীগের দিকে ঝুঁকিতেছে। বিশিষ্ট সংবাদপত্র সম্পাদকেরা লীগের প্রচারকার্য্যে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন।

Hard Choices পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু হইতেছে স্বদেশে এবং বিদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তব রূপ। লীগ প্রথম কথাই বলিতেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের পাবলিক পলিসির এক নম্বর কথাই হইতেছে বিশ্বের উন্নতি। উন্নত এবং উন্নতিশীল উভয়বিধ দেশ সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য।

লীগ বলিতেছেন যে, দুইটি বিপ্লব বর্ত্তমান দশকে গতি নির্দ্দেশ করিবে —টেকনোলজিকাল বিপ্লব এবং সমাজ বিপ্লব। টেকনোলজিকাল বিপ্লবের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সমাজ বিপ্লব পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের মানুষকে শিখাইয়াছে যে, টেকনোলজিকাল বিপ্লবের ফল প্রত্যেক দেশকে নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। নির্ব্বিচারে অপরের নকল করিলে চলিবে না।

অনুন্নত দেশগুলি বিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজে ঢুকিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে; টেকনোলজিকাল বিপ্লবের দৃষ্টিতেই তাহারা বিশ্বকে দেখিতেছে। লীগ বলিতেছেন যে, অনগ্রসর দেশসমূহের এই চেষ্টায় আমেরিকার স্বার্থ আছে এবং আমেরিকা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াছে বলিয়াই অনুন্নত দেশসমূহকে অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহায্য দিতেছে এবং বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

এই সঙ্গে লীগ আমেরিকান সরকারী পলিসির একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ

ত্রুটি নির্দ্দেশ এবং কংগ্রেসম্যানদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাদের বক্তব্য সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। উহা এই: হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইল যে, আমেরিকা পেরুকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবে। এই সংবাদটি যেদিন প্রকাশিত হইল সেই দিনেরই সংবাদপত্রের শেষের পৃষ্ঠায় সংবাদ ছিল যে, পেরু হইতে আমেরিকায় আমদানী সীসা ও দস্তার উপর শুল্ক ২০০ হইতে ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব কংগ্রেসে আলোচিত হইতেছে। পেরুর জাতীয় আয়ের প্রধান অবলম্বন হইতেছে সীসা এবং দস্তা রপ্তানী এবং আমেরিকা তার সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা। এর আগে আমেরিকা এই রপ্তানী অনেক কমাইয়াছে, এখন শুল্কবৃদ্ধির দ্বারা উহা আরও কমাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ফলে আমেরিকান কংগ্রেস এক হাতে পেরুর গলা কাটিতেছে, অপর হাতে তাহাকে সাহায্য দিতেছে।

ইহার পর লীগ মন্তব্য করিতেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য বিল উত্থাপন কালে কংগ্রেসম্যানরা 'হাঁ' বলিতেছেন এবং উহা আলোচনান্তে পাশ হইবার সময় বলিতেছেন 'না'—এই দৃশ্য কংগ্রেসে প্রায়ই দেখা যায়। পার্লামেণ্টের সদস্যদের কাজের এরূপ তথ্যপূর্ণ সংযত অথচ তীব্র কঠোর সমালোচনা আর কোন দেশে কোন নিরপেক্ষ সংগঠন এত নিয়মিত ভাবে করে কি না জানি না।

লীগ বলিতেছেন যে, অনেকের ধারণা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতির যেন কোন সংঘাত আছে। তাঁহাদের মতে এরূপ কোন সংঘাত তো নাই-ই বরং উভয় উন্নতি মূলতঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ (are fundamentally in harmony)। এই প্রসঙ্গে একটি মোক্ষম কথা তাঁহারা বলিতেছেন যে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি না হইলে একা আমেরিকার পক্ষে তার নিজের অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা অসম্ভব। লীগের এই বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে ভাল রূপে প্রচারিত হইলে উভয় দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে যে একটা মুরুব্বীয়ানা এবং অনুগৃহীতের মনোভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইত। লীগ বলিতেছেন—কিছু সংঘাত আছে কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক এবং স্বল্পকাল স্থায়ী। তাঁহাদের মতে এরূপ সংঘাতের তালিকা তৈরি করার পরিশ্রম পোষাইবে না, কারণ তৈরি শেষ হইতে না হইতেই

হয়ত দেখা যাইবে সে সমস্ত সংঘাত দুর হইয়া গিয়াছে, নূতন সংঘাত আসিয়াছে। অস্থায়ী সংঘাত সব সময়েই থাকিবে কিন্তু মূল লক্ষ্য সকলেরই এক। অর্থনৈতিক উত্থান পতনও থাকিবেই কিন্তু মূল আদর্শ সকলেরই অভিন্ন।

আমেরিকার অর্থ নৈতিক আদর্শ তিন পক্ষ আলাদা ভাবে স্থির করিয়াছেন এবং তিনজনে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমগ্র দেশের পক্ষে উহার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কংগ্রেসের যুক্ত অর্থ নৈতিক কমিটি, মালিকের পক্ষে করিয়াছেন ন্যাশনাল এসোসিয়েসন অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং শ্রমিকের পক্ষে করিয়াছেন আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার (AFL-CIO)। অর্থাৎ দেশের অর্থ নৈতিক আদর্শ কি হওয়া উচিত গবর্ণমেণ্ট, মালিক ও শ্রমিক তিন পক্ষ আলাদা ভাবে তাহা বিচার করিয়াছেন কিন্তু তিন জনে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই মিলিত সিদ্ধান্ত দেশে প্রচারের দায়িত্ব নিয়াছেন নারী সংগঠন, লীগ অফ উইমেন ভোটার। পার্টি, মালিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে দেশেকে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা এখনও খুব কম করিয়াও পাক্কা অর্দ্ধ শতাব্দী পিছনে রহিয়াছি।

অর্থ নৈতিক আদর্শত্রয় এই :

(১) কর্ম্মসংস্থানের উচ্চ এবং নিশ্চিত হার; অর্থাৎ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক লোক কাজ পাইবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকিবে এবং কথায় কথায় কেহ কর্ম্মচ্যুত হইবে না। কাজের স্থায়িত্ব এবং কর্ম্মপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বজায় থাকিবে।

(২) দ্রব্যমূল্যের সাধারণ মান নিশ্চিত এবং স্থির থাকিবে। মূল্য মানের আকস্মিক হ্রাস বৃদ্ধি অথবা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে তার উর্দ্ধগতি হইতে পারিবে না।

(৩) অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উচ্চ হার।

লীগ বলিতেছেন এই তিনটি লক্ষ্যের সঙ্গে দেশের বৈদেশিক নীতির সম্পর্ক রহিয়াছে।

আমেরিকান রেডক্রেশ

সপ্তাহখানেক আমেরিকায় থাকিয়াই এদের চালচলন এবং সামাজিক ব্যবহারের উন্নতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় কলিকাতায় বহু আমেরিকান ছাত্র দেখিয়াছি। তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই ছিল ঔদ্ধত্য এবং অসভ্যতা। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহাদের এত উন্নতি কিরূপে হইল এবং ১৫ বৎসরে আমরা এত নীচে নামিয়া গেলাম কেন? এই কথাটি মনে রাখিয়া বহু গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্ন করিয়াছি এবং সবচেয়ে বিশদ উত্তর পাইয়াছি আমেরিকান ঐতিহাসিক এসোসিয়েসনে। এরা স্কুল হইতে জাতটাকে গড়িয়া তুলিতে সুরু করিয়াছে এবং স্কুল শিক্ষকদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য দেশের সর্ব্বোচ্চ গবেষক ও অধ্যাপকদের নিযুক্ত করিয়াছে। দুনিয়া মানেই ইউরোপ আমেরিকা নয়, তার বাহিরে এশিয়া এবং আফ্রিকা নামক দুইটি বিরাট মহাদেশ রহিয়াছে। এই দুই মহাদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় ইতিহাস যাহাতে স্কুল হইতে শিখাইয়া আনা যায় এবং সঠিক তথ্য ও পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার জন্য জাতীয় নেতাদের অসীম আগ্রহ। এখানে নেতা বলিলেই রাজনৈতিক নেতা বোঝায় না, বোঝায় ইনটেলেকচুয়াল নেতা। কয়েক বৎসর আগে আমরা একটি স্কুলপাঠ্য ভারতীয় ইতিহাসের বই সমালোচনায় দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, উহার লেখক মিত্র ইনষ্টিটিউসনের জনৈক প্রবীণ শিক্ষক লিখিয়াছেন—অশোক চন্দ্রগুপ্তের ছেলে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের পরীক্ষকও ছিলেন। এই বইয়ের নবম সংস্করণ আমাদের হাতে আসে। আমাদের দেশে প্রচলিত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস ভূগোলের বইয়ে এরূপ ভুল ভূরি ভূরি আছে। সানফ্রান্সিস্কোতে দেখিয়াছিলাম কয়েকটি স্কুলপাঠ্য বইয়ে সামান্য ভুল ধরা পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট তিনজন খ্যাতনামা অধ্যাপককে সমস্ত বই পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার শিক্ষাও অপরিহার্য্য, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। স্বাধীনতার আগেও আমাদের দেশে এটি ছিল। স্কুল কলেজে

ডিসিপ্লিন নামক একটি বস্তু ছিল। গত ১৫ বৎসরে আমাদের দেশে এটিও সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ স্কুলের শিক্ষার এই দিকটির প্রতিও আমেরিকা কি ভাবে ঝুঁকিয়াছে তার পরিচয় পাইলাম তাহাদের রেডক্রস অফিসে।

ওয়াশিংটনে রেডক্রস অফিসে দেখা করিতে গেলাম। আমেরিকান ন্যাশনাল রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট রামন ঈটন অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাদের কাজের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যে, স্কুল হইতে স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া আরম্ভ হয়।

যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহা ঈটন নিজেই আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। ছেলেমেয়েদের ছোট বেলা হইতে কোন্ কোন্ কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং কি ভাবে ট্রেণিং দেওয়া হয় তাহা জানিতে চাহিলাম।

ঈটন বলিলেন—এ বিষয়ে তাঁদের একটি ফিল্ম আছে, উহাতে সমস্ত জিনিষটি দেখানো হইয়াছে, ফিল্মটি দেখিতে আধ ঘণ্টার মত সময় লাগিবে। তা ছাড়া স্বেচ্ছাসেবক অফিসের ডিরেক্টর মিসেস মিলস আমাকে সমস্ত তথ্য দিতে পারিবেন।

ঘণ্টা দুয়েকের মত সময় আমার হাতে ছিল। সেদিন রেডক্রশের বিভাগীয় ডিরেক্টরদের একটি সভা ছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন :

ডাঃ রবার্ট গর্ডন—ন্যাশনাল ডিরেক্টর,

মিঃ লিভিংষ্টন ব্লেয়ার—ডেপুটি ডিরেক্টর,

মিঃ যোসেফ গ্রেহাম—ডেপুটি ডিরেক্টর,

মিঃ টমাস ডেভাইন—এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর,

মিস ডোরোথ টাফ—এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর,

মিঃ টেরী টাউনসেণ্ড—ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম ডেভেলাপমেণ্ট

মিস গ্লাডিস টিবট—প্রজেক্ট ডিরেক্টর,

আন্তর্জ্জাতিক ষ্টাডি ভিজিট প্রোগ্রাম,

মিঃ মরিস ফ্লাগ—সম্পাদক, আমেরিকান রেড ক্রস জার্ণাল।

প্রথমে মোটামুটি অফিসটি দেখানো হইল। একটি জায়গায় দেখিলাম বিহার বন্যায় সাহায্য নিয়া আলোচনা হইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ব্যাপার ?

শুনিলাম বিহারে প্রচণ্ড বন্যা হইয়াছে। সে সংবাদ তখনও পাই নাই। এঁরা সাহায্যের কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে।

ইতিমধ্যে একজন আসিয়া সংবাদ দিল—ফিল্‌ম প্রদর্শনের আয়োজন হইয়াছে।

গেলাম। স্তব্ধ বিস্ময়ে ফিল্‌মটা দেখিলাম। বাচ্চা বাচ্চা সব ছেলেমেয়েকে হাসপাতালে নিয়া গিয়াছে। তাহারা রোগীদের কাছে গিয়া একটি ফুল কি একটি ফল দিতেছে, হাসিয়া কথা বলিতেছে। হাসপাতালের দুঃখ এবং যন্ত্রণাপূর্ণ পরিবেশে ইহাতে যেন স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে। আর একটু বড় হইয়া আর একটু কঠিন সমাজসেবা, আর্ত্তের সেবার কাজ করিতেছে। আমাদের দেশের শিশুরা কবিতা মুখস্থ করে—

জীবে দয়া করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

আর ও-দেশের শিশুরা কবিতাটির খবরও জানে না, কিন্তু কবিতাটিকে তাহারা প্রাণবন্ত করিয়া তোলে।

এইবার আসিলাম সভায়। তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হইয়াছে। আমাকে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরিলেন—এই কয় দিনে আমাদের দেশে আপনার কোন্ জিনিষটি ভাল লাগিল বলুন। তার আগে এক একজন ভারত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। সবগুলির জবাব দিলাম। আমেরিকানরা এখন আর ভারতবর্ষকে সাপ আর মহারাজার দেশ ভাবে না, অনেকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশী খবর ও জ্ঞান রাখে অবশেষে আমেরিকা সম্বন্ধে আমার ধারণা বলিলাম—

আমার একটা থিওরী আছে—প্রত্যেক দেশে তিন রকমের লোক থাকে; একদল খুব ভাল, একদল অতিশয় বদমায়েস এবং একদল গোবেচারী, যে দল প্রবল হয় সেই দলে চলে। মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রথম দলে শতকরা ২৫, দ্বিতীয় দলে শতকরা ২৫ এবং তৃতীয় দলে বাকি ৫০কে ফেলা যায়। প্রথম বা দ্বিতীয় কোন্ দল প্রবল হইয়াছে তার উপর সমগ্র সমাজ বা দেশের চরিত্র ও পরিচিতি নির্ভর করে। প্রথম বা দ্বিতীয় যে দল নেতৃত্ব হাতে তুলিয়া নেয়—assert করে—গোবেচারী ৫০ ভাগ তাহাকেই অনুসরণ করে। বদমায়েস ২৫ assert করিলে সমাজ খারাপ হয়, ভাল ২৫ উহা করিলে সমাজ উন্নত হয়। বদমায়েস ২৫ নেতৃত্ব হাতে নিয়া নিলে দেশের ভালো লোকেরা অবহেলিত এবং অপমানিত হয়; সমাজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়। আপনাদের

দেশে দেখিতেছি—ভাল ২৫ প্রাণপণে assert করিতেছে এবং নেতৃত্ব প্রায় হাতে নিয়া নিয়াছে। মাঝের ৫০ ঐ দিকে চলিতেছে। ফলে বদমায়েস ২৫ কোণঠাসা হইয়া আসিতেছে। সমাজ বিজ্ঞানের ডাইনামিজ্‌ম্ বা প্রগতিশীলতার এই মূলসূত্র আমাদের দেশে প্রাচীনকালে খুব ভাল ভাবে প্রচলিত ছিল। এই কারণেই আমাদের প্রাচীন ইনটেলেকচুয়াল নেতারা সমাজ ও রাজনীতিকে একেবারে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার ভার দিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ লোকদের হাতে। থানা, পুলিশ, জেল ছাড়াই আমাদের দেশে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিভার বিকাশ অবাধ হইয়াছে। আমাদের দেশের এই প্রাচীন ধারা আপনাদের দেশে কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার থিওরী ভুল নয়।

বিদায় গ্রহণের সময় আসিল। মিসেস মিলস কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন। তখনও ফেরেন নাই। তাঁর সঙ্গে দেখা হইল না।

পরদিন ডেভিস হাউসের ঠিকানায় একটি চিঠি আসিল—

১লা নবেম্বর ১৯৬১

প্রিয় মিঃ বর্ম্মণ,

নিশ্চয়ই আমি মনে করি কাল আপনি যে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট একটি সুস্পষ্ট সুযোগ এবং একটি প্রকৃত সম্মানের বিষয়। [Indeed I feel it was a distinct privilege and a real honour to have you visit us yesterday] আপনার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ভিজিটার আমরা কদাচ পাইয়াছি। [Seldom have we had a visitor as stimulating and as well informed as you proved yourself to be-]

আমাদের দুঃখ এই যে, আপনি আরও বেশী সময় আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারিলেন না। আমাদের ষ্টাফের অন্যান্য লোকেরাও আপনার সহিত পরিচিত হইলে আনন্দিত হইতেন। আমাদের সেচ্ছাসেবক অফিসের ডিরেক্টর মিসেস এবট মিলসের সহিত সাক্ষাতে একটি সভা প্রতিবন্ধক হইয়াছে ইহাতে আমরা বিশেষ দুঃখিত। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের সেবাকার্য্য দেখিয়া আপনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তিনি নিজে শুনিলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন।

আমাদের রেড ক্রসের প্রোগ্রাম এবং কাজ যাহাতে আপনি আরও বেশী জানিতে পারেন তার জন্য কতকগুলি পুস্তিকা আমরা ডাকে ভারতে আপনার মধ্যমগ্রামের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

আমি আশা করি আমেরিকায় আপনার অবস্থিতি সর্ব্ববিষয়ে আনন্দজনক হইবে।

ইতি
রামোন এস. ঈটন
ভাইস প্রেসিডেণ্ট

ঐতিহাসিক এসোসিয়েসন

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যখন ছিলাম তখন দেখিয়াছি আমাদের দেশের গবেষণার ফল অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উহা সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কালক্রমে উহার কিছুটা পাঠ্য পুস্তকে যায় এইমাত্র। বোষ্টন এবং নিউ ইয়র্কে কয়েকদিন কাটাইয়াই অনুভব করিয়াছিলাম যে, আমেরিকান জনসাধারণের নিকট আধুনিক জগতের সর্ব্বাধুনিক জ্ঞান ও তথ্য পৌছাইয়া দিবার জন্য বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান তৈরি হইয়াছে। গণতন্ত্রের বনিয়াদ হইতেছে well informed citizen অর্থাৎ চোখকান খোলা জ্ঞানসম্পন্ন লোক—ইহা আমেরিকানরা উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে তাহারা প্রাণপণ যত্ন করিতেছে। রাশিয়ার ষ্টালিন আমল পর্য্যন্ত সরকার প্রদত্ত জ্ঞান ও তথ্যের বাহিরে আর বেশী কিছু দাবী করাও নিষিদ্ধ ছিল। ইহা অস্বাভাবিক নিয়ম এবং রাশিয়ার আধুনিক তরুণ সমাজ এই অন্যায় নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ক্রুশ্চেভ এই দাবী মানিয়া নিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে স্বাধীন জ্ঞান অর্জ্জনের পথের বহু বাধা রাশিয়ায় দূর হইয়া যাইতেছে। আমেরিকাই এখন স্বীকার করিতেছে যে, রাশিয়ায় শিক্ষকের বেতন ও মর্য্যাদা উভয়ই আমেরিকার চেয়ে বেশী হইয়া গিয়াছে। তবে বিশ্বের যে কোন দেশ, যে কোন অর্থনীতি, যে কোন রাজনীতি, যে কোন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রাশিয়ায় এখনও আসে নাই, আমেরিকা উহা সর্ব্বসাধারণকে দিয়াছে। জ্ঞান বিতরণের এই কাজে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট এবং বড় বড় ফাউণ্ডেশনেরা মুক্ত হস্তে সাহায্য দান করিতেছে।

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক কিন্তু ১৫ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন এবং বিতরণের কাজ এখনও আমাদের দেশে আরম্ভই হয় নাই একথা জোর করিয়া বলা যায়। গোটাকয়েক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরকারী টাকায় স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু সরকারের কতকগুলি পোষা লোকের হাতে উহাদের কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হওয়ায় কোন প্রতিষ্ঠানই বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না।

গবেষণার ফল আমেরিকায় কিরূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা হইতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড সোসাইটিজের প্রেসিডেন্ট ডাঃ বুর্কহার্ড বলিয়াছিলেন যে, স্কুল কলেজের ভিতর দিয়া উহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। কথাটার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম ওয়াশিংটনে আমেরিকান ঐতিহাসিক এ্যাসাসিয়েসনের একজিকিউটিভ সেক্রেটারী এবং আমেরিকান ঐতিহাসিক রিভিউ-এর সম্পাদক ডাঃ বয়েড শেফারের সঙ্গে আলোচনায়।

আমেরিকান ঐতিহাসিক এসোসিয়েসন একটি জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছে যাহা আমার নিকট অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। তাহা Service Center for Teachers of History অর্থাৎ স্কুলের ইতিহাস শিক্ষকদের জন্য সার্ভিস সেণ্টার। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অতি আধুনিক ইতিহাস আমেরিকার স্কুলে পড়ানো হয়। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বুঝিবার জন্য অতীতের যতটুকু জ্ঞান আবশ্যক সেইটুকুর উপর এরা ঝোঁক দেয়। আমাদের মত শুধু "অতীতে এই ছিল, তাই ছিল" বলিয়া জাবর কাটিয়া ইতিহাস চর্চ্চা শেষ করে না। তাহারা মনে করে অতীত হইতেছে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জ্জনের গবাক্ষ, কিন্তু ঐ গবাক্ষই সর্ব্বস্ব নয়। স্কুল শিক্ষক ক্লাসে ইতিহাস পড়াইতে গিয়া যে সমস্ত অসুবিধা বোধ করেন তাহা এই সার্ভিস সেণ্টারকে জানান এবং সেণ্টার উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহায্যে তাহার সমাধান করিয়া দেন। মাঝে মাঝে শিক্ষকেরা একত্র মিলিত হন এবং পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান আরও বাড়িয়া যায়, অনেক অসুবিধা আরও সহজে বোধগম্য হয় এবং তাহা দূর করিবার পথ খুলিয়া যায়। আমাদের দেশেও ঐতিহাসিক এসোসিয়েসন আছে। অতীতের পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া জাবর কাটাই তাঁহাদের রেওয়াজ। গবর্ণমেন্ট মিথ্যা ইতিহাস চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বাধা দানের সাহস আমাদের ঐতিহাসিক এসোসিয়েসনের নাই। আর স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক? তাঁহাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির ঐরূপ কোন চেষ্টা হইলে কায়েমী স্বার্থের গোড়ায় আঘাত পড়িবে এবং রাইটার্স বিলডিং অভিমুখে বিক্ষোভযাত্রা ধাবিত হইবে।

সার্ভিস সেণ্টার হইতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ভারতের ইতিহাস এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ সম্পর্কে পুস্তিকা দুটি দেখিলে লজ্জায় আমাদের অধোবদন হইতে হয়। ভারতের ইতিহাস চর্চ্চা কি অসীম

শ্রদ্ধার সঙ্গে উহারা করিতেছে, আবার সেই সঙ্গে আমাদের ইতিহাস রচনায় আমাদের ত্রুটিগুলিও কি নির্মম কঠোরতার সহিত্ তাহারা দেখাইয়া দিতেছে ।

ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তিকাটি লিখিয়াছেন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ক্রেণ। তিনি বলিতেছেন যে, ভারতের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান রহিয়াছে আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে এবং জেলা গেজেটিয়ারে। জেলা গেজেটিয়ারগুলিকে অধ্যাপক ক্রেণ ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানের সোনার খনি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন— গেজেটিয়ারগুলি ভারতীয় ইতিহাস রচয়িতারা খুব সামান্যই ব্যবহার করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্রেণের অভিযোগ মর্ম্মান্তিক সত্য। তিনি জানেন না কিন্তু আমরা জানি আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ আগলাইয়া রহিয়াছেন কেন্দ্রীয় পুলিশ মন্ত্রী। আর্কাইভসে প্রবেশ যে কোন গবেষকের পক্ষে কি অসুবিধা এবং অসম্মানজনক তাহা নিজেই দেখিয়াছি। গেজেটিয়ারগুলি বগলদাবা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী এবং সুবিধাবাদী হুমায়ুন কবীর। ১৯৫৫ সালে স্থির করা হইয়াছিল ৩৫৫ খানা গেজেটিয়ারের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। সাত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে ২০ খানা।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান রূপে ছোট ছোট এক একটি বিষয় নিয়া মনোগ্রাফ তৈরি অপরিহার্য্য রূপে প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশ ইহা করিয়া থাকে এবং এইরূপ মনোগ্রাফ ভিন্ন সামান্যীকরণ (generalisation) ভুল হয়, ইহা জানা কথা এবং ভারতীয় ইতিহাসের এই ত্রুটি অধ্যাপক ক্রেণ পরিষ্কার ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী এই কাজে অনায়াসে হাত দিতে পারিত কিন্তু দেয় নাই। ভারতের ইতিহাসে ফিউডালিজ্‌ম-এর উল্লেখ ভূরি ভূরি আছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি উহা ভুল। ইউরোপীয় অর্থে ফিউডালিজ্‌ম বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে তাহা ছিল না। অধ্যাপক ক্রেণ ঠিক এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন।

মাত্র ৪৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ভারত ও ভারতের ইতিহাসে অনেক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। বিশেষভাবে লিখিত এই বইয়ের সাহায্যে আমেরিকার স্কুল শিক্ষক আমেরিকার স্কুলের ছাত্রদের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান দান করিতেছেন।

পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রকে এরা ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান উপাদান মনে

করে। আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় ঐ ছুটি বস্তু অতিশয় মূল্যবান। আমাদের দেশে বাঁধানো মোটা বই সংরক্ষিত হয় কিন্তু পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্র আনুপূর্ব্বিক সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। শেফারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এগুলি তো আপনাদের দেশে অল্পদিনেই পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া জমিয়া ওঠে, রাখা হয় কিভাবে?

শেফার বলিলেন—আজকাল ঐগুলির মাইক্রোফিল্‌ম তুলিয়া নিয়া সেই ফিল্‌মগুলি যত্নের সহিত রাখা হয়। ইহাতে একটি বিশালাকৃতি সংবাদপত্রের ফাইল ছোট্ট এক খোপে ঢুকিয়া যায়। প্রয়োজনের সময় উহা বাহির করিয়া রীডারে চড়াইয়া পড়িলেই হইল।

আরপরে বলিলেন—সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স দেখিতে যান। সেখানে গেলে সমস্ত বিষয়টা দেখিতে এবং বুঝিতে পারিবেন।

ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সের নামে নাচিয়া উঠিলাম। বলিলাম—কিন্তু সেখানে তো কেহ আমাকে চেনে না, আমার কোন প্রোগ্রামও সেখানে নাই। যাই কিরূপে?

তখুনি টেলিফোন তুলিয়া ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সের কর্ত্তার সঙ্গে কথা বলিলেন। নাম ঠিকানা দিয়া বলিলেন—সেখানে গিয়া এই মহিলাকে সংবাদ দিবেন, কোন অসুবিধা হইবে না।

শেফারকে বলিলাম—ওটার আগে আপনাকে ছুটি প্রশ্ন করিতে চাই। এই ছুটি প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরিতেছে, অনেককে জিজ্ঞাসাও করিয়াছি কিন্তু এখনও তার কোন জবাব পাই নাই। প্রথম প্রশ্ন—আপনাদের মুদ্রায় In God We Trust কথাটি কবে হইতে, কাহার আমলে এবং কি কারণে লেখা হইয়াছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—হোয়াইট হাউসে লক্ষ্য করিয়াছি আপনাদের পুরাণো শীলমোহরে ঈগলের মুখ বাম থাবার তীরের গুচ্ছের দিকে ফেরানো কিন্তু নূতন শীলমোহরে দেখিতেছি ঈগলের মুখ ডান থাবার ওলিভ গুচ্ছের দিকে ফেরানো হইয়াছে। আমেরিকা যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া শান্তির দিকে তাকাইতে চাহিতেছে এই পরিবর্ত্তনকে তাহারই ইঙ্গিত বলিয়া কি মনে করিতে পারি? এই পরিবর্ত্তন কবে এবং কোন প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশে হইয়াছে?

শেফার বলিলেন—প্রথমটির উত্তর দিতে পারিব না। তবে শেষেরটি জানি।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আমলে এই পরিবর্তন হইয়াছে। উহার যে ব্যাখ্যা আপনি দিতেছেন তাহা অবশ্য দিতে পারেন।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরের জন্য অফিসে তখন যে কয়জন গবেষক ছিলেন সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারাও কিছু বলিতে পারিলেন না।

উঠিলাম। শেফার আবার টেলিফোন তুলিয়া আর্কাইভকে বলিয়া দিলেন—মিঃ বর্ম্মণ রওনা হইতেছেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছিবেন।

তারপর নিজে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

ন্যাশনাল আর্কাইভস

আর্কাইভ্‌সে পৌঁছিলাম। মহিলা রিসেপসন ঘরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্গে নিয়া প্রথমেই ভূগর্ভস্থ এক ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন। পাতাল হইতে দেখা সুরু হইল। ফটোষ্টাট নিয়া মাইক্রোফিল্‌ম তৈরির জায়গা ভূগর্ভে। প্রকাণ্ড আকারের সংবাদপত্রগুলিকে মুহূর্তে ফিল্‌মে রূপান্তরিত করিতেছে। ক্যামেরার দাম আমাদের হাজার ত্রিশেক টাকার মত পড়ে। এক্স-রে ফিল্‌ম দেখার জন্য ডাক্তারদের যে রকম রীডার থাকে, সেইরূপ একটি রীডারে ফিল্‌ম চড়াইয়া অত্যন্ত স্পষ্ট পড়া যায়। কিছুদিন আগে দিল্লীতে আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে রীডারের সাহায্যে একটি ফিল্‌ম পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। উহাতে পড়া যায় না, চোখ ব্যথা হয়। এখানে রীডার ব্যবহার করিয়াছি। নিখুঁত পড়া যায়। দাম শুনিলাম হাজার তিনেক টাকা। ফিল্‌মের দামও খুব সস্তা। এই ব্যবস্থা আমাদের বৃহৎ লাইব্রেরীগুলিতে অনায়াসে করা যায়। মন্ত্রীদের অতিরিক্ত বিদ্যুতের আর নবাবীর বিল কাটিয়া দিলেই এই টাকা স্বচ্ছন্দে পাওয়া যায়। হুইট লোনের টাকা হইতেও বোধ হয় উহা চেষ্টা করিলে আনা যায়।

যে সব দুষ্প্রাপ্য বই বা দলিলের মূল কপি রাখা আবশ্যক তাহা মেরামতের পদ্ধতি দেখিলাম। দুটি স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের পাতের মাঝখানে ছেঁড়া কাগজটাকে ঠিক ভাবে সাজাইয়া এমন চমৎকার চাপিয়া দেওয়া হয় যে বিশ্বাস করা যায় না ছেঁড়া কাগজ জোড়া হইয়াছে। প্লাষ্টিক এত স্বচ্ছ যে পড়িতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। এক টুকরা ছাপানো কাগজ ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া মেকানিক ঐ পদ্ধতিতে জোড়া দিলেন এবং ওটি আমাকে দিয়া বলিলেন—এটা আপনার কাছে রাখতে পারেন। রাখিয়াছি।

বাড়ীটি অতিকায় তাহা বলাই বাহুল্য। এবার সুরু হইল উর্দ্ধপথে যাত্রা বহু তলা উপরে উঠিয়া সুরু হইল ফিল্‌মের ঘর। সম্পূর্ণ এয়ার কণ্ডিশন ঘর। শুনিলাম—একটা অসুবিধা এই যে ফিল্‌ম এয়ার কণ্ডিশন ঘরে ছাড়া রাখা নিরা-

পদ নয়, নহিলে অল্পদিনে নষ্ট হইয়া যায়। দিল্লীতে আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে পুরাণো দলিল এয়ার কণ্ডিশন ঘরে এখন রাখা হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের কার্য্য বিবরণীর বড় বাঁধানো খাতাগুলি আজকাল এয়ার কণ্ডিশন ঘরে রাখিতেছে বটে কিন্তু উহাদের কালির দাগ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। এগুলি শীঘ্র মাইক্রোফিল্‌ম না হইলে আর কয়েক বৎসর বাদে পড়াই অসম্ভব হইবে।

একটি ধারণা নিয়া আর্কাইভ্‌সের বাহিরে আসিলাম—ইতিহাসের উপাদানকে এরা নিজের প্রাণের মত প্রিয় মনে করিয়া যত্ন করে। আমাদের ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর একটি ঘটনা মনে আছে। সেথ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন রিডিং রুম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। দুষ্প্রাপ্য পুরাণো একটি পত্রিকার পাতা উলটাইতে পারিতেছি না, পাখা বন্ধ করিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন—পাতা ছিঁড়িয়া যাইতেছে? Let it go.

ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন

। ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসনে উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা করিলেন চার্লস সণ্ডার্স। প্রথমেই বলিলেন—আপনি নিশ্চয়ই বাড়ীটা একবার ঘুরিয়া দেখিতে চাহেন ?

—নিশ্চয়ই নয়। বাড়ীর সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। আপনাদের এখানে গবেষণা কার্য্য কিভাবে পরিচালিত হয় তাহাই আমি দেখিতে আসিয়াছি।

—সে কি কথা ? যারা এখানে আসে তারা তো আগেই বাড়ী দেখিতে চায়।

নিউইয়র্কে যে সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি তাহাদের সঙ্গে ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউটের কিছু পার্থক্য আছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য আমেরিকার কংগ্রেস সভ্য, জননেতা, অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতি এখানে আসেন এবং ঘরোয়া ভাবে সমস্যার সমাধান করিয়া নিয়া যান। আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতি তো আছেই, এক জায়গায় বসিয়া যে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের এরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশে কোথাও নাই। এদের বইগুলি অমূল্য সে খবর তো আগেই জানিতাম। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে আমেরিকান গবর্ণমেণ্টও এদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হয় ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৭ তারিখে। জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে নির্দ্দলীয় লোকের দ্বারা গবেষণা এবং পাবলিক সার্ভিসে উচ্চতর ট্রেনিং-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। রবার্ট সোমার্স ব্রুকিংস নামে একজন ব্যবসায়ী মধ্যবয়সেই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং জনশিল্প ও জনসেবায় নিজের জীবন ও সম্পদ নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে তাঁরই নেতৃত্বে তিনটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। সেই তিনটি একত্র করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল এবং উহার নাম দেওয়া হইল ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন। একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের হাতে উহার দায়িত্ব অর্পিত আছে কিন্তু প্রেসিডেণ্টই কার্য্যতঃ ইনষ্টিটিউসন পরিচালনা করেন।

ইনষ্টিটিউটের আছে চারিটি রিসার্চ ডিভিসন, একটি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনফারেন্স প্রোগ্রাম এবং একটি পাবলিকেসন ডিভিসন। গবেষণা বিভাগ চতুষ্টয় হইতেছে অর্থনীতি, গবর্ণমেন্ট পরিচালননীতি, বৈদেশিকনীতি এবং গবর্ণমেন্টের আর্থিক পলিসি। [Economic studies, Governmental studies, Foreign Policy studies, Government Finance studies]

পাবলিক কনফারেন্স প্রোগ্রামটি অদ্ভুত ঠেকিল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের আধুনিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। আমাদের দেশে উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী এবং মন্ত্রীদের সেমিনার হয়। সাধারণতঃ তাহা কাশ্মীর, উটকামণ্ড প্রভৃতি মনোরম স্থানে বসে এবং জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা আরাম উপভোগের দিকেই অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত বলিয়া ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টরেরা মনে করিলে তাহাকে সে সুযোগ এবং টাকা দেওয়া হয়। এঁরা সুপারিশ করিলে গবর্ণমেন্ট সেই কর্ম্মচারীকে ছুটি দিয়া দেন। প্রতিভাবান গ্রাজুয়েট ছাত্র এবং অধ্যাপকেরাও এই ইনষ্টিটিউটের বৃত্তি নিয়া উচ্চতর গবেষণা করিতে পারে। এদের বইগুলি দুই প্রকার—কতকগুলি সাধারণ লোকের বোধগম্য, আবার কতকগুলি বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা। শো কেসে Education for Social Change (সামাজিক পরিবর্ত্তনের জন্য শিক্ষা) বইটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছিলাম। স্ওগার্স বইটি বাহিরে আনিয়া বলিলেন—এটি দেখছেন ?

হাঁ—বলিয়া হাত বাড়াইলাম। স্ওগার্স বইটি দান করিলেন।

টাকা পয়সার ব্যাপার এদের সব জায়গাতেই রাজসিক। ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসনের খরচ বার্ষিক এক কোটি টাকা।

স্ওগার্সকে বলিলাম—আমি ছোট এবং বৃহৎ শিল্পের সম্পর্ক নিয়া কিছু পড়াশুনা করিতেছি। আমার বিশ্বাস বৃহৎ জনাকীর্ণ দেশে কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্পের সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন এবং বেকার সমস্যা সমাধান হইতে পারে না। বৃহৎ এবং ছোট শিল্পের সমন্বয় সাধনের দ্বারাই ইহা সম্ভব। এবিষয়ে আপনাদের ইনষ্টিটিউটে কোন গবেষণা হইয়াছে কি না জানিলে আনন্দিত এবং উপকৃত হইব।

স্তগ্তাস´ ডাঃ চার্লস এশারের ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন। বলিলেন—আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; এঁরা হয়ত দিতে পারিবেন।

স্তগ্তাস´ চলিয়া গেলেন। এশার ১৯৫৪ সাল হইতে ইনষ্টিটিউসনের সর্ব্বোচ্চ গবেষণা পরিচালনার কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। ব্রুকিংসে আসার আগে তিনি প্রায় ২০ বৎসর ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের অর্থনীতি বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছেন।

এশার বলিলেন—কিন্তু আমার বিশেষ গবেষণার বিষয় হইতেছে বৈদেশিক সাহায্য। নিজের লেখা একখানি বই বাহির করিলেন—Grants, Loans and Local Currencies: their Role in Foreign Aid। বইটি দিলেন। তাঁর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে আলাপ হইল। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন—চলুন, আপনাকে ডাঃ ওয়েনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিই। তিনি হয়ত আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবেন।

গেলাম ডাঃ ওয়েনের ঘরে। ডাঃ উইলফ্রিড ওয়েন বিমান পরিবহনে বিশেষজ্ঞ। ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসনে যেদিন গিয়াছি সেদিন তারিখ ছিল ৩১শে অক্টোবর ১৯৬১। ১লা হইতে ৩রা নভেম্বর পর্য্যন্ত কানেকটিকাট জেনারেল জীবনবীমা কোম্পানীর উদ্যোগে বিমান পরিবহন সমস্যা নিয়া একটি সিমপো-সিয়াম হইবে। উহাতে আলোচনা উত্থাপন করিবেন ডাঃ ওয়েন। যে পেপারটি পড়িবেন সেটি সুন্দর ছবি, চার্ট প্রভৃতি সহ ছাপা হইয়া গিয়াছে। উহা প্রকাশের একদিন আগেই বইটি আমাকে দিলেন।

ডাঃ ওয়েনও বলিলেন—আমার প্রশ্ন তাঁর এলাকার বাহিরে। তবে এশার এবং ওয়েন দুজনেই বলিলেন যে এবিষয়ে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জন লুইস আলোকপাত করিতে পারিবেন। তিনি ভারতে ছিলেন, এখন ফিরিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই আছেন। ডাঃ লুইস ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউটের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

দুজনে আরও কয়েকটি জায়গার সন্ধান দিলেন। ওয়াশিংটনের ছোট ব্যবসা এডমিনিষ্ট্রেসনের এডমিনিষ্ট্রেটার জন হর্নে'র সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। এছাড়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং এসোসিয়েসনের জেরহার্ড কোল্‌ম এবং থিওডোর গাইগারের নামও দিলেন। তাঁহাদের নাম করিয়া সময় চাহিতে বলিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার কিছুতেই আর সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ওয়াশিংটন প্রোগ্রাম এমন ছিল যে তার মধ্যে আর কোন প্রোগ্রাম ঢোকানো গেল না। ওয়াশিংটনের বিখ্যাত করকোরান আর্ট গ্যালারী প্রোগ্রামে ছিল কিন্তু ডাঃ শেফারের কল্যাণে ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স দেখিবার সুযোগ পাইয়া আর্ট গ্যালারী বাতিল করিলাম। শুনিলাম নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন গেলে ওটি দেখিবেনই। ওয়াশিংটন থাকাকালে নেহরুও সেখানে গিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম তিনি করকোরাণ আর্ট গ্যালারী দর্শন করিয়াছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় লিখিয়া দিলাম ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ জন লুইসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইলে সুখী হইব।

ওয়াশিংটন দূতাবাস

ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের এক কৃতিত্বের পরিচয় বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর বর্ণনায় দিয়াছি। উহাদের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। ওয়াশিংটনে আমার সাক্ষাৎকার তালিকায় ছিল—ভারতীয় দূতাবাস। দূতাবাসে কাহার সহিত দেখা করিব তাহার উল্লেখ ছিল না। তালিকাটি তৈরি করিয়াছিলেন ভারত সুহৃদ সমিতি।

২রা নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ভারতীয় দূতাবাসে যাওয়ার কথা। সেদিনই সকাল ১০টায় আমেরিকান শিক্ষা এসোসিয়েসনের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ ডাঃ ল্যাম্বার্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। দুটি সাক্ষাৎকার এত কাছা কাছি হইয়া পড়াতে প্রথমটিতে সময় কম পাইব, তাড়াতাড়ি উঠিতে হইবে বলিয়া প্রথমটি একটু আগাইয়া অথবা দ্বিতীয়টি পিছাইয়া নেওয়া যায় কি না দেখিতে বলিলাম। ডাঃ ল্যাম্বার্ট আধ ঘণ্টা আগে সাড়ে নয়টায় যাইতে বলিলেন। ডাঃ ল্যাম্বার্টের অফিস এবং দূতাবাস কাছাকাছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমেরিকা কত দ্রুত উন্নতি করিতেছে তাহার বহু বিষয় জানিতে পারিলাম।

স্কুল শিক্ষকের যোগ্যতা বাড়াইয়া দিলে স্কুলের কোর্স এক বৎসর কমাইয়া দেওয়া যায়, ডাঃ ল্যাম্বার্ট ইহার এক সুন্দর হিসাব তৈরি করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলেও স্কুলের মোট ব্যয় কমিয়া যায়। ছাত্রেরাও এক বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে পারে।

সোমবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের বিখ্যাত লাফায়েৎ হোটেলের সুপ্রশস্ত হলে ভারত সুহৃদ সমিতি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। হোয়াইট হাউসের নিকটে এটি একটি বৃহৎ অভিজাত হোটেল। হলটি অতি সুন্দরভাবে সাজানো। দেয়ালে আলোগুলিকে দেখিলে মোমবাতি বলিয়া ভ্রম হয়। তারার মত করিয়া আলো সাজানো। চা, কফি, জলখাবারের প্রচুর আয়োজন। এরূপ অভ্যর্থনা সভায় ককটেল একটি মস্ত জিনিষ।

তাহাও ছিল। আমি মদ্যপান করি না জানিয়া আমাকে চা এবং কফি একের পর এক কাপ দিতে সুরু করিল। মহিলারা কাপ নিয়া আসেন, আর বলেন—সঙ্কোচ করো না, আর এক কাপ নাও (Don't be shy, have another cup)। সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণী, সাংবাদিক, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফিসার, পাবলিশিং হাউসের ডিরেক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হইল। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের একজন প্রবীণ অফিসারের ভারতে মৌর্য্য যুগের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য জ্ঞান দেখিলাম। এই অভ্যর্থনা সভায় ভারতীয় দূতাবাসের তিনজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। চা অথবা কফির কাপে এঁদের আগ্রহ নাই, এঁরা একের পর এক ককটেল গলায় ঢালিতে ব্যস্ত। পরের পয়সায় মদ্যপানে ভারতীয় দূতাবাসের লোকদের পরম আসক্তি বিশ্ববিদিত।

বেলা ঠিক এগারোটায় দূতাবাসে হাজির হইলাম। সামনেই আমেরিকান কায়দায় মহিলা রিসেপসন অফিসার। মহিলাটি উত্তর প্রদেশীয়। আমার সাক্ষাৎকার কার সঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কাগজপত্র দেখিয়া বলিলেন—আমার কোন ইণ্টারভিউ নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কেন দেখা করিতে চান?

বলিলাম—আমি দেখা করিতে চাই নাই। যাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছেন তাঁহারাই আমার সাক্ষাৎকার স্থির করিয়াছেন। আমার তালিকায় দূতাবাস লেখা আছে কিন্তু দূতাবাসে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ তার উল্লেখ নাই বলিয়া তাহা জানিতে চাহিতেছি।

এই সময় পূর্ব্ব দিনের অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত ত্রয়ীর একজন আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়া তিনতলায় কালেলকারের নিকট পৌঁছিয়া দিলেন। দূত বি. কে. নেহরু এবং মিনিষ্টার ডি. এন. চ্যাটার্জ্জির পরেই কালেলকার। তিনিও ঐ অভ্যর্থনা সভায় ছিলেন। আমি কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব তাহা তিনিও বাহির করিতে পারিলেন না।

কালেলকারকে বলিলাম—আমি মিঃ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে দেখা করিতে চাই।

কালেলকারের জবাব—তিনি এখন প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিয়া ভয়ানক ব্যস্ত; দেখা করার সময় তাঁর হইবে না।

আমার ততক্ষণে মেজাজ শান্ত রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। একটু কড়া

সুরেই বলিলাম—তাঁর সঙ্গে দেখা না করিয়া আমি এখান হইতে উঠিব না, তাঁকে টেলিফোনে আমার নাম বলুন।

কালেলকার টেলিফোন করিলেন। জবাব পাইবামাত্র উঠিয়া বলিলেন—আসুন। সঙ্গে নিয়া চ্যাটার্জ্জির ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন।

ডি. এম. চ্যাটার্জ্জি আমাকে নামে জানিতেন, সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না তাঁর দাদা প্রবুদ্ধনাথ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং তিনি 'যুগবাণী'তে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সুতরাং আলাপ জমিতে দেরী হইল না। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও আগ্রহ সম্পন্ন একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়া আনন্দ হইল।

চ্যাটার্জ্জির ঘর হইতে যখন বাহির হইয়াছি তখন বেলা বারোটা। বাহিরে আসিয়া সামনে দেখি একতলার সেই অফিসারটি। তিনি হাত কচলাইয়া বলিলেন—"মিঃ বর্ম্মণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার স্বয়ং রাজদূতের সঙ্গেই সাক্ষাতের কথা ছিল কিন্তু নোট রাখার ভুলে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মিঃ ম্যাডেন আপনার জন্য সাক্ষাৎ স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ভুলে তিনি আসিবেন বলিয়া লেখা হইয়াছিল। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন?"

বলিলাম—আমি আগেও চাই নাই, এখনও চাই না। আমার কোন স্বার্থের জন্য এখানে আসি নাই। বুঝিতেছি তিনি খুব ব্যস্ত। আজ থাক। দেশে কি জিনিষ নেওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে আমার কিছু জ্ঞাতব্য আছে। তাহা কাহার নিকট জানিতে পারিব?

তিনি আবার নিয়া গেলেন কালেলকারের কাছে। এক কর্ম্মচারী নিউ রিপাবলিকের একটি সংখ্যা তাঁহাকে দেখাইতেছেন। দুজনেরই মুখ কালো। ঐ সংখ্যায় নিউ রিপাবলিক নেহরুকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছে। আগেই ওটি পড়িয়াছি, সুতরাং তাঁহাদের বিরস বদনের কারণ বুঝিতে পারিলাম।

কালেলকার কমার্সিয়াল অফিসার পারেখের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন—কোন কিছুই নেওয়া যায় না।

—শুল্ক দিয়া কোন্ কোন্ জিনিষ নেওয়া যাইতে পারে তাহাই জানিতে চাই।

আরও বিজ্ঞের মত কথা—আমদানী লাইসেন্স ছাড়া কোন জিনিষই নেওয়া যায় না।

—খেলনা নেওয়া যাইবে ?

—তাও না।

কোন সাকুর্লার বা নিয়মাবলী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সাইক্লোষ্টাইল করা কয়েকটি কাগজ দিলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কি দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি আসে ?

—হাঁ, সমস্ত সংবাদপত্র আসে।

—সেগুলি কোথায় পাইব ?

—নীচে আমাদের রিডিং রুম আছে, সেখানে পাইবেন।

নীচে আসিয়া সেই তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানকার রিডিং রুমটি কোথায় ?

চক্ষু কপালে তুলিয়া সে বলিল—রিডিং রুম ?

—এই যে তিন তলায় আমাকে বলিল এখানে রিডিং রুম আছে ?

—না, কোন রিডিং রুম নাই ; কেন উহা চান ?

—শুনিলাম সেখানে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র রাখা হয় ?

—ও, সংবাদপত্র ? ঐ পাশে ওয়েটিং রুম আছে, সেখানে কতকগুলি সংবাদপত্র আছে।

রিডিং রুম হইয়া গেল ওয়েটিং রুম, সমস্ত সংবাদপত্র দাঁড়াইল কতকগুলি সংবাদপত্রে। গিয়া দেখিলাম, ডাক্তারদের বৈঠকখানায় এলোপাথাড়ি যেমন কয়েকটা পুরাণো কাগজ পড়িয়া থাকে, এও তাই।

এই তো ভারতের দূতাবাস। বাড়ীটি খুব বড়, খুব ভাল জায়গায় অবস্থিত। কিন্তু ভিতরে সর্ব্বত্র একটি অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট। এই ভারতীয় দূতাবাসের জন্য দরিদ্র করদাতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার, পাকিস্থানী অপপ্রচার কোনটারই প্রতিরোধ, প্রতিবিধান বা সংশোধন ইহারা করে না।

লজ্জা পাইলাম মিঃ ম্যাডেনের কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—অ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে দেখা হইল ? বলিলাম—তিনি বড় ব্যস্ত বলিয়া দেখা করিলাম না, দূতাবাস দেখিলাম।

ম্যাডেন সুপ্রীম কোর্টের বড়-এটর্ণী। বুঝিলাম ব্যাপারটি তিনি ধরিতে পারিয়াছেন। ম্যাডেন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আসেন নাই দেখিয়া তাঁর অফিসে টেলিফোন করিয়াছে এবং তখন জানিয়াছে সাক্ষাৎ তাঁর সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে।

উইলিয়ামসবার্গ

নেলসন যখন প্রোগ্রামে কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গের নাম দিলেন তখন উহার তাৎপর্য্য বুঝি তো নাই-ই, বরং একটু মৃদু আপত্তিও করিয়াছিলাম। নেলসন বলিলেন—গেলে পরিশ্রম পোষাইবে। অগত্যা রাজি হইলাম।

ওয়াশিংটন হইতে বাসে বিকালে রওনা হইলাম। যখন পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। হোটেলে পৌঁছিয়াই একটি চিঠি পাইলাম। প্রেস অফিসার লিখিয়াছেন পর দিন তিনি থাকিতে পারিবেন না, তবে তাঁর সহকারিণী মিসেস বারবারা ব্রাইটের উপর আমাকে সব কিছু ভাল করিয়া দেখানোর ভার দিয়া যাইতেছেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রথমেই গেলাম ইনফরমেশন কেন্দ্রে। মিসেস ব্রাইট অপেক্ষা করিতেছিলেন। উইলিয়ামসবার্গ ব্যাপারটা কি সর্ব্বাগ্রে তাহা মোটামুটি বলিয়া দিলেন। ইংলণ্ড হইতে ভার্জ্জিনিয়ায় আগত ঔপনিবেশিকরা প্রথমে এই সহরে রাজধানী স্থাপন করে। কলোনিয়াল যুগের সহর উইলিয়ামসবার্গ বলিয়া উহা কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গ নামে পরিচিত। সহরটি খুব ছোট। উহার জমজমাট সময়েই লোকসংখ্যা ছিল দুই হাজার। এই সহরে গবর্ণরের প্রাসাদ এবং আইনসভা ছিল। আইনসভার অধিবেশনের সময়ে সহরের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত।

মিসেস ব্রাইট বলিলেন—থাকার জায়গা কোনমতে যদি বা করা যাইত, শোয়ার জায়গা দেওয়া যাইত না।

—সে কি রকম? লোকে শুইত কোথায়?

এক বিছানায় একজন ঘুমাইত রাত দুইটা পর্য্যন্ত, তার পরে আর একজন ভোর পর্য্যন্ত শুইত।

ভাবিলাম—এ যে দেখি আমাদের চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ব্যবস্থা।

ইনফরমেশন সেণ্টারে প্রতিদিন দর্শকদের সকলের আগে একটি এক ঘণ্টার সিনেমা দেখানো হয়। এক ব্যাচের দেখা শেষ হইলে আর এক ব্যাচ ঢোকে।

কতক্ষণ ছবি দেখানো চলিয়াছে তাহা দরজার বাহিরে নির্দেশ করার ব্যবস্থা আছে। হয়ত দেখা গেল শেষ হইতে আরও আধঘণ্টা বাকি আছে। তখন আর কোথাও ঘুরিয়া আসিয়া আধঘণ্টা পরে দাঁড়াইলেই হইল।

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে বিপ্লবের সূচনা কি ভাবে হইয়াছিল, কি ভাবে একটি তরুণের হঠকারিতায় বৃদ্ধবৃদ্ধারা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল—ইংরেজের সঙ্গে লড়িতে যাওয়া কি সোজা কথা?—ইত্যাদি অতি চমৎকার ভাবে অত অল্প সময়ে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আমেরিকান বিপ্লবের মূল কথাটি নূতন করিয়া জানিয়া নিয়া তারপর সুরু হয় উইলিয়ামসবর্গ সহর পরিদর্শন।

সহরটি নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। একটি গির্জ্জা আছে, সেটি ১৬৬৫ সালে তৈরি হইয়াছিল। এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল ১৬৯৯-তে। আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন সহরের বাড়ীঘর যখন প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তখন জন রকফেলার উহার পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজ রকফেলার বলিয়াই শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। এখন প্রতিটি বাড়ী ঠিক আগের চেহারায় শক্ত করিয়া তৈরি হইয়াছে। রাস্তাগুলির মাঝখানটা আধুনিক কিন্তু দু পাশে খানিকটা পুরাণো রাস্তার চেহারা রাখা হইয়াছে যেমন আমাদের দেশে আগ্রায় বাজারের মধ্যেকার সরু রাস্তাগুলি দেখিলে মনে হয় উহা আকবরের আমলের।

উইলিয়ামসবার্গ পুনরুদ্ধারে রকফেলার ১৯২৬ সালে হাত দেন। একটি বাস সার্ভিস আছে, প্রতি দশ মিনিট অন্তর ঐটি ছাড়ে এবং সমস্ত দ্রষ্টব্য জায়গায় থামে। ভাড়া লাগে না। যে কোন স্থানে নামিয়া দেখিয়া বাসে উঠিয়া পরবর্ত্তী স্থানে গেলেই হইল

প্রধান দ্রষ্টব্য তিনটি—ক্যাপিটল অথাৎ আইন সভা, গবর্ণরের প্রাসাদ এবং উইলিয়াম ও মেরী কলেজ। ক্যাপিটলের চূড়ায় এখনও ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেছে। প্রত্যেকটি জায়গাতে পুরাণো ইতিহাস বলিয়া দেওয়ার জন্য গাইড আছে এবং প্রতিটি গাইড উপযুক্ত খবর রাখে। ক্যাপিটলের গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এখনও এখানে ইউনিয়ন জ্যাক কেন?

—ইউনিয়ন জ্যাক ছাড়া এই বাড়ী যে অর্থহীন। এটা আমাদের স্বাধীনতার আগে তৈরি এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই দেখানো হইতেছে।

প্রতিটি গাইডের পোষাক সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর। সমস্ত সহরটার সর্ব্বত্র সযত্নে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ রক্ষা করা হইতেছে। গবর্ণর প্যালেসের দেয়ালে অতি সুন্দর ফ্রেস্কো পেইন্টিং। একটি দেয়ালে ফুল পাতা গাছ আঁকা, তার মধ্যে অনেকগুলি ছোট পাখী বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট এবং উড্ডীয়মান। সারা দেয়ালে এক কোণে একটি মাত্র প্যাঁচা। মনে পড়িল ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবের সভাপতি কসগ্রোভের কথা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তোমাদের মনোগ্রামে প্যাঁচা কেন?

জবাব দিয়াছিলেন—Wise Bird (জ্ঞানী পাখী।)

একটু ঝালাইয়া নেওয়ার জন্য এখানে গাইডকে প্রশ্ন করিলাম—প্যাঁচা কেন?

সেই জবাব—Wise Bird।

—অন্য পাখী অসংখ্য, আর প্যাঁচা একটা কেন?

—প্রেমের দূত অনেক থাকে কিন্তু জ্ঞানী থাকে একটি।

বাড়ীর সাজসজ্জা রাজসিক সে তো বলাই বাহুল্য। একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম—শোয়ার খাটগুলি লম্বায় খুব ছোট। ঘরগুলিও অবশ্য বেশ ছোট। দরবার হলটিই সবচেয়ে বড়।

কলেজটির তাৎপর্য্য—এখানকার বহু ছাত্র আমেরিকার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। জেফারসন এই কলেজের ছাত্র।

পুরাণো জেলখানাটি এখনও আছে। একটি সেলে কয়েদীদের পা বাঁধিয়া রাখিবার শিকলগুলি রহিয়াছে।

দোকানগুলি অদ্ভুত। তখনকার সোনার দোকান, চুল ছাঁটার দোকান, রূপার জিনিষের দোকান, ছুতার মিস্ত্রীর দোকান, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, দপ্তরীখানা, কামারশালা প্রভৃতি এখন অদ্ভুত লাগে। যে ভাবে এবং যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সব কাজ চলিত ঠিক ঠিক সেই সমস্ত জিনিষ এবং ধারা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। সাইনবোর্ডগুলিও সেই তিনশত বছরের পুরাণো ধাঁচের।

বেলা একটায় মিসেস ব্রাইটের সঙ্গে লাঞ্চের নিমন্ত্রন ছিল কিংস আর্ম্ম ট্যাভার্ণে। পৌঁছিয়া দেখি মিসেস ব্রাইট আগেই আসিয়াছেন। একটি টেবিল আমরা দুজনে দখল করিলাম। ওয়েটার আসিল লম্বা তোয়ালে হাতে। খাওয়ার

সময় পোষাকে ঝোল ছিটকাইয়া যাহাতে উহা নষ্ট না হয় তার জন্য পাশ্চাত্য দেশে খাওয়ার সময় সর্ব্বাগ্রে কোলের উপর. একটি তোয়ালে বাঁধিয়া নেওয়া নিয়ম। কিংস আর্ম্ম ট্যাভার্ণের তোয়ালে গলা হইতে বাঁধিবে।

মিসেস ব্রাইট বুঝাইয়া দিলেন—এখানে খানার টেবিলে বসার সেই পুরাণো ষ্টাইল মানা নিয়ম। বলিলেন—আপনার আপত্তি আছে?

—কিছুমাত্র না, বলিয়া গলা বাড়াইয়া দিলাম।

খাদ্যও আধুনিক, রান্নাও আধুনিক। জিজ্ঞাসা করিলাম—এটা পুরাণো ষ্টাইল নয় কেন?

হাসিয়া মিসেস ব্রাইট বলিলেন—এটা বোধ হয় রুচির চাহিদার ফল।

তারপর বলিলেন—মনে করুন আমরা আজ এই যে টেবিলে খাইতে বসিয়াছি, হয়ত এই টেবিলে এই চেয়ারে বসিয়াই একদিন জর্জ্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন খাইয়াছেন; হয়ত কেন নিশ্চয়ই খাইয়াছেন। সারা সহরে তিন চারটি মাত্র ট্যাভার্ণ বা রেস্তোঁরা, সুতরাং সব কয়টিতেই তাঁদের পদধূলি পড়িয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা এদের এই উইলিয়ামসবর্গ সহরের উপর। সহরের প্রতিটি ইট, প্রতি টুকরা কাঠ, প্রতিটি ধূলিকণা যেন এদের কাছে প্রিয়। প্রত্যেকটিকে ঠিক সেই পুরাণো অবস্থায় রাখার জন্য অসীম আগ্রহ, মায় সেই ইউনিয়ন জ্যাকটি পর্য্যন্ত।

মিসেস ব্রাইট বলিলেন—স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই এখানে পাঠানো হয়। বহু স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন ছেলেমেয়েরা নিজের চোখে কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গের চেহারা না দেখিলে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, যুগ পরিবর্ত্তনের কথা সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অতীত না জানিলে, অতীত সম্বন্ধে উপলব্ধি সম্যক না হইলে ভবিষ্যৎ কখনো সঠিক ভাবে চিন্তা করা যায় না।

—অর্থাৎ আপনারা বিশ্বাস করেন history can be learnt only through the past and that past must be made as living and as vivid as possible? (কেবলমাত্র অতীতের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎকে জানা যায় এবং অতীতকে যতটা জীবন্ত এবং উজ্জ্বল করিয়া তোলা সম্ভব তাহাই করা উচিত?)

—ঠিক তাই।

বুঝিলাম এই জন্য ইউনিয়ন জ্যাকটাকেও তাহারা নামায় নাই। আর আমরা? গড়ের মাঠ হইতে বৃটিশ শাসকদের মূর্ত্তি সরাইবার জন্য আমাদের দেশে আন্দোলন হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নাম বদলাইয়া শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ করার প্রস্তাবও আমাদের দেশেই হয়। অবশ্য একটু তফাত আছে। বৃটিশ শাসন চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে ভারতবাসী যতটা আগ্রহশীল, মোগল, পাঠান তুর্কী শাসনের স্মৃতিগুলি বুকে ধরিয়া রাখিতে ঠিক ততটাই ব্যাকুল। আমাদের দেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কোন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান বলে নাই—ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী ভাঙিও না, ইতিহাস শিক্ষার জীবন্ত পাঠ্যরূপে ঐগুলি রাখিয়া দাও। ভারতের ইতিহাসে দুঃস্বপ্নময় দুটি অধ্যায়—মুসলিম শাসন এবং ইংরেজ শাসন যখন মুছিয়া ফেলা যাইবে না, তখন উহার চিহ্নগুলি উপড়াইবার চেষ্টায় কোন লাভ নাই। আউটরাম মূর্ত্তি নর্দ্দমায় ফেলিয়া গান্ধী মূর্ত্তি বসানোতে ভারতের গৌরব বাড়ে নাই।

মিসেস ব্রাইট বলিলেন—আপনাদের কি সৌভাগ্য। কত হাজার হাজার বছরের সুদূর অতীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন আপনাদের দেশে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। আমাদের অতীতের দৌড় তো মাত্র তিনশত বছর!

—তা বটে। মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পা হইতে আজ পর্য্যন্ত ছয় হাজার বছরের অতীত গৌরব চিহ্ন আমাদের দেশের বহুস্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

ভাবিলাম—এদের সংরক্ষণ পদ্ধতি, আর আমাদের? আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এলোরা হইতে কোণারক পর্য্যন্ত মন্দির পবিত্র করার অজুহাতে যে ষণ্ডামি চালাইয়াছে তাহা বোধ হয় ইহারা কল্পনাও করিতে পারিত না।

আটলাণ্টা

ওয়াশিংটনে ফাষ্ট´ ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে ডাঃ ডানকান হাওলেটের সারমন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। একজন পাদ্রী তীব্রকণ্ঠে বলিতেছেন—আকাশে এটম বোমা পরীক্ষা দ্বারা বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করা হইতে রাশিয়াকে নিবৃত্ত হইবার জন্য জাতিসঙ্ঘে কেন অনুরোধ প্রস্তাব আনা হইয়াছে, কেন এটম বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে নিন্দা প্রস্তাব (Censure motion) আনা হয় নাই? সমগ্র মানব জাতি এক, জাতি বর্ণ ধর্ম্ম গায়ের রং প্রভৃতি মানুষে মানুষে ভেদ আনিতে পারে না, যুদ্ধের নামে নরহত্যার অধিকার পৃথিবীর কোন দেশের নাই।

সারমন শেষ হইয়া গেলে এদের গির্জ্জায় দুইটি কাজ হয়। একটি বড় হলে সকলকে চা কফি পানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে পরস্পর আলাপ পরিচয়াদি হয়। দ্বিতীয়তঃ পাদ্রী স্বয়ং বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমে গির্জ্জার প্রধান প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ান। যাহারা অবিলম্বে চলিয়া যাইতে চায় এবং পাদ্রীর সহিত কথা বলিতে ইচ্ছুক, তাহারা তখনই আলাপ করে। তারপর তিনিও গিয়া সেই হলে উপস্থিত হন।

ডাঃ হাওলেটের নিকটে গিয়া বলিলাম—আপনার সারমনের একটি কপি চাই। তিনি আঙ্গুল দিয়া মাথা দেখাইয়া বলিলেন—It is up here (এটা এখানে আছে।)

বলার সময় তিনি বক্তৃতার কপি রাখার ষ্টাণ্ডের উপর বার বার তাকাইতে-ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল তিনি লিখিত সারমন পড়িতেছেন।

কয়েক মিনিট আলাপের পর তিনি আমাকে নিয়া তাঁর ঘরে গেলেন এবং কয়েকদিন পর ওয়াশিংটনের কসমস ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কসমস ক্লাবে উপস্থিত হইলাম। বুঝিলাম এটি আমেরিকার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অভিজাত ক্লাবের অন্যতম। কি দেখিলাম, কি ভাল লাগিল ইত্যাদি

আলোচনার কিছুক্ষণ পরে ডাঃ হাওলেট বলিলেন—আপনি তো দেখিতেছি আমাদের শুধু ভাল দিকগুলিই দেখিয়াছেন, আমরা কিন্তু এত ভাল লোক নই।

—তা জানি। বাঁচিয়া থাকুক আপনাদের হলিউড আর খবরের কাগজ, আপনাদের সমাজের খারাপ দিকের পরিচয় আমরা দেশে বসিয়াই পাইব। তার জন্য এত কষ্ট করিয়া দশ হাজার মাইল দূরে আপনাদের দেশে আসিতে হইবে না।

এক টেবিলে ছিলাম শুধু আমরা দু'জন। আশেপাশের টেবিলে যাঁরা ছিলেন আমার এই টিপ্পনীতে তাঁরাও হাসিতে লাগিলেন।

এবার উঠিল নিগ্রোদের কথা। ডাঃ হাওলেট বলিলেন—নিগ্রোদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা আমেরিকার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়।

—কিন্তু এখন তো সরকারী নীতি বদলাইয়া গিয়াছে, নিগ্রোদের সঙ্গে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার শুনিয়াছি দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশে আছে। বোষ্টন' ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্কে তো কোনরূপ বৈষম্য দেখিলাম না। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এবং নিগ্রো একই বাসে একই ট্রেণে একই আসনে বসিতেছে, একই হোটেলে একই সঙ্গে খাইতেছে, একই অফিসে কাজ করিতেছে। ফিলাডেলফিয়ায় নিগ্রো নেতা ডাঃ মার্টিন লুথার কিংএর বক্তৃতা শুনিয়াছি। শ্বেতাঙ্গ ছাত্রেরা ঐ বক্তৃতায় গান গাহিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ মেয়র তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন।

—দশ বছর আগে নিগ্রোদের বাসে বা ট্রেনে সামনের আসনে বসার অধিকার ছিল না।

—দশ বছর তো অনেক আগেই পার হইয়াছে, এখন তো সমান অধিকারের যুগ, তবে এদের প্রকৃত বিক্ষোভটা কোথায়?

ডাঃ হাওলেট নিগ্রোদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। শ্বেতাঙ্গদের অসদ্ব্যবহারের কথাটাই তিনি বেশী করিয়া বলিলেন। সমস্যাটি বুঝিবার আগ্রহ আমারও ছিল। মার্টিন লুথার কিং-এর বক্তৃতায় অনাবশ্যক ঝাঁজ এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রতি কটূক্তি আমার ভাল লাগে নাই। তাঁর প্রধান অভিযোগ বুঝিলাম এই যে, শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রোকে বাড়ী বা ফ্লাট ভাড়া দিতে চায় না। নিগ্রোদের আলাদা পাড়ায় বাস করিতে হয়। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিল যে,নিগ্রোরা বাড়ীর খুব ক্ষতি

করে, অতিশয় অসংযত এদের ব্যবহার এবং চালচলন। আদালতগুলিতেও ইহার পরিচয় পাইয়াছি, অধিকাংশ অপরাধী এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থী নিগ্রো। কোন বাঙ্গালী বাড়ীর ফ্লাট বা একাংশ ভাড়া নিতে কোন পাঞ্জাবী বাস কণ্ডাকটার বা হিন্দুস্থানী ফুচকাওয়ালা যদি আসে তাহা হইলে তার যে মনোভাব হয় এবং যে কারণে সে ঐ জাতীয় লোককে ভাড়া দিতে আপত্তি করে,. এটাও দেখিলাম অনেকটা তাহাই।

বোষ্টন, নিউইয়র্ক, চিকাগো, সানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতিতে একই স্কুল কলেজে শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো এক সঙ্গে পড়িতেছে। উভয়ের আলাদা স্কুল আছে দক্ষিণের জর্জিয়া, আলাবামা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে। আটলাণ্টা গিয়াছি এবং সেখানে নিগ্রো সমস্যা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া নূতন তথ্য পাইয়াছি। আটলাণ্টা নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নেলসন বলিলেন—কিন্তু সেখানে যে বর্ণবিদ্বেষ এখনও আছে।

—কি করবে? ছাল ছাড়িয়ে নেবে, না জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে?

নেলসন হাসিয়া বলিলেন—না, না, সে সব কিছু এখন আর নাই; হয়ত তুমি ট্যাক্সি ডাকবে সে থামবে না, বা কোন রেস্তোঁরায় খেতে যাবে তারা খাবার দেবে না।

—বেশ, সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। তোমরা ওটা প্রোগ্রামে ঢোকাও।

আটলাণ্টায় অভিজ্ঞতা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল আটলাণ্টা বিল্‌টমোরে গিয়া উঠিলাম। সাদর অভ্যর্থনা পাইলাম। বিকালে ঘুরিতে বাহির হইলাম। একটি ড্রাগ ষ্টোরে গিয়া ওলিভ অয়েল চাহিলাম। বড় একটি বোতল আনিয়া দিল। শ্বেতাঙ্গ দোকান। বলিলাম—আমার তো এতো চাই না, আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আউন্স খানেকের ছোট শিশি চাই।

দোকানের লোক কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও। বোতলটি নিয়া ভিতরে গেল। ফিরিয়া আসিল একটি ছোট শিশি হাতে। বলিল—আমি তোমার অসুবিধা বুঝিতেছি, বড় বোতল হইতে এইটুকু বাহির করিয়া দিয়াছি, ইহাতেই বোধ হয় চলিবে।

ভাবিলাম—কোথায় কালার বার বা বর্ণ বিদ্বেষ।

ড্রাগ ষ্টোরে যেমন থাকে, পাশেই চায়েব ষ্টল। এক বৃদ্ধা চা খাইতে ছিলেন। ডাকিয়া বলিলেন—এদিকে এস। তুমি কোথাকার লোক?

কাছে গিয়া বলিলাম—আমি ভারতীয়।

—আমি ঠিক তাহাই ভাবিয়াছি। আমি মিসেস ই. এ. রস, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজির অধ্যাপক রসের পত্নী। অধ্যাপক রস পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তোমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার যখন আমেরিকায় আসেন তখন অধ্যাপক রস জীবিত, নেহরু উইসকনসিন গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তুমি কোথায় আছ?

—আটলাণ্টা বিলটমোরে।

—আমিও সেখানেই থাকি। আজ তুমি আমার সঙ্গে খাবে।

মনে হইতে লাগিল বৃদ্ধা যেন কত যুগের পরমাত্মীয়া। রাত্রি আটটায় খাওয়ার কথা। সামনেই একটি বড় অভিজাত কাফিটেরিয়া। সঙ্গে নিয়া সেখানে চলিলেন। হাত ধরিয়া সন্তর্পণে রাস্তা পার করিয়া দিলেন। বলিতে লাগিলেন —আমার অধ্যাপক ছিলেন ছয় ফুট সাত ইঞ্চি, আর তুমি তো এইটুকু লোক। বৃদ্ধার মুখে হাসি চোখে জল।

কাফিটেরিয়ায় ঢুকিয়াই মালিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখিলাম সেখানকার সকলকেও তিনি আপন করিয়া নিয়াছেন।

মালিক শ্বেতাঙ্গ। বৃদ্ধা আমাকে ভারতীয় বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। মালিকটি বলিলেন আজ আমরা ধন্য, দুইজন বিশিষ্ট ভারতীয় আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। [Two great Indians are with us today] একটু থামিয়া বলিলেন—একজন এখানে, আর একজন ওয়াশিংটনে। নেহরু তখন ওয়াশিংটনে। দেখিলাম লোকটি খুব রসিক আছে।

পরদিন গেলাম নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ক্লেমান্স আফ্রিকায় ছিলেন। নিগ্রো লাইব্রেরিয়ান সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখাইলেন। একটি ভূগর্ভস্থ ঘরে নিয়া গেলেন। বলিলেন—এই ঘরে নিগ্রোদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত কাগজপত্র আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, যেসব শ্বেতাঙ্গকে আমরা নিগ্রোদের মস্ত শত্রু বলিয়া মনে করিতাম তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে গোপনে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা আমাদের স্বার্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বাহিরে নিগ্রো বিরোধিতার মুখোস না বজায় রাখিলে উহা করিতে পারিতেন না।

নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে কিন্তু ভক্তি

হইল না। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখি বই হাতে তিনটি নিগ্রো তরুণী আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিলডিংটি কোথায়?

মেয়েরা দূরে একটা বাড়ী দেখাইয়া বলিল—ওটা লাইব্রেরী, আমাদের মনে হয় ওরই কাছে কোথাও হইবে।

আশ্চর্য্য হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিলডিং জানে না। একটি নিগ্রো ছাত্র আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—যে বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছ ওটাই এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিলডিং।

বেশ কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একজন ভারতীয় অধ্যাপকও আছেন। ছাত্রদের অধিকাংশই মারোয়াড়ী। একটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি পড়?

—আমি এখানে School of Business Administration-এ এম. এ. পড়ি।

—এম. এ.তে তো থিসিস লাগে, তোমার থিসিস কি?

—আমার থিসিসের (dissertation) বিষয় হইতেছে Possibility of opening a restaurant on the street by the side of the University (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় একটি রেস্তোঁরা খোলার সম্ভাবনা)। বুঝিলাম এই বিদ্যা নিয়া ইহারা এম.এ. (ইউ.এস.এ) হইয়া ভারত সরকারে মোটা বেতনের চাকরি পাইবে। প্রায় সকল ভারতীয় ছাত্রেরই দেখিলাম বড় গাড়ী আছে।

আটলাণ্টায় শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের স্কুল আলাদা। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—নিগ্রোদের সামাজিক ব্যবস্থা অতিশয় শিথিল এবং কদর্য্য। পারিবারিক বন্ধন এবং পবিত্রতা নাই বলিলেই চলে। ঐ সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভদ্র পরিবারেরা নিজেদের সন্তানদের এক স্কুলে মিশিতে দিতে চায় না। প্রভেদটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে গায়ের রং, কিন্তু প্রকৃত আপত্তি হইতেছে এইখানে।

এক শতাব্দীর অধিককাল নিগ্রোরা স্বাধীনতা পাইয়াছে। দশ বৎসরাধিককাল দক্ষিণের কয়েকটি প্রদেশ ভিন্ন অপর সর্ব্বত্র শ্বেতাঙ্গদের সহিত সমানাধিকার পাইয়াছে। সরকারী বেসরকারী অফিসে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। ফিরিবার সময় আয়কর সার্টিফিকেট নিতে হইয়াছিল এবং উহা যিনি দিয়াছিলেন

তিনি নিগ্রো অফিসার। এই প্রথম একজন অফিসারকে সিটে পাই নাই, প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। হাসপাতালে শ্বেতাঙ্গিনী নার্স নিগ্রো আহতের পা ব্যাণ্ডেজ করিতেছে ইহা তো স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

চিকাগোতে নিগ্রোরা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ বলিলেন—আগামী বার সম্ভবতঃ একজন নিগ্রো চিকাগোর মেয়র হইবেন।

ডিট্রয়টে একজন নিগ্রো মহিলা বলিলন—আমি যখনই কোথাও কোন নিগ্রোর উপর আক্রমণের কথা শুনি তখনই আগে সন্ধান নেই নিগ্রোটি কি দোষ করিয়াছিল।

আমেরিকা নিগ্রোদের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে মনের দিক দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু নিগ্রোরা নিজেরা তার পূর্ণ সুযোগ এখনও নিতে পারে নাই। সংস্কৃতির দিক হইতে এখনও নিগ্রোরা অনেক পিছাইয়া আছে। চার পাঁচ জনে মিলিয়া একটা ক্যাডিলাক গাড়ী কেনা এবং পালাক্রমে সেটি চড়িয়া বড়মানুষী দেখানো এখনও এদের রেওয়াজ। কাজে অনিচ্ছা এবং সরকারী চ্যারিটির উপর নির্ভরশীলতা ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

নিগ্রো সমস্যা অনুসন্ধান করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম সম্প্রতি মেরেডিথের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্ত্তির ব্যাপারে কেনেডির দৃঢ়তায় তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। বর্ণ-বৈষম্যের সরকারী সমর্থনের দিন শেষ হইয়াছে, তবে নিগ্রোদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করিয়া শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ হইতে এখনও বহু দেরী আছে।

আটলাণ্টায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়। জর্জ্জিয়া টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। নিগ্রো বিশ্ববিদ্যলয় ছাড়া এই দুইটিতেও অনেক ভারতীয় ছাত্র আছে।

আটলাণ্টায় দুদিন ছিলাম, তার মধ্যে দেওয়ালী পড়িয়াছিল। নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাকসেনা নামে একজন অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আগ্রহের সঙ্গে পরিচয় করেন। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিচালক হইতেছেন মেথডিষ্ট চার্চ্চ। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আমাদের ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রেড্ডির জামাতা।

দেওয়ালীর দিন জর্জ্জিয়া টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের হলে সাকসেনা এবং রেড্ডির উদ্যোগে একটি প্রীতি সম্মেলন হয়। সাকসেনা এবং রেড্ডি দুজনেরই সঙ্গে তাঁদের পত্নী ছিলেন। দুই মহিলা দুটি নাচ দেখাইলেন। ঐ বিশাল হলে লোক

ছিল জনা কুড়ি মাত্র ভারতীয় এবং একটি মাত্র আমেরিকান দম্পতি। শুনিলাম উদ্যোগ আয়োজন নিয়া জর্জিয়া টেকের ছাত্রদের সঙ্গে মতভেদ হইয়াছে এবং তাহারা একযোগে অনুষ্ঠান বয়কট করাতে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার অতিশয় হাস্যকর এক চেষ্টা হইল। তখন মনে হইতেছিল যে, বিদেশগামী ভারতীয় ছাত্রদের কঠোর ভাবে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, হয় এখান হইতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে শিখিয়া যাও, নচেৎ বিদেশে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিও।

আটলাণ্টা বিলটমোর হোটেলের হলে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকদের এক সম্মেলন তখন চলিতেছে। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিলাম। একজন অধ্যাপক—যত দুর মনে পড়িতেছে আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের—বলিলেন—আচ্ছা, আমরা তো শুনিয়াছি বাঙ্গলাদেশে মাছের চাষ খুব বেশী এবং ভাল; কিন্তু বাঙ্গলাদেশ হইতে একটি ছাত্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্য চাষ শিখিতে আসিয়াছে কেন?

বুঝিলাম, ছাত্রটি কোন ভাগ্যবানের পোষ্য, সস্তায় এম.এ (আমেরিকা) হইয়া ভারত সরকারের দপ্তরে মৎস্য বিশেষজ্ঞ রূপে দু হাজার টাকার চাকুরি পাইবে। বিদেশে একথা বলিতে পারি না, তাই জবাব দিলাম—আমরা মাছের চাষ আরও উন্নত করিতে চাই কি না, তাই তোমরা কি কর তাহা শিখিতে পাঠাইয়াছি।

এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানেও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন না। ডীন ডাঃ জাডসন ওয়ার্ড সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার বৃহত্তম সংক্রামক ব্যাধি গবেষণাগার নির্ম্মিত হইতেছে। এখানে আমেরিকার একটি অতি আধুনিক নূতন সমস্যার সংবাদ জানিলাম। আমেরিকার তরুণ তরুণীদের জীবন পাঠ্যাবস্থায় অতিশয় কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবৈধ সংসর্গ এবং তজ্জনিত পাপের প্রাবল্য দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছিল। পরীক্ষামূলক বিবাহ রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্রছাত্রীরা অল্প বয়সে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই এখন বিবাহিত। ডাঃ ওয়ার্ড বলিলেন—এবার সমস্যা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই সব ছাত্র এখন আর একা হোষ্টেলে থাকিতে পারে না, এদের প্রত্যেককে আলাদা ফ্লাট দিতে হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সবই আবাসিক।

সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের থাকার জায়গা দিতে হইবে। এত অধিক সংখ্যায় ফ্লাটের বাড়ী তৈরি করাও বহু ব্যয়সাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া ছাত্র যখন বাহির হয় তখন একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ লুইস একটি ছাত্রকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিয়া দিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে বলিল—তার শ্বশুর পার্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বছর কুড়ি বয়সের ছেলেমেয়ে এখন প্রায়ই বিবাহিত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমেরিকার নৈতিক জীবন অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে এখন ইহারাই নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কারণ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। জীবিকা উপার্জ্জনের এত পথ এত ভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে যে, আয়ের জন্য কাহাকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় না। টাকা যেন পথে ঘাটে ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। চাই শুধু কর্ম্মে অনুরাগ এবং পরিশ্রম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু ইহাতে এখনও তাহারা চিন্তিত হয় নাই। অনেক অর্থনীতির অধ্যাপক বলিলেন—দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এমন ধারায় এবং গতিতে চলিতেছে যে, লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিলেও ভয়ের কারণ নাই। বেকার সমস্যারও আশঙ্কা নাই।

আটলাণ্টায় একটি অতি বড় দ্রষ্টব্য বস্তু তাহাদের গৃহযুদ্ধের একটি বৃহৎ মডেল—সাইক্লোরামা। গোলাকার একটি বৃহৎ স্থান জুড়িয়া যুদ্ধের দৃশ্য মডেল দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছে, আহত ও নিহত সৈনিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ভাঙ্গা রেল লাইন, পুলের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। অন্তরাল হইতে বিবরণ দিয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে এক একটি অংশে আলো ফেলিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। গৃহযুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলি একটি প্রদর্শনীতে রাখা আছে। ইঞ্জিনে কয়লার বদলে কাঠের স্তূপ। মনে পড়িল পাকিস্থানেও কিছুদিন কয়লার অভাবে লকড়ি দিয়া ইঞ্জিন চালাইতে হইয়াছিল।

আটলাণ্টা যাওয়ার পথে রিচমণ্ড বিমানঘাঁটিতে কিছুক্ষণ ছিলাম। সেখানে প্রধান প্রতীক্ষা হলে শো কেসে গৃহযুদ্ধে ব্যবহৃত ছোটখাটো জিনিষ রাখা আছে। কয়েকটি জিনিষের সঙ্গে পরিচয়জ্ঞাপক প্লাকার্ড নাই, লেখা আছে—কেহ এইগুলি সনাক্ত করিতে পারিলে অমুক কামরায় অমুককে জানাইবেন। রিচমণ্ডেও বড়

রকমের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিমানঘাঁটির সন্নিকটে দুইটি কামান রাখা আছে। প্রকৃত স্মৃতিস্তম্ভটি কয়েক মাইল দূরে। উহা দেখিবার সময় ছিল না।

আটলাণ্টায় গৃহযুদ্ধ ক্ষেত্র দেখিয়া আসিয়া হোটেলে একজনের সঙ্গে উহা নিয়া আলাপ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—গৃহযুদ্ধ তো আপনাদের ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়, ওটিকে এত রকমে জীবন্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন?

জবাব পাইলাম—ঘটনাটি কলঙ্কজনক বটে কিন্তু উহা ইতিহাস। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাই আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই ঘটনা ভাল ভাবে জানুক যাহাতে ভবিষ্যতে কোন কারণে আবার কখনও যদি গৃহযুদ্ধের কোনরূপ সম্ভাবনা কেহ জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে-তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার জনমতই করিতে পারিবে, অস্ত্রধারণের প্রয়োজন আর হইবে না। আমরা মনে করি এই গৃহযুদ্ধ প্রয়োজন ছিল এবং দেশের ঐক্য রক্ষার জন্য আব্রাহাম লিঙ্কন এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই বলিয়াই তিনি এত মহান, এত বড়।

আমাদের দেশে গৃহযুদ্ধের ভয়ে দেশবিভাগে নেতারা রাজি হইয়াছেন। তবু গৃহযুদ্ধ ঠেকাইতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের জন্যও সে আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে। কেনেডি এক বক্তৃতায় নেহরুকে আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। দেশে আসিয়া শুনিয়াছিলাম আমাদের এখানে কেনেডির ঐ মন্তব্যে লোকে খুব খুসী হইয়াছিল। আমেরিকায় একাধিক শিক্ষিত লোককে মুখ টিপিয়া হাসিতে দেখিয়াছি। একজন বলিলেন—**Yes, both can certainly be compared, one prevented partition, another invited it.** (হাঁ, দুজনের তুলনা নিশ্চয়ই হইতে পারে। একজন দেশবিভাগ বন্ধ করিয়াছেন, আর একজন দেশবিভাগ ডাকিয়া আনিয়াছেন।)

কেনেডির রসিকতা ভারতের লোক বোঝে নাই।

আটলাণ্টা হইতে যাইতে হইবে টেক্সাসের ডালেস সহরে। অথচ আমার কাছে প্রোগ্রাম আছে আটলাণ্টা পর্য্যন্ত। ডালেসে কোথায় উঠিব, কোথায় যাইব কিছুই জানি না। মনে হইতে লাগিল যেন এই বিরাট অপরিচিত দেশে এবার সত্যই হারাইয়া যাইতেছি। দেওয়ালীর উৎসব হইতে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আরম্ভই হইয়াছিল নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা পরে।

হোটেলে আসিয়াই চিঠির সন্ধান করিলাম। কোন চিঠি নাই। পরদিন সকালে রওনা হইতে হইবে। তখনও কোন চিঠি নাই। মিসেস রুস বলিয়া দিয়াছিলেন সন্ধ্যার পর ফিরিয়া যেন তাঁহাকে টেলিফোন করি। রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া আর করি নাই। সকালে ফোন করিয়া রাত্রে দেরীতে ফেরার কথা জানাইলে বলিলেন—কেন রাত্রেই ফোন কর নাই, আমি তো রাত্রে ঘুমাই না।

একেই তো মনটা ছিল উদ্বিগ্ন। তার পর বৃদ্ধার কথায় মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল। সুদূর উইসকনসিন হইতে কেন বৃদ্ধা আসিয়া আটলাণ্টায় হোটেলে রহিয়াছেন, কি তাঁর দুঃখ, কেন রাত্রে ঘুমাইতে পারেন না? অথচ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিলাম না।

ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে রওনা হইলাম বিমানঘাঁটিতে। ডালেসে পৌঁছিয়া এরোড্রামে প্রবেশ করিবামাত্র স্মিতহাস্যে একজন বলিলেন—আপনি মিঃ বর্দ্ধণ?

বিস্মিত হইয়া তাকাইতেই ভদ্রলোক বলিলেন—আমি আপনাকে নিতে আসিয়াছি।

বুঝিলাম ইহারই নাম প্লানিং। ফিলাডেলফিয়া অফিস হইতে আমাকে চিঠি পাঠায় নাই কিন্তু আমাকে ভোলে নাই।

ডালাস, টেক্সাস

ডালাস বিমানঘাঁটি হইতে ডাভে ফিচ সঙ্গে নিয়া বাহির হইলেন। আমেরিকার পুরাণো সহরগুলিতে রাস্তা সরু। চওড়া নূতন এক্সপ্রেসওয়ে করিয়াছে বটে কিন্তু সহরের ভিতরের রাস্তা চওড়া করিতে পারে নাই—ফলে রাস্তায় গাড়ী রাখা এক প্রচণ্ড সমস্যা হইয়াছে। নূতন সহরগুলিতে রাস্তা প্রথম হইতেই এত চওড়া করিতেছে যে গাড়ী চলাচলের কোন অসুবিধা যেন সুদীর্ঘকাল না হইতে পারে। ডালেসে প্রথমেই এই জিনিষটি নজরে পড়ে। ফিচ প্রথমেই নিয়া গেলেন একটি প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ীতে। তার উপরে উঠিয়া প্রথমে সহরটি দেখা হইল। আর এক অসুবিধা দেখা দিয়াছে। আটলান্টা হইতে ডালেসে সময় দুই ঘণ্টা পিছাইয়া গিয়াছে। ডালেসে বিকাল পাঁচটায় অধ্যাপক ব্রাবামের বাড়ী পৌঁছিবার কথা। আমার আটলান্টায় মেলানো ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে কিন্তু ডালেসের তখন বেলা তিনটা। ডালেসের ঘড়ি মতে দুই ঘণ্টা আগে পৌঁছিয়া গিয়াছি, সুতরাং এই সময়টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কাটাইতে হইল। সময় অবশ্য বৃথা যায় নাই। পরিকল্পিত সহর বলিতে আধুনিক বিশ্বে যাহা বুঝায় ডালেসে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপক ব্রাবামের বাড়ী পৌঁছিলাম। ডালেসের উপকণ্ঠে ডেনটন নামক একটি ছোট সহরে তিনি থাকেন। ছোট হইলেও ডেনটন উল্লেখ-যোগ্য সহর। এখানে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত—উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্সাস নারী বিশ্ববিদ্যালয়। নেলসনকে বলিয়াছিলাম—তোমাদের দেশের হোটেলে থাকিয়া তো আর তোমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা কিছু জানিতে পারিব না, কোন পরিবারে অতিথি করিয়া দিতে পার? তাহাতেই টেক্সাসে দুইদিন দুই পরিবারে থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম দিন অধ্যাপক ব্রাবামের বাড়ী, দ্বিতীয় দিন ব্যবসায়ী ওয়াল্টার লীর বাড়ী।

ব্রাবাম পরিবারে পতিপত্নী এবং দুটি শিশু। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন হয় তেমনি একটি ছোট বাড়ী। এদের ছোট বাড়ী বলিতে চার কামরার বাড়ী বুঝায়।

ঘর খুব বড় নয়, আমাদের কাছে মাঝারি গোছের। তারই একটি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। ফিচও থাকেন ডেনটনে।

সন্ধ্যায় ফিচের বাড়ী ডিনার। সহরের মেয়র উপস্থিত। মেয়রের ভগিনীর ব্যবহার এত সুন্দর যেন মনে হয় আমাদেরই দেশের কোন স্নেহশীলা নারী। আমার সামান্য অসুবিধাটুকুও কি হইতে পারে তার দিকে প্রখর দৃষ্টি। বলিবার আগেই সমাধানের ব্যবস্থা।

খাবারে হাত দেওয়ার আগে মেয়র একটি ছোট্ট সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। এটি একেবারে নূতন ঠেকিল। পরদিন দুপুরে মেয়র লাঞ্চ দিলেন। সেখানেও সেই প্রার্থনা। ব্রাবাম এবং লী পরিবারের সঙ্গে ঘরোয়া খানার সময় দেখিলাম চার বেলাই একটি না একটি শিশু প্রার্থনা করিল।

সব জায়গায় যেমন এখানেও তাই; প্রথম প্রশ্ন আমাদের দেশ কেমন লাগিতেছে?

এদের সামাজিক ব্যবহারে ভদ্রতা এবং শালীনতার যে দিকটি লক্ষ্য করিয়াছি তার কথা বলিলাম। মেয়রের ভাগিনী বলিলেন—হুঁ, আমাদের দেশের সব লোক কি আর এত ভাল? বদমায়েসদের পাল্লায় তো পড় নাই?

—সম্পূর্ণ অপরিচিত এই দেশে আমি তো একা একা ঘুরি। কোথাও কোন অসুবিধা এখনও বোধ করি নাই। অনেক জায়গায় ইচ্ছা করিয়া বোকা সাজিয়াছি যদিও আমি মোটেই বোকা নই (I pretended to be a fool which most certainly I am not), কিন্তু কোন অভদ্র ব্যবহার তো কোথাও পাই নাই।

মিসেস ম্যাককরমিক হাসিয়া বলিলেন—তোমার বলার ভঙ্গীটি তো চমৎকার। আমরাও এই অল্প সময়েই বুঝিয়া নিয়াছি তুমি মোটেই বোকা নও।

পরদিন মেয়রের লাঞ্চে ডেনটন সিটি গবর্ণমেণ্টের হেল্‌থ অফিসার আবার ঐ প্রশ্ন করিলেন। বলিলাম—তোমাদের ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বড় অদ্ভুত ঠেকিতেছে। আমরা তো জানিতাম তোমরা টাকা ছাড়া কিছু চেন না এবং ধর্ম্মের ধার ধার না। তোমাদের ডলারে In God We Trust—আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি—কথাটা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।

হেল্‌থ অফিসার বেশ রসিক লোক। তিনি প্রথমেই দেখাইয়া দিয়াছিলেন—

এই দেখ আমার টাই, তোমাদের দেশে তৈরী। তিনি বলিলেন—তাহা হইলে দেখিতেই পাইতেছ আমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোকের ধারণা কত ভুল ?

ভাবিলাম—বটে ? দাঁড়াও, জব্দ করছি। বলিলাম—কিন্তু একটা জিনিষ বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের ডলার, আধ ডলার, সিকি ডলার, দশ সেণ্ট, এক সেণ্ট প্রভৃতি সমস্ত মুদ্রায় ঐ বাণী আঁকা আছে কিন্তু তোমাদের পাঁচ, দশ, বিশ বা একশত ডলার নোটে তো সেটি নাই। তোমরা ঈশ্বরকে এক ডলার দিয়া বিশ্বাস কর কিন্তু পাঁচ দশ ডলার দিয়া বিশ্বাস করিতে পার না কেন, এটা তো বুঝিতেছি না ?

খানার টেবিলে অট্টহাসি পড়িয়া গেল। মেয়রের ভগিনী বলিলেন—কেমন জব্দ ? কাল সন্ধ্যা বেলাই তো মিঃ বর্ম্মণ জানাইয়া দিয়াছেন most certainly he is not a fool ?

হেল্‌থ অফিসার অবশ্য সে সময় ছিলেন না।

মেয়রের বাড়ীতে বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ। তাঁর বছর ছয়েকের ছেলে আসিয়া প্রথমেই বলিল—তুমি তো ইণ্ডিয়ান, তোমার টুপি কোথায় ?

ঠিক ধরিতে পারিলাম না ছেলেটি কি বলিতে চায় ? মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া একটি রেড ইণ্ডিয়ান টুপি আনিয়া বলিল— আমি ইণ্ডিয়ান নই কিন্তু এই দেখ আমার টুপি আছে। তারপর রেড ইণ্ডিয়ান টুপি মাথায় এবং পোষাক গায়ে একটি সুন্দর নাচ দেখাইয়া দিল।

উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়া গেলেন বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেসনের প্রধান অধ্যাপক ক্যারল। প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নূতন সাইনবোর্ড দেখিলাম—ধূমপান নিষেধ। টেক্সাস নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার একটি ছাত্রীকে সঙ্গে দিলেন। সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখাইল।

মেয়রের লাঞ্চে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ডেনটন ক্রনিকেল নামক দৈনিকপত্রের সম্পাদক। ডেনটন ক্রনিকেল ঐ সহরের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র। তাহাদের অফিসে গেলাম। সম্পাদক ভারত সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নের ষ্টাণ্ডার্ড রীতিমত উঁচু। নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ওয়াশিংটন হইতে এত দূরে দেশের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে একটি ছোট

সহর অথচ সেখানেও ভারত সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান যথেষ্ট এবং আরও জানিবার আগ্রহ প্রচুর।

লীর বাড়ীতেও সেই একই ধর্ম্মভাব এবং একটি পরিচ্ছন্ন উদার সামাজিক দৃষ্টি। In God We Trust বাণীটির ইতিহাস খুঁজিতেছি এবং তখনও বাহির করিতে পারি নাই, মেয়রের লাঞ্চ টেবিলে মিসেস লী ইহা শুনিয়াছিলেন। তিনি একটি বই দেখাইলেন, উহাতে যেটুকু আছে এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানাতেও ঠিক ততটুকুই আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া আগেই দেখিয়াছি। তথাপি এটি দেখানোর জন্য মিসেস লীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

দুই পরিবারে দুইদিন বাস করিয়া দেখিলাম এরা ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য বাড়ীতে একটি পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। কেহ কোন জিনিষ দিলে দাতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কোন জিনিষ চাহিতে হইলে ভদ্রভাবে চাহিতে হয়, আচার ব্যবহার চালচলনে শালীনতা রক্ষা করিতে হয়—ইত্যাদি সামাজিক শিক্ষা পারিবারিক ব্যবহারের ভিতর দিয়া শিশুরা শিখিতে থাকে। কুড়ি বৎসর আগে কলিকাতায় শিক্ষিত আমেরিকান তরুণদের যে অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি তাহা এই কয় বৎসরে বদলাইয়া গেল কিরূপে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিলাম। এখানে দুই পরিবারে বাস করিয়া তাহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। ছেলেমেয়ে বহুক্ষেত্রে আমাদেরই মত দুষ্ট এবং দুর্দ্দান্ত। স্নেহ এবং শাসন সমানভাবে মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে ফল ফলিবেই, ছেলেমেয়ে মানুষ হইবেই। সাধে রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই—শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।

ভোরবেলা, মিসেস ম্যাককরমিক বিমানঘাঁটিতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা। ঠিক সময়ে তিনি লীর বাড়ীতে গাড়ী নিয়া উপস্থিত। নিজেই ড্রাইভার। বিমানঘাঁটি সেই ৪০ মাইল দূরে ডালেস। প্লেনে না ওঠা পর্য্যন্ত সঙ্গে রহিলেন। প্লেন আসিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীদের ডাক পড়িল। তখন বলিলেন—এবার তবে বিদায়, আমাকে আর ভিতরে যাইতে দিবে না।

মানহাট্টান, কানসাস

টেক্সাসের ডালাস হইতে আসিয়া নামিলাম কানসাসের মানহাট্টান বিমানঘাঁটিতে। নিতে আসিয়াছিলেন কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এবং সায়েন্সের ডীন ডাঃ জন ইয়ং।

মানহাট্টান ডালাসের মত একটি ছোট কিন্তু সুপরিকল্পিত সহর। এখানে তিনটি জিনিষ দেখিলাম—কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি ম্যানেজার টাইপের গভর্ণমেণ্ট এবং রিলি কাউণ্টি গভর্ণমেণ্ট।

আমেরিকান মিউনিসিপাল ব্যবস্থার তিনটি টাইপ—মেয়র টাইপ, কমিশনার টাইপ এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ। প্রথমটি বৃহৎ সহরে প্রচলিত এবং শেষেরটি ছোট সহরে। আজকাল ইউরোপের বহু সহরে সিটি ম্যানেজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

ডাঃ ইয়ং টেলিফোনে সিটি ম্যানেজার হ্বেশের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক করিয়া দিলেন।

মানহাট্টানের অধিবাসী সংখ্যা ২৩ হাজার। এটি একটি বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত এলাকা। ১৯৫১ সালে এখানে সিটি ম্যানেজার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সহরে ১১টি পাবলিক স্কুল আছে, তাদের শিক্ষক সংখ্যা ১৯২। ১৯৬০-এ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪২১৬। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ঐ বৎসর ছিল ৭৫৩৯। সহরে একটি বাইবেল কলেজ আছে। তার ছাত্র সংখ্যা ৬৬। গড়পড়তা মাথা পিছু আয় ১৯৬০-এ ছিল ১৬০৯ ডলার বা ৮০০০ টাকা, ব্যাঙ্কে ডিপজিট ছিল আড়াই কোটি ডলারের উপরে। জীবনযাত্রার ব্যয় এত কম যে মাসে ৭০০ টাকা আয়ে সচ্ছল ভাবে সংসার চালাইয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতেছে। মিউনিসিপাল অফিসে কর্ম্মচারী সংখ্যা ১২৪ ফুল টাইম এবং ২৫ পার্ট টাইম। সিটির ভোটার সংখ্যা ৬৯২৮, তন্মধ্যে গত মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে মাত্র ৫০ শতাংশ ভোট দিয়াছে। অথচ জাতীয় নির্ব্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১০,১৬৫, তার মধ্যে ৯০·৯ শতাংশ ভোট দিয়াছে।

নাগরিকেরা একজন মেয়র এবং পাঁচজন কমিশনার নির্ব্বাচন করে। এঁদের নিয়া গঠিত হয় সিটি কাউন্সিল। সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজার এবং ছয়টি বোর্ড নিযুক্ত করে—পার্ক বোর্ড, সিটি প্লানিং বোর্ড, লাইব্রেরী বোর্ড, কবরখানা বোর্ড, ব্যাণ্ড বোর্ড এবং রিলি কাউন্সিল এফ্ মানহাট্টান সিটি যুক্ত স্বাস্থ্য বোর্ড। রিলি কাউন্টি কাউন্সিল কতকটা আমাদের জেলা বোর্ডের মত। উহারও অফিস মানহাট্টান সিটিতে।

হেবেশে বলিলেন—I am hired and fired by the City Council (সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজারকে ভাড়া করে, আবার প্রয়োজন হইলে তাড়া করিয়া দুর করিয়া দেয়।) সিটি ম্যানেজারের অধীনে পাঁচটি বিভাগ—অর্থ, স্বাস্থ্য, পূর্ত্ত, নিরাপত্তা এবং আইন। এই পাঁচটি বিভাগ পাঁচজন কর্ম্মচারীর হাতে। এঁদের নিযুক্ত করেন সিটি ম্যানেজার। কাউন্সিলের নিকট এঁদের কাজের জন্য দায়ী হইতেন সিটি ম্যানেজার। নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে আছে পুলিশ এবং পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট—এরা বলে পুলিশ জজ। আইন বিভাগের কর্ত্তা জেলা এটর্ণী। সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজারকে পদচ্যুত করিলে এই পাঁচজনও সেই সঙ্গে পদচ্যুত হন।

রিলি কাউন্টি কাউন্সিল দেখাইলেন মিসেস বারট্রিস কিং। এখানে দেখিলাম প্রমীলা রাজ্য। মিসেস কিং কাউন্সিলের ক্লার্ক অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারিণী। ইনি নির্ব্বাচিতা। অন্যান্য অফিসারও প্রায় প্রত্যেকেই মহিলা এবং নির্ব্বাচিতা। শেরিফের সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁর প্রধান কাজ ওয়ারেণ্ট জারী এবং আসামী গ্রেপ্তার। আদালত গৃহ তখন ছিল ফাঁকা। অফিসের কর্ম্মীরা সকলেই মহিলা।

একটি অদ্ভুত জিনিষ এখানে দেখিলাম। ট্যাক্স ধার্য্য কি ভাবে হয় তাহা জানিতে চাহিলে মিসেস কিং লাইব্রেরীর কার্ড ইনডেক্সের মত একটি আলমারীর সামনে নিয়া গেলেন। এক একটি কার্ড টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইলেন। প্রতি কার্ডে একটি পরিবারের নাম ঠিকানা, আয়, বাড়ীর দামী আসবাব পত্র, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লেখা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঠিক এই জিনিষ পড়িয়াছি, এখানে চোখে দেখিলাম। আমরা অতীত নিয়া হায় কি ছিল করি, আর এরা বর্ত্তমানকে নিখুঁত করিয়া তোলে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। উর্ব্বর জমি

ছিল অপর্য্যাপ্ত। যাহারা কৃষিতে নামিয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। বিনামূল্যে এবং নামমাত্র মূল্যে তাহারা জমি পাইয়াছে। পাঁচ টাকায় পাইয়াছে একশত একর। শিক্ষার উন্নতির জন্য আইন হইয়াছিল যে কোথাও কোন কলেজ স্থাপিত হইলে তাহা যাহাতে জমির আয়ে চলিতে পারে তাহার উপযুক্ত জমি কলেজকে দান করা হইবে। এই কলেজগুলির নাম হইয়াছিল Land Grant College। এরূপ কলেজের মধ্যে অনেকগুলি পরবর্ত্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। আমি যখন মানহাট্টানে তখন কানসাস সিটিতে ঐ সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব চলিতেছে। আর দিন দুয়েক আগে গেলে হয়ত ঐ উৎসবে যোগ দিতে পারিতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে আলাপ হইল তিনজন অধ্যাপকের সঙ্গে— ডাঃ ফিলিপ্সার, ডাঃ মিলার, এবং ডাঃ পিকেট। ডাঃ ফিলিপ্সার এবং ডাঃ পিকেট ভারতের কৃষি সম্প্রসারণ স্কীমের পরামর্শদাতা। হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে কৃষি উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে ইহা আগেই জানিতাম। ঐ দুজনের সঙ্গে আলাপে ভারতের প্রতি তাঁহাদের দরদ এবং ভালবাসার পরিচয় পাইলাম।

লাঞ্চে নিয়া গেলেন ডাঃ ইয়ং। ছাত্র ইউনিয়নের রেস্তোরায় খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখিয়াছিলাম অনুরূপ ব্যবস্থা। খাওয়ার টেবিলে ডাঃ ইয়ং একজন কাউন্টি এজেণ্টকে ডাকিলেন। ভদ্রলোকের গলার টাই একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। সরু ফিতা, তাহাতে ঝুলিতেছে একটি গরুর মাথার মডেল।

কাউন্টি এজেণ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে বই পড়িয়াছি। এঁর সঙ্গে আলাপে উপলব্ধি করিলাম বই পড়িয়া কিছুই বুঝি নাই। এটি আমেরিকার এক নিজস্ব বস্তু। প্রত্যেক জেলায় গ্রামে গ্রামে কাউণ্টি এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। এদের নিয়োগ করে এবং বেতন দেয় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। কৃষিকার্য্যে যে সব অসুবিধা চাষীরা অনুভব করে তাহা এদের জানায়। এরা নিজের বিদ্যায় কুলাইলে তখনই তার সমাধান দিয়া দেয়। না কুলাইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আসিয়া সমস্যাটা জানায়। সরকারী কৃষি বিভাগে যায় না। বিশ্ব-বিদ্যালয় উহা নিয়া গবেষণা করে এবং ফল বলিয়া দেয়। কাউন্টি এজেণ্ট

তখন গ্রামের চাষীকে তার সমস্তার সমাধান জানায়। এই বিষয়টি নিয়া পরে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ জন টেলারের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ডাঃ টেলার কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট বিষয়ে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা।

ডাঃ ফিলিঙ্গার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিলেন। বাড়ীর দরজায় মিসেস ফিলিঙ্গার হাত জোড় করিয়া বলিলেন—নমস্তে। খাওয়ার পর একটি খাতা বাহির করিলেন। তাহাতে বহু ভারতীয়ের স্বাক্ষর এবং মন্তব্য রহিয়াছে।

পরদিন সন্ধ্যায় ডিনারের নিমন্ত্রণ করিলেন ডাঃ মিলার। টেবিলে বসিয়া দেখি হলদে রং-এর ভাত। মিসেস মিলার বলিলেন—বলতো এটা কি? কিসের রং?

ভাবিতেছি—হলুদ দিয়াছে না কি? আমি কিছু বলার আগেই বলিলেন—এটা তোমাদের দেশের পিলাও। রংটা জাফরাণের।

পোলাও রান্না সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলাম রংটা ঠিক জিনিষ দিয়াই হইয়াছে কিন্তু পিলাউ তৈরি করিতে আরও অনেক জিনিষ লাগে।

ভাইসচ্যান্সেলার শতবার্ষিকীতে কানসাস সিটি গিয়াছিলেন। ফিরিয়াছেন শুনিয়া পরদিন দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সঙ্গে গেলেন ডাঃ পিকেট। ভাইসচ্যান্সেলারের সেক্রেটারী এক মহিলা আসিয়া বলিয়া গেলেন—প্রেসিডেণ্ট টেলিফোনে কথা বলিতেছেন। অনেকক্ষণ যায়, ডাক আর আসে না। দুজনেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছি এমন সময় ভাইসচ্যান্সেলার নিজেই দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়া নিলেন। বলিলেন—এমন মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম! এক দূর পাল্লার টেলিফোন (আমাদের ট্রাঙ্ককল) আসিয়াছিল, আমি যত থামিতে চাই, ওপারের লোক আর থামে না। অনেক দেরী করিয়া দিল।

তখন বেলা প্রায় একটা বাজে। তিনটায় সানফ্রান্সিস্কো রওনা হইতে হইবে। ডাঃ পিকেট বিমানঘাটিতে পৌঁছিয়া দিয়া ট্রেণ ধরিবেন। তিনি যাইবেন পুত্রের নিকট পার্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরও ট্রেণ ঐ সময়। মাঝখানে শুধু খাওয়ার সময়টুকু।

ভাইসচ্যান্সেলারের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী নিয়া আলোচনা করিলাম।

বলিলাম—আপনাদের গবর্ণমেণ্ট ভারতে নানাভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু কয়েকটি প্রধান সহরে গোটা কয়েক পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী তাঁহারা স্থাপন করিতেছেন না কেন বুঝি না। আমরা এই প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছি কিন্তু কোথায় গিয়া উহা আটকাইয়া পড়িতেছে বুঝিতেছি না। দীর্ঘ আলোচনার সময় ছিল না। তিনি প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন এ বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ডাঃ পিকেটের সঙ্গে রওনা হইলাম হোটেলে। পথে আসিতে আসিতে পিকেট বলিলেন—আমার খুব দুঃখ হইতেছে যে তোমাকে বাড়ী নিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না, রেস্তোঁরায় নিয়া যাইতেছি। আজ একুশ দিন হইল আমার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই। সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া রহিয়াছে। ছেলে পার্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। তাহারই নিকট যাইব।

হোটেলের নীচেই রেস্তোঁরা। পিকেট মুরগীর রোষ্ট অর্ডার দিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া পাশের ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইতে গেলেন। টাকা নিয়া ফিরিয়া আসিতে মিনিট তিনেকও লাগিল না। এদিকে খাবার আর আসে না। পিকেট বয়কে ডাকিয়া বলিলেন—ওহে, মুরগী কি কিনতে গেছে না মারতে গেছে? বয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—এই যে দিচ্ছি।

আহারান্তে ছুটিলাম বিমানঘাঁটি। পৌঁছিয়া দিয়া পিকেট বলিলেন—আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমার ট্রেণের সময় প্রায় হইয়াছে। কোনমতে গিয়া ধরিতে পারিব।

সানফ্রান্সিস্কো

সানফ্রান্সিস্কো পৌঁছিলাম। পথে ডেনভারে প্লেন বদল করিতে হইল। মানহাট্টান (কানসাস) হইতে যখন রওনা হই তখন এমন কিছু শীত ছিল না। আকাশও পরিষ্কার ছিল। বর্ষাতি এবং গরম সোয়েটার দুই-ই লগেজে দিয়া দিয়াছি। ডেনভারে প্লেন নামিবার সময় দেখি বাইরে বৃষ্টি। প্রমাদ গণিলাম—মাঠ হইতে এয়ারপোর্টের ঘরে ঢুকিতে তো ভিজিয়া যাইব। উপায় নাই। প্লেন হইতে বাহির হইয়া দেখি বৃষ্টি নয়, বরফ পড়িতেছে। মাটি সাদা হইয়া গিয়াছে। নামিবার আগেই এয়ার হোস্টেস সতর্ক করিয়া দিল—সাবধানে পা ফেলিবেন, পিছলাইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। বুঝিলাম, দৌড়িয়া যাওয়ার আশা বৃথা। এরই মধ্যে এয়ারপোর্টের শেডে ঢুকিলাম। এয়ারকণ্ডিশন হলে পৌঁছিতে প্রায় মিনিট দশেক লাগিল। ততক্ষণে দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি প্রায় সুরু হয় আর কি। কোনমতে সামলাইয়া নিলাম। আধ ঘণ্টাখানেক পরে আবার সেই উপায়ে নূতন প্লেনে আরোহন।

সানফ্রান্সিস্কো পৌঁছিলাম। তখন বাইরে পরিষ্কার। এখানে যাত্রী নামাইবার কায়দা আলাদা। আমাদের দেশের বা অন্যান্য জায়গার মত সিঁড়ি দিয়া ফাঁকা ময়দানে নামায় না। প্লেনের দুই দরজায় দুটি খাঁচা সোজা আসিয়া ফিট করিয়া গেল। তারই ভিতর দিয়া এয়ারপোর্টে ঢুকিলাম। বাইরের জল বা বরফ বা ঠাণ্ডা হাওয়া কোনটাই এতে গায়ে লাগে না।

এখানে থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে সহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল ম্যাঙ্কস-এ। হোটেলে পৌঁছিলাম রাত্রি সাড়ে নয়টা।

সকালে বাহির হইলাম। সামনেই সুন্দর একটি পার্ক। সেটি একাধারে পার্ক এবং মোটরগাড়ী পার্কিং-এর জায়গা। পার্কের নীচে মাটির তলায় শুনিলাম চার তলা গাড়ী রাখার গ্যারেজ। আমেরিকার প্রতিটি সহরেই গাড়ী রাখার জায়গা এক প্রচণ্ড সমস্যা। বিনা পয়সায় গাড়ী রাখার জায়গা নাই বলিলেই চলে। ঘণ্টায় কম পক্ষে এক টাকা ভাড়া দিতে হয়।

সানফ্রান্সিস্কোর রাস্তাগুলি বেজায় উঁচু নীচু। আমাদের মুসৌরি বা দার্জিলিং-এর মত বলিলেও কম বলা হয়। অধিকাংশ রাস্তাই প্রায় ৪৫ ডিগ্রী খাড়া। তারই মধ্যে সকল প্রকার গাড়ী—বাস, ট্রলি বাস এবং ট্রাম। ট্রামকে এরা বলে Cable Car। উঁচু নীচু রাস্তার ট্রাম খুব ছোট। সমতল রাস্তার ট্রাম কিছুটা বড়, তবে কোথাও এক গাড়ীর বেশী নয়। সাধারণ বাস এবং ট্রলি বাস বা ইলেকট্রিক বাস সমতল এবং খাড়া উঁচু নীচু উভয় রাস্তাতেই চলে।

হোটেলের সামনে রেস্তোঁরা। হোটেল মালিক নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় বুঝিলাম সে জর্ম্মাণ। বাহির হইবার সময় জর্ম্মাণ ভাষায় অভিবাদন করিতে মহা খুসী। এই কটা দিন কলিকাতায় জর্ম্মাণ ক্লাস কামাই হইতেছে। সে দুঃখ এর সঙ্গে কথা বলিয়া খানিকটা মিটাইয়া নিলাম।

সোমবার সকালে ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সাড়ে দশটায় বাস ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এক মহিলা উপস্থিত। সানফ্রান্সিস্কো হইতে মাইল চল্লিশেকের পথ। প্রথমে গেলাম হুভার ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ সৃভোরাকোস্কি-র (Dr. Sworakowski) কাছে। এটি ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার। মিনিট দশেকের মধ্যেই বেশ জমিয়া উঠিল। এখানে ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা ও লিফলেট সংগ্রহের কি ব্যবস্থা আছে জানিতে চাহিবামাত্র ভদ্রলোক মহা খুসী। বলিলেন, ঠিক ঐ জিনিষগুলিই তাঁরা সংগ্রহ করেন। আদ্রিয়াতিক উপসাগর তীরবর্ত্তী ফিউম সহর নিয়া যখন আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ পাকিয়া উঠে তখন ঐ স্থান সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য একমাত্র এখানেই পাওয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর বহু দেশে তাঁদের লোক আছে। তাদের কাছে ঠিকানা ছাপা টিকিট আঁটা খাম থাকে। যে কোন পুস্তিকা বা লিফলেট প্রকাশিত হইলেই তাহা পাঠাইয়া দেওয়া উহাদের কাজ। পত্রিকার অধিকাংশই এখন মাইক্রোফিল্ম করিয়া রাখা হইতেছে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এই ভাবে করা হয় কি না তাহা জানিতে চাহিলে বলিলেন—ভারত ও পাকিস্থান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা এটা করেন না। তাঁদের হাতে কাগজপত্র পড়িলে সেখানে পাঠাইয়া দেন। বিভিন্ন দেশে জীবন যাত্রার মান তুলনা করিবার জন্য তাঁরা কোন্ ফরমুলা প্রয়োগ করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—প্রধানতঃ তিনটি জিনিষের ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব নিলে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার মান বুঝা যায়।

জিনিষ তিনটি হইতেছে লবণ, চিনি এবং মাংস। খুব গরীব লোকের খাদ্য অত্যন্ত কম, সুতরাং লবণ ব্যবহার খুব কম। অবস্থা একটু ভাল হইলেই তাহারা সব্জী সিদ্ধ খাইবে, লবণ বেশী লাগিবে। তারপর মাংস এবং চিনি চাহিবে। যাদের খাদ্য শুধু নুন ভাত তাদের বেলায় এই ফরমুলা সব্জী সেদ্ধ এবং ভাতের সঙ্গে খাটিবে কি না—এই প্রশ্ন তুলিতে না তুলিতে সেই মহিলা তাড়া দিয়া পাঠাইলেন। পরবর্ত্তী সাক্ষাৎকারে দেরী হইয়া যাইতেছে। ডাঃ সৃভোরাকোস্কি রীতিমত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মহিলাকে বলিলেন—আমাদের এক জমাট আলোচনার মাঝখানে আপনি রসভঙ্গ করিলেন। নামিয়া বাহির হইবার সময় তিনি একটি ভূগর্ভস্থ ঘরে নিয়া গেলেন। জর্ম্মাণ বন্দীশিবিরে হিটলার শাসনে যাহারা আটক ছিল এখানে তাহাদের নিজের হাতে লেখা বন্দীদশার বিবরণ সাজানো আছে। ইতিহাসের এই প্রামাণ্য প্রাথমিক এবং অতিশয় মূল্যবান দলিল তাঁরা অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরে আসিলে মহিলা প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপারখানা কি? আমি এ যাবৎ বহু লোককে এঁর কাছে নিয়ে গেছি, কাউকে দশ মিনিটের বেশী এঁর ঘরে থাকতে দেখি নাই। আমরা তো জানি ইনি কথাই বলতে চান না। অথচ আপনাকে নিয়ে দেড় ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, আপনাকে ছাড়তে চান না।

মুখে বলিলাম—তা আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবিলাম—এ রসের তুমি কি বুঝিবে? যারা আসে তারা উপর উপর দেখে, গভীরে যাইতে চায় না, ইনিও আরাম পান না। আমি প্রায় ২৫ বছর গবেষণা নিয়া আছি এবং এই ধারায় কাজ করিতেছি। আমাদের চিন্তাধারা এক খাতে প্রবাহিত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আগ্রহ।

হিউম্যানিটিজ এবং দর্শনের অধ্যাপক ডঃ জেফরি স্মিথের (Dr. Jeffry Smith) ঘরে যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। লাঞ্চের সময় হইয়া গিয়াছে। দুই চারিটি কথার পরেই রওনা হইলাম লাঞ্চে। আমি সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি। আরও অনেকগুলি বিভাগের অধ্যাপকেরা লাঞ্চে আসিবেন। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—হুমায়ুন কবীরকে চেনেন?

—নিশ্চয়।

—অক্সফোর্ডে আমরা সহপাঠী ছিলাম। শুনেছিলাম সে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী হয়েছে।

—হাঁ, এখনও সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের মন্ত্রী আছেন।

বিদেশীর কাছে কবীর সাহেবের কীর্ত্তির কথা আর ভাঙ্গিলাম না, ভাল কথাই বলিলাম।

খাওয়ার ঘরে দেখি প্রায় জনা কুড়ি অধ্যাপক উপস্থিত। পরিচয় পর্ব্ব সমাধা হইল। অধ্যাপক ইউষ্টিস (Dr. R. H. Eustis) একটি প্রবন্ধ পড়িলেন। সেমিনার এবং লাঞ্চ মিটিং আজকাল এখানকার বিদ্যোৎসাহীদের সর্ব্বপ্রধান মিলন ক্ষেত্র। বার্লিন, আণবিক বোমা পরীক্ষা, কঙ্গো, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রভৃতি নিয়া সারা পৃথিবীতে যে উদ্বেগ দেখা গিয়াছে তাহা কিরূপে দূর করা যায় এবং আমেরিকা তাহাতে কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রবন্ধ পাঠের পর সুরু হইল খাওয়া এবং আলোচনা। প্রায় আধ ঘণ্টা শুনিবার পর আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনায় যোগ দিলাম। এখানে সর্ব্বত্র একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, এশিয়া, আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার আগ্রহ প্রবল আছে, উদ্যম খুব বেশী আছে, কিন্তু স্থানীয় অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ বিষয়েই ভুল করে। আমেরিকা সম্বন্ধে বহু বই পড়িয়াছি কিন্তু এ দেশে আসিয়া বুঝিয়াছি এদের সম্বন্ধে আমাদেরও জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ। কোন দেশের লোকের পক্ষেই বিদেশ সম্বন্ধে বই ও পত্রিকার সাহায্যে সঠিক জ্ঞান লাভ করা অতিশয় দুরূহ। সভা এত জমিয়া উঠিল যে একটায় উহা ভাঙ্গিবার কথা, ১-৪৫ মিনিটে সভা ভঙ্গ হইল। দুই তিন জন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বলিলেন—আমরা আপনাকে বলিতে বলিব কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, আপনি নিজেই আগাইয়া আসিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। এশিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ ইহা আমরা অনুভব করি। এত পরিষ্কার ভাবে জানিবার সুযোগ লাভ আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। ডাঃ স্মিথ খুব খুসী হইলেন। বলিলেন—আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের সময় হইল না, কিন্তু আপনি আলোচনায় যোগ দিয়া খুব ভাল করিয়াছেন।

বাহিরে সেই মহিলা রীতিমত ছটফট করিতেছেন। দেড়টায় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ থিওডোর রোজাকের (Dr. Theodore Roszak) কাছে যাওয়ার কথা। বেলা দুইটায় তাঁর ক্লাস আছে। তখন একটা পঞ্চাশ।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে তাঁর ঘরে পৌঁছিলাম। মিনিট দশেক মাত্র আলাপ হইল। ঘণ্টাগুলা এত ছোট বলিয়া খুব দুঃখ হইতেছিল।

ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ইউজিন ষ্টেলির (Dr. Eugine Staley) সঙ্গে সাক্ষাতের কথা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Henry Aubrey বলিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদ নিয়া জানিয়াছিলাম তিনি তখন এশিয়ায়। ডাঃ স্মিথকে বলিলাম—একটু খবর নিয়া দেখিবেন কি ডাঃ ষ্টেলি ফিরিয়াছেন কি না। জানাইলেন, তিনি ফিরিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে সময় ঠিক হইল শুক্রবার সকাল ১১ টা।

শুক্রবার বেলা ১২টায় চিকাগো রওনা হইবার কথা। ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। শনিবার চিকাগোতে কোন সাক্ষাৎকার নাই, আছে শুধু স্থানীয় রম্যস্থান দর্শন। চিকাগো হোটেলে সংবাদ দিয়া দিলাম—আমি শুক্রবারের স্থলে শনিবার পৌঁছিব। রম্যস্থান দর্শন অপেক্ষা ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে আলাপ অনেক বেশী মূল্যবান। ভারত সরকারের কুটীর শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ-দাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ডাঃ ষ্টেলি।

মঙ্গলবার সকালে সেফওয়ে ষ্টোর। সানফ্রান্সিস্কো হইতে মাইল ত্রিশেক দূরে ওকল্যাণ্ড সহর। সেখানে এই ষ্টোর এবং কাইজার এলুমিনিয়াম কারখানা। সানফ্রান্সিস্কো এবং ওকল্যাণ্ডের মাঝখানে প্রায় দশ মাইল উপসাগর। তার উপর দিয়া পুল তৈরি করিয়াছে গোটা ছয়েক। একটি পুল রিজার্ভ করা আছে শুধু গাড়ীর জন্য, সেটাতে বাস বা ট্রাকের প্রবেশ নিষেধ।

সেফওয়ে ষ্টোর (Safeway Store) আমেরিকার বৃহত্তম চেইন ষ্টোর (Chain Store)। এখানে সব্জী, ফল, মাছ, মাংস, ডিম, মসলা, মাখন, মার্গারিণ প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্য ও রন্ধন সামগ্রী বিক্রয় হয়। সমগ্র আমেরিকা জুড়িয়া এদের দোকান। ওকল্যাণ্ড এদের প্রধান কেন্দ্র। এদের সব প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ভাইস প্রেসিডেন্ট, তা সে সেফওয়ে ষ্টোরের মত মুদিখানাই হউক, কাইজার এলুমিনিয়ামের মত কারখানাই হউক বা ফিলাডেলফিয়া ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মত ব্যাঙ্কই হউক। ষ্টোরের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁদের অর্থনীতি গবেষক বমগার্টকে (Baumgart) ডাকিয়া তাঁর সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। আমেরিকান চেইন ষ্টোর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব কম। সেটা যে কত কম এখানে দুই ঘণ্টা থাকিয়া তাহা অনুভব করিলাম। এরা যে দামে জিনিষ কেনে

১৪

তার উপর মাত্র তিন পার্সেণ্ট বেশীতে উহা বিক্রয় করে। খরচ ও ট্যাক্স বাদে এদের বিক্রয়ের তুলনায় নীট লাভ দাঁড়ায় দেড় পার্সেণ্ট। এটাই শেয়ারের তুলনায় শেষ পর্য্যন্ত গিয়া প্রায় ১৫ পার্সেণ্ট লভ্যাংশে দাঁড়ায়। মোট বিক্রয় যতদূর মনে পড়িতেছে প্রায় হাজার কোটি টাকা। এদের মত আরও চেইন ষ্টোর আছে। সকলে চাষীর জিনিষ কেনে, এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, সমবায় সমিতিরাও কম শক্তিশালী নয়। সুতরাং চাষীকে অন্যায় দামে বেচিতে বাধ্য করার ক্ষমতা কাহারো নাই। অপর দিকে ক্রেতা সাধারণের লাভ। চাষীর নিকট এরা যে দামে কেনে তার উপর মাত্র ৩ পার্সেণ্ট বেশী দিয়া ক্রেতারা জিনিষ পায়। আমাদের মত খুচরা বাজার এদেশে নাই। চাষীর নিকট জলের দামে কিনিয়া চড়াদরে বেচিবার ফড়িয়া বৃত্তিও নাই।

মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সমাধা হইল।

খাওয়ার টেবিলে ষ্টোরের কর্ত্তারা ছাড়া চারজন এটর্ণী উপস্থিত ছিলেন। কি একটা বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাঁহারা আসিয়াছিলেন। ভারত সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের পর মাসাধিক কাল আমেরিকা ঘুরিয়া তাঁদের দেশ সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হইল তাহা তাঁহারা জানিতে চাহিলেন। বলিলাম—আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের পরিচয়ের প্রধান সূত্র আপনাদের হলিউড ফিল্ম। উহাতে আমরা দেখি এখানে বিরাট ধনী ছাড়া লোক নাই; খুন, জখম, ব্যাঙ্ক মারা প্রভৃতি আপনাদের পেশা, ডলার পূজা ছাড়া আপনাদের কোন ধর্ম্ম নাই ইত্যাদি।

—ওঃ, এই মুভির কথা আর বলিবেন না; এরা আমাদের সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছড়াইতেছে তা আর বলিবার নয়।

এদের কোণঠাসা করিবার জন্য আমি দুটি অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছি। দুইটি প্রশ্ন এদের বহু জায়গায় করিয়াছি, একজনও তার উত্তর দিতে পারে নাই এবং আমার নিকট মত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সেই অস্ত্রই ছাড়িলাম। বলিলাম—আমি প্রথম দিন ফিলাডেলফিয়ায় নামিয়া যখন নোট ভাঙ্গাইলাম তখন লক্ষ্য করিলাম আপনাদের মুদ্রায় একটি বাণী রহিয়াছে—In God We Trust, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এটা আমাদের জীবনের মন্ত্র। আমাদের ঈশোপনিষদের শিক্ষা এই যে, যাহা কিছু অর্জ্জন করিবে তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে, তাঁর নিকট হইতে উহা প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভোগ করিবে, অপরের ধনে ঈর্ষ্যা করিবে না। এই জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী আহারে বসিয়া আগে পাতের পাশে অন্নব্যঞ্জনের

অংশ ও জল নিবেদন করিয়া তারপর ভোজন আরম্ভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরকে অপবিত্র অশুদ্ধ জিনিষ নিবেদন করা যায় না। আমার উপার্জ্জিত অর্থে যে আহার্য্য সামগ্রী আসিয়াছে তাহা পবিত্র হইতে হইবে, সুতরাং উপার্জ্জন পদ্ধতি এবং কাজ পবিত্র হওয়া চাই। তোমাদের মুদ্রায় ঐ বাণী দেখিয়া আমার মনে হইতেছে তোমরাও তোমাদের ডলার আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করিতেছ এবং তার পরে সেই ডলার ভোগ করিতেছ। এখন আমার প্রশ্ন—এই বাণী করে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কে উহা করিয়াছেন এবং কেন করিয়াছেন?

সবাই চুপ। একজন বলিলেন—আমাদের মুদ্রায় প্রথম হইতেই উহা ছিল।

—না, ছিল না। আপনাদের মুদ্রায় প্রথম বাণী ছিল mind your own business, নিজের চরকায় তেল দাও। উহা কবে এবং কেন বদলানো হইল তাহাই আমি জানিতে চাই।

একেবারে জব্দ। কারো মুখে আর কথা নাই। তখন বলিলাম—আমি এই পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছি যে, ১৮৬৪ সালে তোমাদের ডবল সেণ্ট মুদ্রায় এই বাণী প্রথম অঙ্কিত হয়, তারপর ঐ মুদ্রা বাতিল হইয়া যায়। অন্য মুদ্রাগুলিতে উহা তখন হইতেই আসিল অথবা পরে আসিল তাহাই আমি জানিতে চাই।

সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল—তাঁরা জানেন না। অনেক জায়গায় এই প্রশ্ন করিয়াছি। নিউইয়র্কে "টাইম" এবং "লাইফ" আফিসে উহার সম্পাদকেরা লাঞ্চ খাওয়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁরাও উত্তর দিতে পারেন নাই। মিসেস কোশলাণ্ডের সঙ্গে ইহা নিয়া আলোচনার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি এই বাণী এই দৃষ্টিতে দেখি নাই, কিন্তু ইহার গুরুত্ব আছে তাহা জানি। বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার জার্ম্মেণী হইতে কয়েকটি মহিলা আমাদের দেশ দেখিতে আসেন এবং লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর উহার ভার পড়ে। আমরা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেম্বারলেইনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জর্ম্মাণ মহিলাদের কি দেখানো যায়। তিনি পকেট হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া ঠিক ঐ বাণীটি আমাদের দেখান এবং বলেন যে, উহাদিগকে বলিও আমেরিকান ডেমোক্রাসির মূলমন্ত্র এই মুদ্রা এবং এই বাণী। আমরা উহার তাৎপর্য্য এতটা বুঝি নাই এবং উহা বুঝাইয়া দেওয়ার

কথা তাঁহাকেও বলিতে সাহস করি নাই। অধ্যাপক চেম্বারলেইন কি বলিতে চাহিয়াছিলেন আজ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।"

আনন্দ হইল। ভাবিলাম দেশে ফেরার পথে আবার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তো যাইবই। সেখানকার অধ্যাপকেরা বার বার বলিয়া দিয়াছেন—এ হইল না, এত কম সময় থাকিলে চলিবে না, ফেরার পথে নিশ্চয় আসিতে হইবে। তখন অধ্যাপক চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে এবং তাঁর নিকট উহা জানিয়া নিব।

মিসেস কোশল্যাও বলিলেন—দুঃখের বিষয় তিনি ইহলোকে নাই। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ফিরিবার পথে ফিলাডেলফিয়া টাঁকশালে উহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। উহাই আমেরিকার আদি টাঁকশাল। আমি যেটুকু জানি তার বেশী তাঁরাও বলিতে পারেন নাই।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। বলিলাম—হোয়াইট হাউসে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। আপনাদের দেশের শীলমোহর হইতেছে একটি ঈগল, তার ডান থাবায় এক গোছা তীর, বাম থাবায় এক গোছা ওলিভ শাখা। একটি যুদ্ধের, অপরটি শান্তির প্রতীক। ঈগলের মুখ প্রথমে ছিল ডান থাবা অর্থাৎ যুদ্ধের দিকে ফেরানো, আধুনিক শীলে উহা বামদিকে অর্থাৎ শান্তির দিকে ফিরিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কবে হইয়াছে এবং আমি যে অর্থে ইহা ধরিতেছি সেই অর্থে উহা হইয়াছে কিনা।

সবাই একেবারে চুপ। কেহ আর কোন কথাই বলিতে সাহস করিল না। তখন বলিলাম—ওয়াশিংটনে আমেরিকান ঐতিহাসিক এসোসিয়েসনের একজিকিউটিভ ডিরেক্টরের নিকট ইহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—প্রেসিডেন্ট টুম্যানের আমলে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবে উহা পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তন (change just for a change) অথবা আমি যে অর্থে ধরিয়াছি সেই অর্থে হইয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

এবার সকলেই বলিলেন—আগে আমরা আপনার নিকট ভারতের কথা শুনিয়াছি। এখন দেখিতেছি আমাদের ইতিহাসও আপনি আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

ডাইনিং হল অনেক আগেই খালি হইয়া গিয়াছে। দুইটা বাজিয়াছে।

কাইজার এলুমিনিয়ামের লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তখন ভোজসভা ভঙ্গ হইল।

বেলা ঠিক দুইটায় কাইজার এলুমিনিয়ামের মিঃ রিয়ার্ডসজি নিতে আসিলেন। ওকল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সুন্দর বাড়ী এদের। বাড়ীটিতে এলুমিনিয়ামের খেলা। সারাটা বাড়ী এলুমিনিয়ামের তৈরি বলিলেই চলে। অনেকের ভিজিটিং কার্ডও এলুমিনিয়ামের। এদের বড়কর্তা ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ শোয়ার্জের (Mr. Schwarz) কাছে নিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলেন—বিড়লাকে চেনেন?

—খুব জানি।

—আমরা তাদের সঙ্গে অংশীদারিতে ভারতে এলুমিনিয়াম কারখানা তৈরি করছি।

—জানি। তার আগে আপনাদেরই ইস্পাত কারখানা টাটাদের কারখানা সম্প্রসারণের কাজ করেছে।

বাড়ীটির সর্ব্বোচ্চ তলায় একটি কোণের ঘরে বসিয়া কথা হইতেছে। ২৫ না ৩০ তলা মনে নাই। দূরে উপসাগর। তার উপরে পুল দিয়া জলস্রোতের মত গাড়ী ছুটিয়াছে। চা খাওয়ার পর তাঁর ঘর হইতে বাহির হইলাম।

এবার গেলাম টেকনিকাল ডিরেক্টরের কাছে। তাঁর কাছে এলুমিনিয়ামের দুইটি নূতন ব্যবহারের কথা শিখিলাম। আমরা এখনও এলুমিনিয়াম ব্যবহারের বাসন যুগে (utensils age) রহিয়াছি। এদের কাছে এলুমিনিয়ামের প্রধান ব্যবহার হইতেছে বিদ্যুতের তার এবং রেলের মালগাড়ী নির্ম্মাণ। তামার তারের বদলে এখানে এলুমিনিয়াম তার ব্যবহৃত হইতেছে। ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তার চোরেরা এতে মহা অসুবিধায় পড়ে গেছে। তামার তার চুরিতে খাটুনি এবং ঝুঁকি পোষায়, এতে একেবারেই পোষায় না। মালগাড়ী তৈরিতে এলুমিনিয়াম ব্যবহারে লাভ এই যে, গাড়ীর নিজের ওজন কম হয় বলে বেশী মাল নিতে পারে।

এই দুই প্রকার ব্যবহারে আমরা কোথায় আছি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—আপনারা প্রথমটি আরম্ভ করেন নাই তবে দ্বিতীয়টি ধরেছেন। ভারত সরকার এলুমিনিয়ামের মালগাড়ী তৈরিতে হাত দিয়েছেন।

বুধবার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সকাল হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। একে দারুণ শীত তায় বৃষ্টি, এ যে কি চীজ তাহা এখানে না আসিলে বুঝিতাম না। আমাদের মাঘ মাসে বৃষ্টি তো এর তুলনায় অনেক ভাল। তৎসত্ত্বেও বাহির হইলাম। কারণ এদিন ফসকাইলে আর কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হইবে না। পরদিন বৃহস্পতিবার, এদের Thanksgiving Day। সর্ব্বত্র ছুটি। শুক্রবার ডাঃ ষ্টেলি। শনিবার চিকাগো যাত্রা। শুক্রবার ছুটি সারিবার উপায় নাই—ষ্টানফোর্ড এবং বার্কলি উল্টা দিকে। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলিতে। এটাও সানফ্রান্সিস্কো হইতে মাইল ত্রিশেক।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সিতে উঠিলাম। বাস ষ্টেশনে নামিলাম। ওয়াটারপ্রুফ আছে, মাথা বাঁচাইবার টুপি বা ছাতা নাই। এই দুই জায়গা সামলাইলাম। বার্কলিতে বাস হইতে নামিলাম। তখন বৃষ্টি খুব কম। সামনেই একটি ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর। সেখানে ঢুকিয়া প্রথমেই একটি ছাতা কিনিলাম। এই ছাতা মারফৎ আমেরিকান অর্থনীতির একটি দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হইল। ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়াছে। ছাতা খুলিবার প্রয়োজন হইল না।

ট্যাক্সির জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়াইলাম। একটিও মিলিল না। লক্ষ্য করিলাম রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি ডাকার টেলিফোন। টেলিফোন করিলে দশ মিনিট বাদে ট্যাক্সি আসিল। থামিতে না থামিতে এক মহিলা তড়াক করিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। ড্রাইভারকে বলিলাম—আমি তোমাকে টেলিফোনে ডাকিয়াছি। সে বলিল—কে ডাকিয়াছে বা কে আগে ডাকিয়াছেন আমি কিরূপে বুঝিব ?

ঠিকই তো। আবার ডাকিলাম। এবার এক ভদ্রলোক ঢুকিয়া পড়িলেন। তৃতীয়বার ডাকিয়া ছাতা বাগাইয়া তৈরি হইয়া রহিলাম। আর ভদ্রতা নয়। যত দেরী হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় ততই কমিয়া আসিতেছে। এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা সানফ্রান্সিস্কো সহর না দেখাইয়া ছাড়িবে না। দুইটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ী পাঠাইবে। এবার ট্যাক্সি আসিলে অন্য লোককে ধাক্কা দিয়াই ঢুকিয়া পড়িলাম। তখন বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা।

প্রথম সাক্ষাৎ ডাঃ টেলারের সঙ্গে। ডাঃ টেলার আমাদের কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা। প্রবীণ মানুষ, সত্যিকারের পণ্ডিত লোক। গ্রাম্য অর্থনীতিতে জ্ঞান গভীর। এর আগে কানসাস ষ্টেট

বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের কাউন্টি এজেন্ট সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার এবং এখানকার কাউন্টি এজেন্টদের তুলনা করিতেই তিনি খুব আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। গ্রাম্য অর্থনীতি বিষয়ে নূতন একটি বই বাহির হইয়াছে। সেটির খুব প্রশংসা করিলেন এবং পড়িতে বলিলেন। এশিয়াম সার্ভে পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি দিয়া উহার একটি প্রবন্ধ পড়িতে বলিলেন। হোটেলে ফিরিয়াই সেটি পড়িলাম এবং কেন দিয়াছেন তাহা বুঝিলাম। অনুভব করিলাম—কমুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট মারফৎ আমাদের গ্রামের উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেন হয় নাই, গ্রাম্য রাজনীতি উহার কতটা অন্তরায় হইয়াছে এই সব কথাই তিনিও চিন্তা করিয়াছেন। আমাকে বহু প্রশ্ন করিয়াছেন, তার তাৎপর্য্য ঐ প্রবন্ধ পড়ার পর বুঝিলাম।

আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার কাউণ্টি এজেণ্ট আদর্শে কল্পনা করা হইয়াছে কিন্তু কাউণ্টি এজেণ্টের সঙ্গে তাঁর দুই দিক দিয়া প্রভেদ। প্রথমতঃ, গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ ছাড়া অজস্র মামুলী সরকারী কাজ তাঁর উপর চাপানো হইয়াছে। ডাঃ টেলারকে যখন বলিলাম যে, আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসারকে ভোটার তালিকা সংশোধন করিতে হয়, পাশপোর্টের দরখাস্ত করিলে তার সম্পত্তি অনুসন্ধান করিতে হয়—তখন তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। বলিলাম—আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার আসল কাজে মন দিতে সময় পান না এবং গ্রামের লোকও বুঝিতে পারে না কোন্‌টা তাঁর আসল কাজ। আর পাঁচ রকমের সরকারী কর্ম্মচারীর মত তাঁহাকেও একটি সাধারণ কর্ম্মচারীতে পরিণত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনরূপ সম্পর্ক বা সংযোগ নাই। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ এক্সটেনসন সার্ভিস আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। একটা দেশের বিশেষভাবে গ্রামের উন্নতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কতদূর উন্নতি করিতে পারে আমেরিকা না গেলে তাহা কল্পনা করিতে পারিতাম না। ডাঃ টেলার বলিলেন —আমাদের এই ত্রুটি তাঁহারাও লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার আমাদের দেশে আদৌ কঠিন নয়। ইহার জন্য যে চেষ্টা দরকার এবং যে ধরণের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া আবশ্যক তাহার সূচনা এখনও বাঙ্গালাদেশে হয় নাই। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরণের কাজ কতকটা আরম্ভ করিয়াছে। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে।

ইতিমধ্যে তাঁর সেক্রেটারী দুই তিনবার বলিয়া গিয়াছেন যে, ডাঃ মেজিরোর (Dr. Mezirow) সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় পার হইয়া গিয়াছে। শেষবার বিরক্ত হইয়া সেক্রেটারীকে বলিলেন—ঠিক আছে, আমি লাঞ্চের সময় এদের দুজনকে মিলিয়ে দেব।

তিনি সঙ্গে নিয়া লাঞ্চের জায়গায় পৌঁছিয়া দিলেন। ডাঃ মেজিরোকে নিজেই খুঁজিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। ডাঃ মেজিরো দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার অনেকগুলি দেশের পরামর্শদাতা। প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁর সঙ্গেও আলাপ হইল। ভারত সম্বন্ধে গবেষণায় কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তার বহু পরিচয় তাহাদের লেখার ও বইয়ের ভিতর দিয়া পাইয়াছি। এখানে আসিয়া যেন তার সারমর্ম্ম অনুভব করিলাম।

বেলা দুইটা। গাড়ী নিয়া ড্রাইভার হাজির। ড্রাইভার এক মহিলা। সানফ্রান্সিস্কো সহর বাস্তবিকই দেখার মত সহর। একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর কলম্বসের এক বিশাল মূর্ত্তি। কলম্বস এদের কাছে এক মস্ত পুরুষ। ১২ই অক্টোবর এরা কলম্বস দিবস পালন করে। ঐদিন দেশের সর্ব্বত্র ছুটি থাকে। বিকালের দিকে বড় সহরগুলিতে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হয়। বোষ্টনে এই শোভাযাত্রা দেখিয়াছি। মাইল দুয়েক লম্বা। সাজসজ্জা, জৌলুষ বর্ণনা করা অসম্ভব। নিউইয়র্কের শোভাযাত্রা ছিল চার মাইল লম্বা। পাহাড়ের চূড়া হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য অপূর্ব্ব। মাছধরা নৌকার একটি ঘাঁটি আছে। সারি সারি সব মাছ খাওয়ার রেস্তোঁরা। এত বিশাল কাঁকড়া কোথাও দেখি নাই। কয়দিন যাবৎ "সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিকেল" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠার ডবল কলম সংবাদ দেখিতেছিলাম—এ বছর কাঁকড়া বেশী ধরা পড়িতেছে না।

২৩শে নভেম্বর Thanksgiving Day। এদের দ্বিতীয় জাতীয় উৎসব। সর্ব্বপ্রধান উৎসব ক্রিসমাসের প্রস্তুতি এবং কেনাকাটা এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার প্রথম অধিবাসীরা ইউরোপ হইতে আসিয়া বনজঙ্গল সাফ করিয়া বসতি স্থাপন করে। বন্য জন্তুর আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারায়। কৃষির জমি প্রস্তুত করিতে বহু মূল্য দিতে হইয়াছে। এই জন্য ফসল উঠিবার পর এরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় কতকটা আমাদের প্রাচীন নবান্ন উৎসবের মত।

আমাদের নবান্ন উৎসব সহরে ঢোকে নাই। এদের কৃষকের অনুপাত মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ মাত্র। এদের Thanksgiving Day বা ধন্যবাদ দান দিবস গ্রাম সহর নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র উৎসবের দিন। সকালে গির্জ্জায় উপাসনা এবং বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়া ভূরি ভোজন উৎসবের অঙ্গ।

মিঃ ও মিসেস কোশনাল্ড আসিয়া আমাকে গির্জ্জায় নিয়া গেলেন। ইউনিটেরিয়াম গির্জ্জায় ইহুদী গির্জ্জার লোকেরা আসিবে এবং সেখানে মিলিত উপাসনা হইবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণা (proclamation) বাহির হয়। ইহুদী-পাদ্রী উহা পাঠ করিলেন। ইউনিটোরিয়ান পাদ্রী বলিলেন—এ বৎসরের উৎসবে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। প্রটেষ্টানদের সম্মুখে এক ইহুদী পাদ্রী একজন ক্যাথলিক প্রেসিডেন্টের ঘোষণা পড়িয়াছেন।

এই দিনকার ভোজে টার্কি বা বৃহৎ জাতের মুরগীর মাংস প্রধান। কোশলাণ্ডরা সহর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া গেলেন। এরা একবার ভারতে আসিয়াছেন। বলিলেন—আগামী এপ্রিলে আবার আসিবেন। তখন মিঃ কোশলাণ্ডের বয়স ৭০ পূর্ণ হইবে। তিনি বলিলেন—আর একবার তাজ না দেখিয়া আমি মরিতে রাজি নই। মিসেস কোশলাণ্ডের আগ্রহ কাশী দর্শন। সামনের বার হরিদ্বার দর্শনের কথা বলিলাম। সমস্ত তথ্য জানিয়া নিলেন। মিঃ কোশলাণ্ড স্থানীয় নাগরিক কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস কোশলাণ্ড বার্কাল শাখার উইমেন ভোটার লীগের প্রেসিডেন্ট। মিঃ কোশলাণ্ড বলিলেন—আমার এক এক সময় মনে হয়, আমার ঘরে যেন গৃহিণী নাই, আমি উইমেন ভোটার লীগের এক অফিস বিবাহ করিয়াছি।

শুক্রবার ষ্টানফোর্ড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট। ডাঃ ষ্টেলি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁর এক সহকারী ডাঃ মোর্সকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মোর্স অনেক দিন ভারতে ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন। ডাঃ ষ্টেলিও কয়েক বারই ভারতে আসিয়াছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাড়ীতে নিয়া গেলেন। ঋষিতুল্য ব্যক্তি। সহজ সরল সাধারণ পোষাক, সহজ সরল আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, খাওয়ার সময় দেখিলাম সেখানেও একেবারে সহজ সরল ব্যবস্থা। এই প্রথম আমেরিকায় নিরামিষ ভোজন হইল—টোমাটো রস এবং স্যাণ্ডউইচ। বারান্দায়

বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চারজনে দীর্ঘ আলোচনা—ডাঃ ষ্টেলি, তাঁর পত্নী, মোর্স এবং আমি। শারদীয়া সংখ্যায় আমাদের বেকার সমস্যা রোধের উপায় স্বরূপ কুটীরশিল্প বিস্তারের যে প্লান দিয়াছি তাহাই ছিল আলোচ্য বিষয়। পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতিবিদেরা আমাদের এই ধারাটা এখনও ঠিক ধরিতে পারেন নাই। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ মিলার, ষ্টানফোর্ডে ডাঃ ষ্টেলি, পেনসিলভানিয়ায় ডাঃ মালেনবাউম, ইণ্ডিয়ানায় ডাঃ লুইস—ভারতের বন্ধু এই চারজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়া দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। চারজনেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। ডাঃ ষ্টেলি একটি নূতন গবেষণার ধারা নির্দ্দেশ করিলেন এবং বলিলেন উহা সফল হইলে এই যুক্তি অমোঘ হইবে। এই গবেষণা শেষ হইবামাত্র তাঁহাকে পাঠাইতে বলিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইব না জানি। সুতরাং কবে উহা শেষ করিতে পারিব বুঝিতেছি না।

সারাদিন কাটিল। বাহির হইবার সময় মিসেস ষ্টেলি তাঁর রান্নাঘর দেখাইলেন। সমস্ত কাজ নিজেই করিতে হয়। ঝি রাখার উপায় নাই। দিনমজুরীতে রাখিতে গেলে দৈনিক ৮ ডলার বা ৪০ টাকা, মাস চুক্তিতে ২০০ ডলার বা হাজার টাকা। ইলেকট্রিক এবং গ্যাস দুইই সস্তা। রান্নার নানাবিধ যন্ত্র, সঙ্গে এলার্ম ঘড়ি। ঘর পরিষ্কার, বাসন ধোয়ার কাজও যন্ত্রে। টোষ্ট, রোষ্ট, বেকিং প্রভৃতির কয়েকটি যন্ত্র আনার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারা গেল না। কারণ ওদের বিদ্যুৎ ১১০ ভোল্ট আমাদের ২২০ ভোল্ট। ট্রান্সফরমার বসাইয়া চালানো যায় কিন্তু খরচ এবং হাঙ্গামা দুই-ই বাড়িবে। টোষ্টের যন্ত্রটি চমৎকার। দুটি রুটির টুকরা বসাইয়া হাতল টানিয়া দাও, টোষ্ট হইয়া গেলেই রুটি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিবে। পোড়েও না, চাঁছিতেও হয় না।

সানফ্রান্সিস্কো হইতে অনেক দূরে ছোট সহর পালো আল্টো। ডাঃ ষ্টেলি সহর দেখাইতে নিয়া গেলেন। লাইব্রেরীটি অতি সুন্দর। দিল্লীতে যে ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকান দূতাবাসের প্লান দিয়াছেন তিনিই এই বাড়ীর প্লান করিয়া দিয়াছেন। ভারত সম্বন্ধে বই অনেক আছে। বাচ্চাদের লাইব্রেরীটি অপূর্ব্ব। ছোট্ট সব চেয়ার টেবিল। নীচু তাকে বই সাজানো। বাইরে একটি "গুপ্ত বাগান"। গাছের বেড়া, গাছের পাতার ছাদ। সেখানে বসিলে বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না। বলিলাম—আমাদের দেশেও ছোটদের লাইব্রেরী হইয়াছে, তবে

তার জায়গা অনেক বেশী, ৫০ একরের বেশী। লাইব্রেরীর পরিচালিকা মহিলারা বলিলেন আমাদের কিন্তু এই সুবিধাটা নাই, আমাদের জায়গা কম। একটি গল্প বলার ঘর এদের বিশেষত্ব। বাচ্চাদের গল্প শুনাইবার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে।

ডাঃ ষ্টেলি বাসে তুলিয়া দিয়া তার পর বিদায় নিলেন। নিজের লেখা বইখানি সঙ্গে দিয়া দিলেন—**The Future of Underdeveloped Countries: Political Implications of Economic Development.**

সানফ্রান্সিস্কো হইতে লস এঞ্জেলস প্লেনে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। লস এঞ্জেলসেই হলিউড এবং ডিসনিল্যাণ্ড। বিদেশ হইতে আমেরিকায় যাঁরা আসেন তাঁরা এটি না দেখিয়া যান না। আমার প্রোগ্রাম যখন তৈরি হয় তখন তাহাতে লস এঞ্জেলস রাখা হইয়াছিল। আমি যখন মিঃ নেলসনকে বলিলাম—লস এঞ্জেলস কাটিয়া সেই সময়টা বরং কানসাস এবং কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়াইয়া দাও, তিনি রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন—তুমি তো আচ্ছা লোক, হলিউড দেখিতে চাও না। এখান হইতে যাওয়ার আগে আমেরিকান কনসাল মিঃ কলিন্স কয়েকটি বড় জাতীয় পার্ক দেখিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বলিয়াছিলাম—Sightseeing বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমার এক বিন্দুও নাই, যে অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমি পাইয়াছি তাহা সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশিয়া এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া কাজে লাগাইতে চাই। চিকাগোর বিখ্যাত ডানবার ভোকেসনাল স্কুলের ডিরেক্টর মিঃ কলিন্সের ভাই। তাঁর ঠিকানা নিয়া নিলাম। ডানবার ভোকেসনাল স্কুলের নাম শুনিয়াছি। হলিউড বা ডিসনিল্যাণ্ড অপেক্ষা ঐ স্কুল আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।

সানফ্রান্সিস্কোতে মিসেস স্মিথ আমার স্থানীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। চিকাগো যাত্রা একদিন পিছাইয়া দেওয়ার কথা যেদিন তাঁহাকে বলিলাম এবং ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উহা প্রয়োজন বলিয়া জানাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—লস এঞ্জেলস আপনার প্রোগ্রামে নাই কেন? তাঁহাকেও বলিলাম—হলিউড বা ডিসনিল্যাণ্ড দর্শন অপেক্ষা ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে আলাপ পরিচয়

আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান। তিনি বলিলেন—আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও তো সেদিন সেখানে গিয়াছিলেন। বলিলাম—খবরের কাগজে তাহা দেখিয়াছি, তবে তাঁর রুচি ও আমার রুচি আলাদা। এখানকার বিদ্বান সমাজে পরিচয় করিতে পারিলে আমার ভ্রমণ সার্থক হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। সেই বৃদ্ধা মহিলার স্মিত মুখ যেন এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে।

সানফ্রান্সিস্কো ক্রণিকেল পশ্চিম আমেরিকার একটি বড় সংবাদপত্র। রওনা হইবার দিন সকালে উহাতে যাহা দেখিলাম তাহা খুব অদ্ভুত মনে হইল। প্রথম পৃষ্ঠায় একটি কার্টুন—একপাশে গমের বস্তা থরে থরে সাজানো, সামনে সামু খুড়োর (Uncle Sam) সেই পরিচিত মূর্ত্তি দাঁড়ানো, অন্য পাশে ভিক্ষাপাত্র হাতে এক বুভুক্ষু চীনাম্যান, সামু খুড়ো বলিতেছে—এই গম তোমার জন্য নয়। ভিতরে সম্পাদকীয় মন্তব্য—আমেরিকায় উদ্বৃত্ত গমের পাহাড় জমিতেছে, চীনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেরা তাহাকে খাদ্য দিতেছে, আমেরিকা কেন দিবে না? চীনারা কমুনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহারা তো মানুষ? অত্যন্ত তীব্র ভাষায় প্রবন্ধটি লেখা এবং উহাতে একটি দরদের সুর সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত। ভাবিলাম—আমেরিকানমাত্রেই কমুনিষ্ট বিদ্বেষী, একথা তো তবে ঠিক নয়? ইহার আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম—আকাশে রাশিয়ার আণবিক বোমা বিস্ফোরণের জবাবে আমেরিকাতেও তাহাই করিবার জন্য বিশিষ্ট নেতারা কয়েকজন বিবৃতি দিয়াছিলেন। সাধারণ লোকেরা উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিত—রাশিয়া অন্যায় করিলে কি আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে? রেস্তোরাঁর পরিচারিকা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, হোটেলের ঝাড়ুদার কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক—এই ধরণের বহু লোককে খোঁচাইয়া প্রশ্ন করিয়াছি, প্রায় সকলের নিকটেই এক জবাব পাইয়াছি। সম্ভবতঃ সাধারণ লোকের এই ধরণের মনোভাব অবগত হইয়াই গবর্ণমেণ্ট আর বেশী অগ্রসর হন নাই। প্রচারের ধরণ এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রসমূহের সংযম ও সতর্কতা দেখিয়া মনে হইত এই প্রচারের পিছনে কেনেডি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তাদের হাত হয়ত ছিল। কিন্তু হাত গুটাইয়া নিতে তাঁহারা বাধ্য হন। কিউবা অভিযান ব্যাপারে কেনেডি গবর্ণমেণ্টের যে তীব্র সমালোচনা শুনিয়াছি তাহাতেও মনে হইয়াছে যে, এখানকার জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের ভুল ধরিতে একবিন্দু দ্বিধা করে না। চীনাদের প্রতি যেটুকু সহানুভূতি আমেরিকায় জাগিতেছিল তাহা উহারা নির্ম্মূল করিয়া ছাড়িয়াছে।

চিকাগো

বিকালে রওনা হইলাম চিকাগো। স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিপূত তীর্থ-ক্ষেত্র চিকাগো যখন পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। হ্যারিসন হোটেল চিকাগোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেখানে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যেখানে ১৮৯৩ সালের ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। বাড়ীটিতে একটি শিল্প মিউজিয়াম হইয়াছে। প্রবেশ পথে দুপাশে দুটি সিংহ মূর্ত্তি। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে উপস্থিত হইলাম ইনফরমেশন ডেস্কে। একটি প্রবীণ মহিলা বসিয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলাম—আমি ভারত হইতে আসিয়াছি ; যে হলে ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং যেখানে ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই হলটি আমি দেখিতে ইচ্ছুক। মহিলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। হলটি দেখাইয়া বলিলেন—এই সেই হল ; কেবলমাত্র একটি পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। হলের সিলিং নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উহা নূতন করিতে হইয়াছে, তবে কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লিখিয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে সঙ্গে নিয়া আবার গেলেন নিজের জায়গায়। একটি নোট বই বাহির করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে পরিবর্ত্তনের কথা ইঞ্জিনিয়ার লিখিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কেহ এই হল সম্পর্কে কোন গবেষণা করিতে চায় তবে তার সমস্ত উপাদান মিলিবে, সযত্নে তাহারা উহা রক্ষা করিতেছে।

বেদান্ত সোসাইটি বাহির করিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। প্রচণ্ড শীত, আমাদের কাছে অস্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও সেখানে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ কলিং বেলের বোতাম টিপিবার পর দোতলার জানালা হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—Who is there ? কে ওখানে ?

—I am coming from India, I wish to see the Vedanta

Society ; আমি ভারত হইতে আসিয়াছি, বেদান্ত সোসাইটি দেখিতে চাই।

—What part of India ? ভারতের কোন্ স্থান ?

—Calcutta, কলিকাতা।

—আরে রাম বল, রাম বল, আপনি মশাই বাঙ্গালী ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। দরজাটা খুলুন।

—আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়, আমি আর নামলাম না, এখান থেকেই কথা বলি।

একে তো প্রচণ্ড শীত। তার উপর মনে হইল কে যেন গায়ে কয়েক বালতি বরফ জল ঢালিয়া দিল। এমন অবস্থা—পলাইয়া কোথাও আশ্রয় নিতে পারিলে বাঁচি।

এবার প্রশ্ন—কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের কাকে কাকে চেনেন ?

বলিলাম—নিত্যস্বরূপানন্দকে চিনি।

—আরে সর্ব্বনাশ। জহরলাল রাধাকৃষ্ণণের পরেই তো নিত্য-স্বরূপানন্দ।

আর দু'একটি কথা বলিয়াই বিদায় নিলাম। ততক্ষণে বরফ পড়া সুরু হইয়াছে। কালো ওভারকোট সাদা হইয়া উঠিতেছে।

চিকাগো পাবলিক লাইব্রেরী বিশ্বের বৃহত্তম সার্কুলেটিং লাইব্রেরী। সেখানে গেলাম। বাস্তবিকই বিরাট লাইব্রেরী। দেখিলাম স্বামীজির সব ইংরেজি বইগুলিই আছে। কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই বইগুলি কি কেউ পড়ে ?

জবাব পাইলাম—আজকাল উহাদের পাঠকসংখ্যা বাড়িতেছে। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীরা বইগুলি চাহিতেছে।

চিকাগোর ডানবার ভোকেসনাল স্কুলের কথা শুনিয়াছিলাম। স্কুলটি দেখিয়া বুঝিলাম ভোকেসনাল স্কুল বা কারিগরী শিক্ষার স্কুল কাহাকে বলে। স্কুলে পৌঁছিয়া সংবাদ দেওয়ামাত্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কলিন্স বাহির হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথমেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। এটি স্কুলের নূতন বাড়ী। তৈরি করিতে খরচ হইয়াছে ৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪ কোটি টাকা। বাড়ীটির আয়তন ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে। বাড়ীর

মধ্যেই একটি হলে বিশাল সাঁতারের জলাধার এবং প্রকাণ্ড বড় ষ্টেজ। উপার্জ্জনের উপযুক্ত বিদ্যা যত রকমের আছে প্রায় সবই এখানে শেখানে হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ে। দর্জ্জি, কাঠ মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি প্রভৃতি হইতে সুরু করিয়া লেদ মেসিনের কাজ, রেডিও টেলিভিসন মেরামত, মোটর-গাড়ী মেরামত ও রং, এরোপ্লেন মেরামত প্রভৃতি সমস্ত রকমের হাতের কাজ শেখাইবার বন্দোবস্ত আছে। হাইস্কুল ষ্টাণ্ডার্ড। সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে হাতের কাজ শিখিতেছে। লক্ষ্য করিলাম ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সবাই নিগ্রো এবং শিক্ষকদের অনেকে শ্বেতাঙ্গ। প্রিন্সিপালকে মনে হইল নিগ্রো। জিজ্ঞাসা করিলাম—এটি কি শুধু নিগ্রোদের জন্য হইয়াছে? মিঃ কলিন্স বলিলেন—না, স্কুলটি সকলের জন্য, তবে এই অঞ্চলে নিগ্রো অধিবাসী সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েরাই বেশী আসে। অল্প কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ ছাত্রছাত্রী অবশ্য ছিল। আমাদের দেশে কমার্সিয়াল স্কুল বলিতে শুধু টাইপরাইটিং আর শর্টহ্যাণ্ড এবং টেকনিকাল স্কুল মানে কাঠ আর একটু লোহা নিয়া টুকটাক। আমাদের দেশে সাধারণ বাড়ী করিয়া এ জিনিষ অনায়াসে করা যায়।

আগের দিন রাত্রে ছিল ডিনারের নিমন্ত্রণ। চিকাগো মিউজিয়ামের ডিরেক্টর, অধ্যাপক এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। যাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ তাঁর নাম ডি হান, তিনি কোরিয়া বিপ্লবের সময় সিউলে ছিলেন। কি ভাবে সিংমান রীকে প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, কি ভাবে ছাত্রদের উপর অন্যায় ভাবে গুলি চালানো হইয়াছিল, রী প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিলে কি ভাবে তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছিল, সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া ডি হান বলিলেন—সিংমান রী যখন াসাদ ছাড়িয়া নির্ব্বাসনে বাহির হইলেন তখন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকিত। পথ চলার সময় তিনিও অঝোরে কাঁদেন, দুপাশে সারি দিয়া দাঁড়ানো জনতাও কাঁদে। জনতা তাঁহাকে চোখের জলে বিদায় দিল কিন্তু থাকিতে বলিল না।

এখানে একটি নূতন আলোচনা হইল। কিছুদিন দেখিতেছিলাম আমেরিকার ছোট বড় সমস্ত সংবাদপত্রেই গোয়া এবং চীন সম্বন্ধে নেহরুর প্রতিটি উক্তি ও ঘটনার রিপোর্ট বাহির হইতেছে। একজন বলিলেন—

আমাদের মনে হয় গোয়ায় পর্টুগীজদের থাকার কোনই যুক্তি নাই, আপনারা বলপ্রয়োগে উহা ভারতভুক্ত করিলেও অন্যায় হইবে না। কিন্তু ভারতের অহিংসা নীতি বজায় থাকিতে কি তাহা সম্ভব হইবে ?

বলিলাম—অহিংসা নীতি এই নয় যে, কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করা চলিবে না। অহিংসার অবতার বুদ্ধ বলিয়াছেন—পাণাতিপাতেন বেরমণী শিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। অর্থাৎ প্রাণের অতিপাত করিবে না, অপ্রয়োজনে প্রাণনাশ করিবে না। কোন অবস্থাতেই প্রাণপাত করা যাইবে না—এই তাঁর নীতি হইয়া থাকিলে তিনি বলিতেন পাণপাতেন বেরমণী, পাণাতিপাত বলিতেন না। তিনি নিজে মাংসাশী ছিলেন, জীবহত্যা কখনো করিবে না ইহা তিনি বলেন নাই। ভগবদ্‌গীতারও শিক্ষা এই যে, ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অধর্ম্মাচরণ-কারীদের আঘাত ও প্রাণনাশ হিংসা নয়, অন্যায় নয়। ধরুন আপনি রাস্তায় চলিতে চলিতে দেখিলেন একস্থানে চার পাঁচটি গুণ্ডা একটি তরুণীকে লাঞ্ছনা করিতেছে। আপনার হাতে একটি লাঠি আছে। আপনি উহাদিগকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। উহারা সরিল না। তখন আপনি লাঠি দিয়া দু চার ঘা মারিতে তাহারা হটিয়া গেল। এই লাঠি পেটাকে আপনি অন্যায়, অধর্ম্ম বা হিংসা বলিবেন কি না ?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—এ দিক দিয়া বিষয়টি তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই। বুদ্ধের এই বাণী তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা অহিংসা বলিতে বুঝিয়াছেন কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ না করা এবং এই কারণে রাজ্যশাসনে এই অবাস্তব নীতি মানিয়া চলা কতটা সম্ভব তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কোন সময়েই কোন অবস্থায় বলপ্রয়োগ না করিবার প্রতিশ্রুতি এবং সামরিক বিভাগ ও অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ একসঙ্গে এই দুটি কি ভাবে চলিতে পারে তাহা তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য ছিল। নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর অহিংস গুলিবর্ষণের সংবাদ দেখিলাম এরা জানে না, আমিও বলিলাম না।

বলিলাম—আমাদের দেশের লোক শান্তি চায়। যদি কোন আক্রমণকারী সেই শান্তি ভঙ্গ করিতে আসে তবে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম এবং রাজশক্তির কর্ত্তব্য। যদি সেই আক্রমণকারী যুক্তি প্রয়োগে না সরে তবে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য হয় এবং

শান্তিপ্রিয় নাগরিকের রক্ষার্থে আক্রমণকারীর উপর বলপ্রয়োগ অহিংসার বিচ্যুতি নহে।

হোটেলে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ভারত সম্বন্ধে জানিবার কত কত গভীর আগ্রহ, কত সুন্দর এদের সহানুভূতি। ভারত বলিতে সাপ বাঘ আর মশা ম্যালেরিয়ার দেশ—এ ধারণা ঘুচিয়া গিয়াছে। আমাদের খবর এরা যথেষ্ট পরিমাণে রাখে কিন্তু সব জিনিষটা ঠিক মত ধরিতে পারে না বলিয়া ভুল করে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এ দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের একটা মস্ত তফাৎ অনুভব করিলাম। আমাদের দেশে কাহারও ভুল ধরিয়া দিলে তার ঠোঁট ফোলে এবং নিজের ভুলটাকেই সঠিক প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হয়, যুক্তিতে হারিয়া গেলে চটিয়া আগুন হয়। এদেশের অতি উচ্চস্তরের পণ্ডিত লোকের ত্রুটি ধরিয়া দিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—I see। তারপর জানিবার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছেন। সব শেষে বলিয়াছেন—I am sorry for the misconception, আমার ভুল ধারণার জন্য দুঃখিত।

বার বার মনে হইতেছিল অহিংসার এই ব্যাখ্যা আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া করিতেন তবে গোয়ার ঘটনার পর পাশ্চাত্য দেশে আমাদের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন হইত না। গোয়া হইতে পর্টুগীজ বিতাড়নে সকলেরই সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা তাহা কাজে লাগাইতে পারিলাম না।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব দুইটি—উহার বাঙ্গলা বিভাগ এবং Public Administration Clearing House। নিউ ইয়র্কে কার্ণেগী এনডাওমেণ্টের ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ প্লাটিগ এবং তাঁর সহকারী মিস ওলগেমুথ শেষেরটি দেখিতে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনে আমেরিকান মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ রিচার্ড ওকল্যাণ্ডও একই কথা বলিয়াছিলেন। বাঙ্গলা বিভাগের খবর নিজেই জানিতাম।

Public Administration Clearing House-এ প্রথমে যথারীতি গেলাম ইনফরমেশন ডেস্কে। সেখানে একটি তরুণ আমেরিকান দাঁড়ানো ছিল। পরিষ্কার শুদ্ধ বাঙ্গলায় বলিল—আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?

—আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। আপনি বাঙ্গলা জানেন?

—আমি বাঙ্গলা শিখিতেছি।

ইনফরমেশনের ভারপ্রাপ্তা মহিলা হাসিতে লাগিলেন। তরুণটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারও মুখে হাসি।

ডাঃ অলসনের ঘরে ডাক পড়িল। সেখানে আর একজন ভারতীয় উপস্থিত। নাম আর. বি. জৈন। দিল্লীর Indian School of International Studies-এর Research Fellow। তিনি তাঁর থিসিস সম্পর্কে উপদেশের জন্য ডাঃ অলসনের নিকট আসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হইল ; আমি কলিকাতার লোক শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ নরেশ রায়কে চেনেন ?

—খুব চিনি।

—এই আমার কার্ড আপনাকে দিলাম। এটি তাঁকে দিবেন এবং আমার কথা বলিবেন।

ভারতীয় ডেমোক্রাসির উপযুক্ত সংবিধান কিরূপ হওয়া উচিত—পার্লামেণ্টারি অথবা প্রেসিডেন্সিয়াল—তাহা নিয়া বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা তর্ক তুলিয়াছি। Public Administration Clearing House-এ উহা নিয়া আলোচনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সব রকমের সংবিধান এবং শাসনতন্ত্র গবেষণার এটি একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। নিজের ধারণায় কোন ভুল থাকিলে তাহা এখানে সংশোধন করিয়া নেওয়ার সুযোগ পাইব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার নগর শাসনের সিটি মেয়র এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে ভুল আছে কি না যাচাই করিয়া লইব।

অল্প সময়েই বুঝিলাম, ডাঃ অলসন মহাপণ্ডিত লোক। বলিলাম—আমাদের সংবিধান বৃটিশ পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভোটারদের অধিকাংশই এখনও নিরক্ষর। দুই শতাব্দীর বৃটিশ শাসনের পর আমরা যখন স্বাধীনতা পাইলাম তখন আমাদের দেশে অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত লোকের অনুপাত ছিল শতকরা মাত্র ৬। প্রথম প্লানের আরম্ভে আমরা উহা শতকরা প্রায় ১৭-তে তুলিয়াছি। দ্বিতীয় প্লানের শেষে উহা শতকরা ৪০-এ উঠিবে। কিন্তু উহা অক্ষরজ্ঞান প্রাপ্তের (literacy) সংখ্যা। রাজনৈতিক বই ও পত্রিকা পড়িয়া

বুঝিবার মত বিদ্যাসম্পন্ন লোকের অনুপাত এখনও শতকরা দুই জনের বেশী নহে। আজকাল উচ্চশিক্ষা বিস্তার এত অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে যে, উহা ইচ্ছামত দ্রুত করিবার সাধ্য আমাদের নাই। আমাদের পার্টির সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে কংগ্রেস সবচেয়ে বড়। আরও তিন চারিটি সর্ব্বভারতীয় পার্টি আছে। প্রাদেশিক পার্টি অনেকগুলি আছে। কার্য্যতঃ আমাদের গণতন্ত্র দাঁড়াইতেছে এইরূপ ঃ

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পার্টি অর্দ্ধেকের কম, কোন কোন প্রদেশে এক-তৃতীয়াংশ ভোট পায় কিন্তু পার্লামেণ্ট এবং বিধান সভার দুই তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারে। অধিকাংশ ভোট কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে যায় কিন্তু ভোট বহু দলে ভাগ হইয়া যায় বলিয়া কংগ্রেস পরাজিত হয় না। ইহা জানা আছে বলিয়া কংগ্রেস পার্টিকে কোন সময়েই গবর্ণমেণ্ট হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না। বৃটিশ ডেমোক্রাসিতে উনবিংশ শতাব্দীতেও শক্তিশালী তিন পার্টি ছিল কিন্তু তাহারাও এখন দুই পার্টি প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। ফলে শাসক পার্টি অর্দ্ধেকের কম ভোট পাইলে বিরোধী পার্টি গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিবে, এই আশঙ্কা তাহাদের সব সময়েই থাকে। নির্ব্বাচনের পর আইন সভায় কংগ্রেসের মেজরিটি হয়। মেজরিটি পার্টি যাঁহাকে নেতা নির্ব্বাচন করে তিনি হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন। সুতরাং শাসন ক্ষমতা (Executive Power) প্রধান-মন্ত্রী অর্থাৎ পার্টি লীডারের হাতে আসে। বিল প্রণয়ন এবং পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপন ক্যাবিনেটের কাজ। বিল প্রস্তুত করে ক্যাবিনেট অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডারের নির্দ্দেশ বা সম্মতিতে আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। বিল আকারে উহা পার্লামেণ্টে পেশ হইলে পার্টি মেজরিটি বিল পাশ করিয়া দেয়। সুতরাং কার্য্যতঃ আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও (Legislative Pewer) প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডারের হাতে চলিয়া যায়। পার্লামেণ্টে বিরোধী দল যত বাধাই দিক অথবা দেশের সংবাদপত্রে বা সভা সমিতিতে যত আপত্তিই ধ্বনিত হউক, পার্টি লীডার বিলের কোন ধারা পরিবর্ত্তনে অসম্মত হইলে তাহা অতিক্রম করিবার কোন উপায় থাকে না। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা—সমগ্র বিচার বিভাগ, এমনকি দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টও প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডারের অধীন। সুতরাং বিচার ক্ষমতাও (Judicial Power) প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডারের হাতে। অর্থাৎ আমাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসি টাইপে Separation of Powers নামেই, কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা পার্টি লীডারের করায়ত্ত।

ডাঃ অলসন বলিলেন—সুপ্রীম কোর্টকে কেন পার্টি লীডারের অধীন বলিতেছেন ?

—কেন বলিতেছি তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর সহিত একটি চুক্তি করেন যে, ভারতের একটি অংশ পাকিস্থানকে দেওয়া হইবে। জনমত এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে কিন্তু পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রীর পার্টি মেজরিটি উহা সমর্থন করে। ঐ এলাকার অধিবাসীরা একটি মামলা দায়ের করে। সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন—দেশের কোন অংশ অপর দেশকে হস্তান্তরের ক্ষমতা সংবিধান গবর্ণমেণ্টকে দেয় নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এরূপ হস্তান্তর করিতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে সংবিধান সংশোধন বিল আনিলেন এবং তাঁর পার্টি মেজরিটি উহা পাশ করিয়া দিল। আবার মামলা হইল। এবার সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন—সংবিধান গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দিয়াছে, এখন হস্তান্তর করা যাইবে। আমাদের সংবিধানের অধিকাংশ ধারাই পার্লামেণ্ট বদলাইতে পারে। বৃটিশ সংবিধানের মূলনীতি পার্লামেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব (Sovereignty of Parliament) আমাদের দেশে কার্য্যতঃ অনুসৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, সেখানে ক্যাবিনেট জানে জনমতের বিপক্ষে গেলে ভোট বিপক্ষে যাইবে এবং বিরোধী দল ক্ষমতায় আসিবে। আমাদের দেশের বহু পার্টি প্রথার জন্য এই আশঙ্কা শাসক পার্টির নাই। প্রেসিডেন্সিয়াল সংবিধান যদি আমরা গ্রহণ করি, আপনাদের মত সংবিধান পরিবর্ত্তন কঠিন করিয়া দেই, শাসন ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আপনাদের মত একেবারে আলাদা করি, তবেই আমরা পার্টি লীডারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বন্ধ করিতে পারি।

ওয়াশিংটন ডেমোক্রাটিক পার্টির ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ-এর সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের ডেমোক্রাসিকে একটি সুন্দর নাম দিয়াছিলেন—Disguised Dictatorship, প্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপ। ইহাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে, দায়িত্ব একেবারেই নাই।

ডাঃ অলসন বলিলেন - ত্রুটি দুই পদ্ধতিতেই আছে তবে ভারতের সংবিধান যে ভাবে রচিত হইয়াছে তাহার সংশোধনের অবকাশ যথেষ্ট আছে। যে পদ্ধতিতে এই প্রকার Disguised Dictatorship চলে তাহার পরিবর্ত্তন খুব বাঞ্ছনীয়। ডেমোক্রোটিক পার্টির ডিরেক্টর অফ রিসার্চ্চ বলিয়াছিলেন—You have

your fingers on the right spots, আপনি ঠিক জায়গাতেই আঙ্গুল দিতে পারিয়াছেন। যে সমর্থন চাহিয়াছিলাম এখানেও তাহা পাইলাম। আলোচনা আগাগোড়া academic পর্য্যায়েই রাখিলাম।

আলোচনায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ হোসেলিট্জের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আগেই জানাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়টা চিকাগোতে থাকিবেন না।

সন্ধ্যায় চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ডাঃ মিসেস ডোরিস গ্রেবারের বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয় সহরের দক্ষিণ প্রান্তে, ডাঃ গ্রেবার থাকেন উত্তর প্রান্তে ইভানষ্টনে। দুইটির দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল। সেখানে একটি বৃহৎ পাঠ্যপুস্তক পাবলিশিং হাউস এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার কথা। বেলা তিনটায় তিনি আমার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিবেন। ইভানষ্টনে যাওয়ার ট্রেনটি বড় মজার। রাস্তার উপর দোতলা রাস্তা। সেই দোতলা রাস্তার উপর ট্রেন। নাম Elevated train। সাধারণ রাজপথকেই দোতলা করিয়া তার উপর দিয়া ইলেকট্রিক ট্রেন চালাইয়াছে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ এবং মিসেস গ্রেবার কলিকাতা আসিয়াছিলেন। ডাঃ গ্রেবার দন্ত চিকিৎসক। কলিকাতার দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জির সঙ্গে তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। ডাঃ মুখার্জ্জিও চিকাগোতে তাঁদের বাড়ী গিয়াছেন।

প্রথমে গেলাম সেই পাবলিশিং হাউসে। এরা শুধু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি যে কত রকমে হইতে পারে তাহা না দেখিলে বোঝার সাধ্য নাই।

গ্রেবারদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে ডাক্তার হ্যাণ্ডশেক করিবার সময় আনন্দে এত জোরে হাত চাপিয়া ধরিলেন যে, ছাড়াইতে পারিলে বাঁচি। প্রথমেই উঠিল ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জির কথা। তিনি আজ ইহলোকে নাই কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তাঁর নাম যেমন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করি, এই একটি আমেরিকান পরিবারও তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখিয়াছে। ডাঃ গ্রেবারের বৃদ্ধা মাতা জীবিতা এবং এঁদের সঙ্গেই থাকেন। মিসেস গ্রেবার সন্ধ্যাবেলায় কয়েকটি বাড়ী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—এগুলি হইতেছে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হোম। অধিকাংশ পরিবারেই

পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে তাহাদের হোমে পাঠাইয়া দেয়। তাঁহারাও অনেক সময় স্বেচ্ছায় চলিয়া আসেন। বৃদ্ধেরা তরুণদের সঙ্গে বনাইয়া চলিতে পারেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেরা সরিয়া যান। গ্রেবার পরিবার ইহার ব্যতিক্রম। বৃদ্ধা জননী রহিয়াছেন। একসঙ্গে সকলে বসিয়া বহু আলোচনা, বহু রসিকতা হইল। রাত্রি নয়টা বাজে। অনেক দূরের পথ হোটেল। একে প্রচণ্ড শীত, তায় অচেনা জায়গায় রাত্রে একা ট্রেনে যাইতে হইবে। উঠিতে চাহিলেই বৃদ্ধা বলেন—আর একটু বোস। বঙ্কিম নেই, তোমাকে এত শীগগির ছাড়ছি না। সাড়ে নয়টায় এক রকম জোর করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম।

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় রাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় দশটায় গিয়া পৌঁছিলাম। তখন পুরা দমে ক্লাস চলিতেছে। লাইব্রেরী ছাত্র ছাত্রীতে ভর্ত্তি। দিনে যাহারা কাজ করে রাত্রে তাহাদের উচ্চ শিক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থা। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা। বিশ্ববিদ্যালয়টি একটু ভাল করিয়া দেখার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটি হইতে অন্য বাড়ী এত দূর এবং ঘর হইতে রাস্তায় বাহির হইলে এমন দুর্দ্দান্ত শীত যে ভাল করিয়া সব কয়টি জায়গা ঘুরিয়া দেখার লোভ সম্বরণ করিতে হইল।

আর আমাদের দেশ ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় এম. এ. ক্লাস দেশমুখ কিছুতেই খুলিতে দেন নাই।

হোটেলে যখন ফিরিলাম তখন রাত এগারোটা। বরফ পড়িতেছে।

পরদিনের জরুরী ভিজিট ছিল সমবায় সমিতির কেন্দ্র—Co-operative League। একজিকিউটিভ সেক্রেটারী ডাঃ ভুরহিজ ছিলেন না, অভ্যর্থনা করিলেন মিঃ মিলার। বসিতেই প্রথম কথা—আমাদের সৌভাগ্য আজ একজন বৃটিশ কারাগারের গ্রাজুয়েটকে এখানে আমরা পাইলাম। আপনি শুধু গ্রাজুয়েট নহেন, বৃটিশ কারাগারের গ্রাজুয়েট (A graduate of British prison) ডাঃ ভুরহিজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের লেখা American Co-operative : where they come from, what they do, where they are going···বইখানি অটোগ্রাফ করিয়া উপহার দিলেন। প্রায় সারাটা দিন এখানেই কাটিল। বিশ্বের বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশ সমবায় সমিতি বাদ দেয় নাই, উহাকে যথোপযুক্ত মর্য্যাদার আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। ছাত্র সমবায়

সমিতি (Students Cooperative) এখানকার সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষত্ব।

একটার সময় সকলে মিলিয়া চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ ভুরহিজ সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া অতি সুন্দর একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন। এদের পত্রিকা এবং পুস্তিকা সম্পাদকের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হইল। অন্যদেশের কথা জানা এবং নিজেদের কথা জানানোর যে অসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে নামিলাম ব্লুমিংটন বিমানঘাঁটিতে। অর্থনীতি এবং স্কুল অফ বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেসনের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ জন লুইস নিজেই বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত। বয়স বেশী নয়। হাসিখুসী অমায়িক মানুষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই একটি বড় বাড়ীতে অতিথিশালা, রেস্তোঁরা এবং বইয়ের দোকান। সেই ইণ্ডিয়ানা ইউনিয়নের বৃহৎ অতিথিশালাতেই ঘর ঠিক করা ছিল।

লাঞ্চে আরও কয়েকজন অধ্যাপক আসিয়া যোগ দিলেন। কয়েকজনের পত্নীও সঙ্গে ছিলেন। সকলেরই আগ্রহ একটি বিষয়ে—ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। ভারত সম্বন্ধে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যে জ্ঞান রাখেন আমাদের নিজের দেশেই তাহা কম দেখা যায়। অপর দেশ সম্বন্ধে এদের জানিবার আগ্রহের তো তুলনা হয় না। ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত আমেরিকানদের জ্ঞান এবং জানিবার আগ্রহের আর একটু বেশী পরিচয় পাইলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লাঞ্চে দুই ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না। এক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য ছুটি দিয়া ডাঃ লুইস বেলা চারিটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘরে যাইতে বলিলেন।

গেলাম। ডাঃ লুইসের লেখার টেবিলের পাশে একটি ছোট টেবিল। তাহাতে গোটা পাঁচেক পত্রিকা। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি অর্থনৈতিক পত্রিকা, আর সেই সঙ্গে রহিয়াছে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত এবং শচীন চৌধুরী সম্পাদিত ইকনমিক উইকলি।

ডাঃ লুইস প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা টাইপ করা একটি পাণ্ডুলিপি দিয়া বলিলেন—আজ রাত্রে এটি পড়িয়া রাখিবেন, কাল সকালে এটি সম্বন্ধে আপনার মতামত জানিয়া নিব।

—কি এটা ?

ভারতে আমেরিকান সাহায্য কি ভাবে খরচ হইয়াছে তার অর্থনৈতিক দিকটা জানিয়া আসিতে ডাঃ লুইসকে পাঠানো হইয়াছিল। ভারতে তিনি বৎসরাধিককাল ছিলেন। এই তার রিপোর্ট। এটি এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। শেষ হইলে রিপোর্টটি ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন প্রকাশ করিবে। লাঞ্চে দুই ঘণ্টা আলাপে ডাঃ লুইসের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিষয়টি আমার জানা আছে (you have a command over the subject) এবং তিনি কোথাও ভুল করিয়াছেন কি না সেটা আমাকে দিয়া যাচাই করিতে চান।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডির একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছিলাম। কোন গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন দেখা দিলে এবং নিজের সেক্রেটারী বা পরামর্শ-দাতাদের অভিমত মনঃপূত না হইলে তিনি একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়া দেন এবং বলিয়া দেন—ঐ কমিটিতে সরকারের পরামর্শদাতাদের ডাকিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের অভিমত আমরা জানি, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করেন তাঁহাদিগকে ডাকো এবং তাঁদের অভিমত শোন।

আর আমাদের দেশ ? যে প্লানিং কমিশনের উপর এত বিরাট দেশের অর্থ-নৈতিক ভাগ্য নির্দ্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহাতে বসানো হইয়াছে অর্থ-নৈতিক জ্ঞান বর্জ্জিত শুধু নয়, অর্থনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত কয়েকটি সরকারী মোসাহেব। যাঁহারা ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সযত্নে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ডাঃ লুইসের রিপোর্টটি হাতে নিয়া আমেরিকান গণতন্ত্র আর আমাদের মোসাহেবী ভেড়াতন্ত্রের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী প্রকাশ্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়, সমালোচনার জবাব দেয় এবং জবাব দিতে না পারিলে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যুক্তি তর্কে পরাস্ত হইবার অবস্থা ঘটিলে ননসেন্স বলিয়া লাফায় না। নেতার নির্ব্বুদ্ধিতার সমালোচনা সার্কুলার দিয়া বন্ধ করে না। নেতার প্রতি অন্ধ স্তাবকতা দেখায় না।

রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত রিপোর্টটি পড়িলাম। আমাদের পাবলিক সেকটারের শিল্পগুলি সবজান্তা আই. সি. এস দ্বারা পরিচালনার গলদ ঠিক ঠিক ভাবে ধরিয়া দিয়াছেন। অপ্রকাশিত রিপোর্ট বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা অভদ্রতা বলিয়া উহার নোট নেওয়ার প্রবল লোভ সম্বরণ করিলাম। রিপোর্টটি সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরদিন সকাল দশটায় ডাঃ লুইসের সঙ্গে দেখা। এক ঘণ্টা রিপোর্টটি নিয়া আলোচনা হইল। বেলা এগারোটায় অর্থনীতির পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সেমিনার। লুইস সেখানে নিয়া গেলেন।

সেমিনারের বিষয় ভারতের তৃতীয় প্লান। Capital output ratio নিয়া আলোচনা চলিল। সংশ্লিষ্ট তালিকাগুলি আগেই তাহারা সাইক্লোষ্টাইল করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতের প্লানিং সম্বন্ধে কি অদ্ভুত এদের আগ্রহ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। Ratio সব জায়গায় মিলিতেছে না—এটা ঠিক ধরিয়াছে কিন্তু না মেলার কারণটা বুঝিতে পারিতেছে না।

নিজেদের আলোচনা শেষ হইলে লুইস বলিলেন—আমাদের কথা তো শুনিলেন, এবার আপনি বলুন।

প্রায় ৪০ মিনিট বলিলাম। আমাদের বেকার সমস্যা, বিশেষ ভাবে প্রচ্ছন্ন বেকারীর (disguised unemployment) পরিধি ও ব্যাপকতা বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম—আমাদের মূলধন বিনিয়োগ এবং শিল্পবিস্তার তোমাদের কায়দায় করিতে গেলে ভুল হইবে। আমাদের শতকরা এক ভাগেরও কম লোক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত। কৃষির দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে কি ভয়ানক চাপ সহ্য করিতে হয় তাহা তোমরা খুব ভাল ভাবে জান। সুতরাং আমাদের সমস্ত শিল্প ব্যবস্থাটাকেই একটা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে বড় মাঝারি এবং ছোট ইউনিটের পরিকল্পিত সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। Capital output ratio-র অঙ্ক তোমাদের দেশে মিলিবে কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক ওভাবে মিলিবে না।

আমাদের প্লানিং কমিশনের প্রভুরা বিষয়টি এদিক দিয়া চিন্তা করেন নাই ইহা জানি কিন্তু বিদেশে ওটা আর বলিলাম না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দিলাম। শুধু একটি ভয় ছিল—কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,—তাহলে এ কথাটা তো প্লানের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, নাই কেন? আড়াই সের ওজনের প্লানে জোড়া বলদের গোবর আছে, মানুষের ঘিলু নাই—বিদেশে তো আর একথা বলা যায় না।

সেমিনার শেষ হইতে অর্থনীতির একজন অধ্যাপক বলিলেন—লুইস, একে যেতে দিও না; আমাদের ষ্টাফে রেখে দাও।

লুইস জবাব দিলেন—ঠিক বলেছ, আমরা এত সংক্ষিপ্ত ভিজিটে খুসী নই [We are not satisfied with this short visit]।

এমন ভাব দেখাইলাম যেন এদের কথা শুনিতেই পাই নাই। মনে মনে বুঝিলাম—আর একটা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়ত হইবে।

রাত্রে ডিনার। খাওয়া হইল ইউনিয়ন রেস্তোঁরায়। আরও কয়েকজন অধ্যাপক উপস্থিত। খাওয়ার পর সকলে গেলাম লুইসের বাড়ীতে।

লুইসের প্রশ্ন—সেলিগ হ্যারিসনের ইণ্ডিয়া দি ডেঞ্জারাস ডিকেড বইটি পড়িয়াছেন? আপনি কি মনে করেন ভাষার দ্বন্দ্বে ভারতের ঐক্য ছারখার হইয়া যাইবে?

—না। আমি মনে করি প্রত্যেক বড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী স্বীকার করিলেই ভারতের ঐক্য সুদৃঢ় হইবে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী নূতন নয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই দাবী চলিতেছে। ১৯২০ সালে নাগপুরের অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টি এই দাবী স্বীকার করে এবং নিজেদের প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠন করে। ১৯২৮ সালে সর্ব্বদলীয় সম্মেলন উহা স্বীকার করে এবং বলে যে, দেশ স্বাধীন হইলে এবং কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতা হাতে পাইলে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করিবে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা যখন আসিল তখন আবার ঐ দাবী প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কংগ্রেস পার্টি পিছাইয়া দাঁড়াইল এবং বলিল—ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন উচিত হইবে না। উহাতে বিরোধ বাড়িবে। গণপরিষদে কংগ্রেস এই নূতন মনোভাব প্রকাশ করিবামাত্র অন্ধ্রে বিদ্রোহ ঘটিল এবং কংগ্রেস পার্টিকে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ দিতে হইল। ইহার পর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবী আরও জোরদার হইল এবং নানাদিকে হাঙ্গামা সুরু হইয়া গেল। সীমা কমিশন গঠন করিয়া উহার উপর সমগ্র সমস্যাটি বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হইল। কমিশন নীতিগত ভাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবী মানিয়া নিলেন কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র উহা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিলেন না। ১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে চারিটি ভাষাভিত্তিক প্রদেশে ভাগ করা হইল। ইহার পর আপনি দাক্ষিণাত্যে একটি ভাষা হাঙ্গামা (language riot) বাহির করিতে পারিবেন না। এই নীতিতে বঞ্চিত হইল বোম্বাই এবং পাঞ্জাব। হাঙ্গামা চলিতে লাগিল এই দুই প্রদেশে। ১৯৬০-এ আবার সংবিধান সংশোধন করিয়া মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট গঠিত হইল। বোম্বাই

এবং আহমদাবাদে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই। হাঙ্গামা চলিতে লাগিল পাঞ্জাবে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, উহা দিলে শান্তি আসে, না দিলে অশান্তি ঘটে। ভারতের সর্ব্বত্র ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হইলে ভারতীয় ঐক্য শক্তিশালী হইবে, ঐক্য ভাঙ্গিবে না—ইহা আমার বিশ্বাস।

লুইস বলিলেন—মিঃ বর্ম্মণ ভাষাভিত্তিক প্রদেশের স্বপক্ষে খুব শক্তিশালী যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন; (Mr. Burman has made out a very strong case in favour of linguistic State)। বিষয়টি আমরা এখন ভাল ভাবে বুঝিতে পারিতেছি।

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। মিসেস লুইস বলিলেন—ভদ্রলোককে অনেক বকাইয়াছ, এইবার বিশ্রাম করিতে দাও।

ডিট্রয়েট

বৃহৎ শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত উহার সমন্বয় বিষয়ে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বলিতেছি এবং লিখিতেছি। তাহার প্রত্যক্ষ সমর্থন পাইলাম আমেরিকার শিল্পনগরী ডিট্রয়টে। আমাদের দেশে জাতীয় ভিত্তিতে এই যে সমন্বয়ের কথা বলিতেছি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটর। এক কথায় উহাকে বলা হয় শিল্পবিকেন্দ্রীকরণ নীতি। ক্ষুদ্র শিল্পে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আমেরিকা কি ভাবে সাহায্য দিতেছে তারও পরিচয় জানিলাম এই ডিট্রয়টে।

ডিট্রয়ট পৌঁছিলাম ২রা ডিসেম্বর। অভ্যর্থনার ভার ছিল মিস ফ্লোরেন্স কাসিডির উপর। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন করিয়া তিনি হোটেলের ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধা কিন্তু কি অদ্ভুত উৎসাহ। পাছে কোথাও ভুল করি বা অসুবিধায় পড়ি তার জন্য অধিকাংশ সময় নিজে সঙ্গে থাকিয়াছেন।

মিস কাসিডি প্রথমেই পৌঁছিয়া দিলেন জেনারেল মোটরের ডিট্রয়ট ষ্টাফ ম্যানেজার জনসনের কাছে। জনসন নিয়া গেলেন মাইল ত্রিশেক দূরে তাঁদের হেড অফিসে। বুঝিয়া নিতে সময় লাগিল এটা বাগানবাড়ী নয়, অফিস। মাঝখানে প্রকাণ্ড লেক, তার পাশে বিচিত্র চেহারার এক একটি বাড়ী। এবার দেখানোর ভার নিলেন পার্সোনেল ষ্টাফের বড় কর্ত্তা কার্পেণ্টার। ক্যাডিলাক গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া জেনারেল মোটর এবার প্লাষ্টিকের গাড়ী তৈরিতে মন দিয়াছে। এরোপ্লেন চেহারার দুটি গাড়ী তৈরিও করিয়াছে। প্লাষ্টিকের বডি ইস্পাতের মতই শক্ত হইয়াছে কিন্তু খরচ এখনও খুব বেশী পড়িতেছে।

অফিসটি এক চক্কর ঘুরিতেই লাঞ্চের সময় হইয়া গেল। নিজেদের রেস্তোঁরা। রেস্তোঁরা বাড়ীটিও অতি সুন্দর। এক টেবিলে চারজন বসিলাম—কার্পেণ্টার,

পাবলিক রিলেশনের বড়কর্ত্তা কার্শনার, বৈদেশিক বিক্রয়ের বড়কর্ত্তা স্মিথ এবং আমি। ১৯৬০ সালে জেনারেল মোটরের গাড়ী বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইয়াছিল ১২৮৭ কোটি ডলার বা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা, ভারত সরকারের মোট রাজস্বের ছয় গুণ।

১৯০৮ সালে কয়েকটি ছোট কোম্পানীকে একত্র করিয়া জেনারেল মোটরের জন্ম। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই উন্নতি। জেনারেল মোটরের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে এই যে ইহারা একটি কারখানায় সমস্ত গাড়ী উৎপাদন করে না। আমেরিকার ১৯টি প্রদেশে এদের ১২৯টি কারখানা আছে। তাছাড়া কানাডায় আছে পাঁচটি এবং অন্যান্য দেশে আছে আরও ১৯টি।

কার্পেণ্টার এবং কার্শনার দুজনেই খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন—বিকেন্দ্রীকৃত সংগঠন (decentralised organisation) জেনারেল মোটরের সাফল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জেনারেল মোটর কি তবে হোল্ডিং কোম্পানী ?

—না এটা হোল্ডিং কোম্পানী নয়, এটা অপারেটিং কোম্পানী। কেন্দ্রীয় আফিস শুধু পলিসি ঠিক করিয়া দেয়, বাকি সমস্ত কার্য্য পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকে প্রত্যেক অপারেটিং ডিভিসনের জেনারেল ম্যানেজারের উপর। সংগঠন কি ভাবে হইবে, পরস্পর সহযোগিতা কিরূপে চলিবে, উন্নতি কোন্ পথে হইবে সবই স্থির করিবার ভার জেনারেল ম্যানেজারদের উপর। নিজের সংগঠন তিনি নিজে গড়িয়া তুলিবেন। ইহাতে দুই দিক দিয়া তাঁর সুবিধা—ছোট শিল্পের flexibility (যখন যেমন প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ তেমন সিদ্ধান্তের সুযোগ) থাকে, বৃহৎ সংগঠনের টেকনিসিয়ানের সাহায্য প্রাপ্তিও সহজ হয়। ছোট শিল্পের পক্ষে উচ্চ বেতনের সুদক্ষ টেকনিসিয়ান রাখাও সম্ভব নয়, তাঁদের দেওয়ার মত অত কাজও থাকে না। এরূপ টেকনিসিয়ান রাখা বৃহৎ সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব। জেনারেল মোটরের যে কোন কারখানায় সুদক্ষ টেকনিসিয়ানের প্রয়োজন পড়িলে তাহারা ডিট্রয়টে টেলিফোন করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টেকনিসিয়ান সেই কারখানায় গিয়া উপস্থিত হন।

ছোট বড় মাঝারি ৩০ হাজার কোম্পানী জেনারেল মোটরকে মাল এবং পার্টস সরবরাহ করে এবং সার্ভিস দেয়। ১৯৬০-এ এদের দেওয়া হইয়াছে ৩১৫৫ কোটি টাকা। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯০টিতে ৫০০ জনের কম লোক কাজ করে,

শতকরা ৭০টিতে করে ১০০ জনের কম লোক। কতকগুলি আছে একটি লোকের কারখানা, কতকগুলিতে স্বামী স্ত্রী দুজনে মাত্র কাজ করে। কয়েকটি কারখানা একজন বা দুইজন নিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সেগুলি বেশ ভাল কারখানায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জেনারেল মোটর বিশ্বাস করে যে ছোট এবং বড় কারখানার উন্নতি পরস্পরের জন্য প্রয়োজন এবং পরস্পরের পরিপূরক।

ইহাকেই বলিয়াছি ছোট বড় মাঝারি কারখানার সমন্বয় সাধন (integration)। থিওরীর দিক হইতে যাহা চিন্তা করিয়াছি ডিট্রয়টে বিশ্বের বৃহত্তম কারখানায় আসিয়া দেখিলাম ঠিক সেই পদ্ধতিতে কাজ চলিয়াছে। কার্পেণ্টার, কার্শনার এবং স্মিথ তিনজনেই বলিলেন—এই বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে কাজ খুব ভাল ভাবে চলিতেছে এবং সকলেই লাভ করিতেছে।

উত্তরপাড়ায় হিন্দ মোটরে এবং চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানায় ঠিক এই জিনিষ করিতে বহুবার বলিয়াছি।

জেনারেল মোটরের মালিকানার পরিচয় জানিতে চাহিলাম। কার্পেণ্টার হাসিয়া বলিলেন—আমাদের কিন্তু কর্ম্মীর চেয়ে মালিকের সংখ্যা অনেক বেশী।

—কি রকম ?

—১৯৬০-এ আমাদের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫৯৫,১৫১ এবং মালিক অর্থাৎ অংশীদার ছিল ৮৩০,৮৭৩।

—অংশীদারেরা নিশ্চয়ই সকলে খুব ধনী লোক ?

—মোটেই না। এদের মধ্যে আছে গৃহকর্ত্রী, ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক, কেরাণী, উকীল, ডাক্তার, মেকানিক, শিক্ষক, পাদ্রী প্রভৃতি সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক। প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী হিসাবে (institution and groups) অংশীদার সংখ্যা মাত্র ৭২ হাজার। আমেরিকা এবং কানাডায় প্রত্যেক প্রদেশে আমাদের অংশীদার আছে। তার বাহিরে ৪৮টি দেশেও অনেক আছে। শ্রমিকদেরও অংশীদার করিয়া নেওয়া হইতেছে। শ্রমিকেরা কোম্পানীর হাতেই কিছু টাকা মজুরী হইতে জমাইতে পারে এবং উহা দ্বারা শেয়ার কেনে। ইহার নাম General Motors Savings-Stock Program। এই বৎসর জানুয়ারীতে ৩৭ হাজার শ্রমিক ঐ স্কীমে অংশীদার হইয়াছে। পাঁচ বৎসর টাকা জমাইয়া শ্রমিকেরা শেয়ার কিনিতে পারে এবং ঐ ৩৭ হাজার জন এই স্কীমের প্রথম অংশীদার ছিল।

এর নাম হইল ক্যাপিটালিজম আর সরকারের টাকায় কারখানা স্থাপন এবং

উহাদের পরিচালন ভার বুরোক্র্যাসির হাতে অর্পণের দ্বারা বছরে কোটি কোটি টাকা জাহান্নামে প্রেরণের নাম সোস্যালিজ্‌ম। ভারতের "সোসালিষ্ট" শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভ দেখাইবার সময় বাজারের চোরাকারবারীদের হার মানাইয়া সরকার কি ভীষণ অন্যায় ভাবে দাম বাড়াইয়া লাভ করেন তাহা দেখা হয় না।

কার্শনার একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন— ছয়টি নীতির উপর জেনারেল মোটরের সমস্ত কাজ চলিতেছে :

(১) উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত লোক বসাও।

(২) যে যে-কাজ করিবে তাহাকে সেই কাজের উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

(৩) সংগঠনকে সহযোগিতাপূর্ণ টীমরূপে গড়িয়া তোল।

(৪) কাজের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার এবং উপযুক্ত পরিবেশ দাও।

(৫) সুযোগ দাও, উৎসাহ দাও এবং ভাল কাজের স্বীকৃতি দাও।

(৬) আরও বেশী আরও ভাল জিনিষের জন্য সম্মুখে তাকাও, ভবিষ্যৎ বুঝিয়া প্লান কর।

বুঝিলাম ঘণ্টায় ৪২টি ক্যাডিলাক গাড়ী নির্ম্মাণ এমনি হয় না। এদের নিজেদের টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট আছে, সেখানে ২৫০০ ছাত্র পড়ে। তাছাড়া দেশের ২১৬টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল মোটরের বৃত্তি নিয়া আরও ১৬০০ ছাত্র পড়ে।

মজুরীও তেমনি রাজসিক। মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ—প্রায় ২০০০ কোটি টাকা মজুরীতে যায়। প্রত্যেক শ্রমিকের আয় দশ বছর আগে ছিল ঘণ্টায় ১০ টাকা, এখন পায় ঘণ্টায় ১৫ টাকা। সাপ্তাহিক মজুরী ৬০০ টাকা, মাসিক আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

এই আয়, এই সুযোগ, এই অধিকার, শ্রমিক মালিক পাশাপাশি বসিয়া অংশীদার মিটিং পরিচালন—ইহার নাম ক্যাপিটালিজ্‌ম, আর রাষ্ট্রের নামে পার্টি প্রভুদের ডাণ্ডার তলায় হুকুম তামিলের নাম সোসালিজ্‌ম।

ক্ষুদ্র শিল্প

মিস কাসিডি ডিট্রয়টে ছোট ব্যবসা এডমিনিষ্ট্রেসনের (Small Business Administration) বড় কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ওয়াশিংটনে ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসনে ডাঃ ওয়েন এবং ডাঃ এশারের সঙ্গে আলোচনার

সময় এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাইয়াছিলাম। তাঁহারা ঐ এডমিনিষ্ট্রেসনের এডমিনিষ্ট্রেটার জন হর্ণের ঠিকানাও দিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তাঁর সহিত দেখা করিতে পারি নাই। আমেরিকায় একটি ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি আছে। আমেরিকার একদল ব্যবসায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা। কমিটির একটি রিসার্চ্চ ষ্টাডি গ্রুপ আছে। ডাঃ ওয়েন একটি বই দিলেন—Small Business : Its Place and Problems (ছোট ব্যবসা : উহার স্থান ও সমস্যা)। বইটি ঐ কমিটির রিসার্চ্চ ষ্টাডি গ্রুপের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য কাপলান লিখিয়াছেন উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ছোট শিল্পে উৎপাদন হার বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা বেশী। ছোট শিল্পকে কিভাবে সজীব ও সতেজ রাখা যায় তাহার উপায় তিনি দেখাইয়াছেন। আমাদেরও ইহাই থিসিস। কাপলান ব্রুকিংস ইনষ্টিটিউসনে যোগ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বইটি যখন পড়িলাম তখন ওয়াশিংটন হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি। দুঃখ খানিকটা ঘুচিল ডিট্রয়টে। Small Business Administration-এর কর্ত্তার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁর নিকট জানিলাম এই এডমিনিষ্ট্রেসন ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে, নাম Small Business Investment Company। এটি প্রাইভেট মূলধন নিয়া গঠিত। গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা দেন। তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানকে কিছুটা তদারক করেন, কিন্তু উহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। ছোট শিল্প ও ব্যবসাকে ঋণ দান ইহার কাজ। ডিট্রয়ট গিয়াছি ১লা ডিসেম্বর। ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে কত টাকা দিয়াছে তার হিসাব আসিয়া গিয়াছে, এত দ্রুত এদের কাজ। ৪০৭টি প্রতিষ্ঠানকে ইহারা মোট ৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ১৯৩ কোটি টাকা দিয়াছে। তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়াছে মাত্র ৫ কোটি ডলার বা ২৫ কোটি টাকা। ভদ্রলোক বলিলেন—ছোট শিল্প ও ব্যবসাকে ঋণ দান একটা লাভজনক ব্যবসা বলিয়া উহাতে প্রাইভেট মূলধন যথেষ্ট আসিতেছে।

এডমিনিষ্ট্রেসনের হিসাব তৈরি হইয়াছে ১৯৬১ সালের জুন পর্য্যন্ত। কয়েকটি অঙ্ক টুকিয়া নিলাম। ছোট শিল্পে সাহায্য কিভাবে বাড়িতেছে নীচের তালিকায় তাহা বোঝা যাইবে :

বৎসর (জুলাই-জুন)	ঋণের সংখ্যা	লক্ষ ডলার
১৯৫৪	৪৭৩	২৮০
১৯৫৫	১১৭২	৫৬০
১৯৫৬	১৯১৫	৮২০
১৯৫৭	৩৫৩৬	১৫,৯০
১৯৫৮	৪০১৪	১৯,৪০
১৯৫৯	৫৫৮২	২৬,৭০
১৯৬০	৩৬৭০	১৬,৮০
১৯৬১	৪৯৮৯	২৫,১০

১৯৬০-এর পর ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ হঠাৎ কমিয়া যায়, কিন্তু ১৯৬১ সালের গোড়ার দিক হইতেই আবার বাড়িয়াছে। ১৯৬১-র প্রথম চার মাসে ঋণের সংখ্যা ছিল ২৪৪২ এবং অঙ্ক ছিল ১৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।

শিল্প এবং ব্যবসার আলাদা হিসাব আছে কি না, কোন্ কোন্ শিল্পে কতটা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ক্যালেণ্ডার বৎসরের হিসাব আছে কি না তাহা জানিতে চাহিলাম। এই তালিকা পাইলাম—

১৯৬০-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শিল্পে দেওয়া হইয়াছে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ঋণের সংখ্যা ছিল ৬৮৯১। শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

কাপড়, কাঠ, আসবাবপত্র, কাগজের জিনিষ, ছাপাখানার জিনিষ, কেমিকেল, ইস্পাত, তামা প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক ভিন্ন অন্য যন্ত্র, যানবাহনের সরঞ্জাম।

শুনিলাম কাগজের দ্রব্য নির্ম্মাণ কারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশই ছোট শিল্প। আমেরিকায় কাঁচের গেলাস এবং কাপড়ের রুমাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। দুটিই এখন কাগজের। এই শিল্প আমাদের দেশেও গড়িয়া উঠিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঐ বৎসর ছোট ব্যবসায়ে ১৫৩৯২টি ঋণ দেওয়া হইয়াছে, ঋণের অঙ্ক ৫৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। কেবলমাত্র খুচরা দোকানকে ৭০০২ ঋণ দিয়া ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার সাহায্য করা হইয়াছে। সার্ভিস অর্থাৎ মেরামতি প্রতিষ্ঠানদের ঋণ দেওয়া হইয়াছে ৩১৭৬টি, অঙ্ক ১৩ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। গৃহ বা রাস্তা নির্ম্মাণ কণ্ট্রাক্ট এবং যানবাহন অর্থাৎ ট্যাক্সি প্রভৃতিকে সার্ভিস ধরা হয়

আমাদের প্লানে ছোট শিল্পকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুটা হইয়াছে কিন্তু ছোট বড় মাঝারি সব রকম শিল্প নিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপাদন এবং কর্ম্মসংস্থান উভয় সমস্যা সমাধানের কোন পরিকল্পনা হয় নাই। ক্ষুদ্র শিল্প আলাদা গতিতে আলাদা ভাবে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে উহার প্রভাব পড়িতেছে না, বেকারী দূর করিবার উপায়ও হইতে পারিতেছে না। বৃহৎ শিল্পের দেশ আমেরিকা ক্ষুদ্র শিল্পে সাহায্য দানের আধা-সরকারী এবং বেসরকারী যে সব বন্দোবস্ত করিয়াছে সেই সব অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কাজে লাগাইলে আমরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইতাম।

মিউজিয়াম ও গ্রীণফিল্ড

ডিট্রয়টের দুটি দ্রষ্টব্য বস্তু হইতেছে হেনরী ফোর্ড মিউজিয়াম এবং হেনরী ফোর্ডের জন্মস্থান গ্রীণফিল্ড গ্রাম। একা মিউজিয়ামটি ১৪ একর জমির উপর অবস্থিত। গ্রাম এবং মিউজিয়াম উভয় জমির পরিমাণ ২০০ একর। গ্রামটিতে রহিয়াছে প্রায় একশতটি ঐতিহাসিক বাড়ী। হেনরী ফোর্ড, টমাস এডিসন এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের স্মৃতি গ্রামটিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

মিউজিয়ামটি কেবল কতকগুলি দ্রষ্টব্য বস্তুর সমাবেশ মাত্র নহে। শিল্প বিপ্লবের আগে আমেরিকার কৃষি এবং হাতের কাজ যে সমস্ত যন্ত্র বা হাতিয়ারের দ্বারা হইত তাহা হইতে সুরু করিয়া আধুনিকতম যন্ত্র পর্য্যন্ত যান্ত্রিক উন্নতি ধাপে ধাপে কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহার ক্রমবিবর্ত্তন অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। প্রথম মোটর গাড়ী, প্রথম এরোপ্লেন হইতে আধুনিকতম গাড়ী এবং প্লেন কিভাবে আসিয়াছে পর পর সাজাইয়া তাহা দেখান হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তেহরাণ সম্মেলনে নিজের গাড়ী নিয়া গিয়াছিলেন, উহার কাঁচগুলি বুলেটপ্রুফ, সেটিও রাখা আছে। এই একটি মিউজিয়াম ভাল করিয়া দেখিলে আমেরিকান কৃষিশিল্প এবং যানবাহনের উন্নতির একটি সামগ্রিক এবং জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। মিউজিয়ামটির তিনটি ভাগ—আর্ট গ্যালারী, প্রাচীন আমেরিকান দোকানসহ রাস্তার মডেল এবং মেকানিকাল আর্টস হল। তৃতীয়টি ভাল করিয়া দেখিলাম, দ্বিতীয়টি দেখিলাম খুব তাড়াতাড়ি এবং আর্ট গ্যালারীতে সময়াভাবে ঢুকিতে পারিলাম না। আমেরিকায় অনেক কিছুই দেখিলাম, সময়াভাবে দেখিতে পারিলাম না শুধু সিনেমা আর আর্ট গ্যালারী।

গ্রীণফিল্ড গ্রামে গাইড ছিল একটি কলেজের ছাত্রী। এই কাজটি তাহাদের একটি বড় উপার্জ্জনের পথ। বছরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মিউজিয়াম এবং গ্রাম দেখিতে আসে। মিউজিয়ামে গাইড লাগে না কিন্তু গাইড ছাড়া গ্রাম দেখা দুষ্কর।

যে বাড়ীতে হেনরী ফোর্ডের জন্ম সেই বাড়ীটি নিখুঁতভাবে তার আদিম অবস্থায় সংরক্ষিত হইয়াছে। সবচেয়ে অদ্ভুত এডিসনের লেবরেটরী। এডিসন থাকিতেন নিউ জার্সির মেনলো পার্কে। সেখানেই তাঁর টেলিফোন এবং ইলেকট্রিক বালব আবিষ্কার। এডিসন ছিলেন ফোর্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফোর্ড তাঁর গ্রামে এডিসন লেবরেটরীর চেহারার নিখুঁত বাড়ী তৈরি করেন এবং এডিসন যে সব যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন সমস্ত আনিয়া এখানে রাখেন। লেবরেটরীর চতুর্দ্দিকে কয়েকটি বাড়ী। একটি এডিসনের অফিস এবং লাইব্রেরী, দোতলা। লেবরেটরী দোতলা। একটি কাঠের বাড়ী—নাম Little Glass House। উহাতে ইলেকট্রিক বালবের কাঁচের অংশগুলি তৈরী হইয়াছিল। একটি বাড়ী Carbon Shed; টেলিফোন ট্রান্সমিটারের কার্ব্বনের বোতাম এখানে তৈরি হইয়াছিল। ছবিতে ফোর্ড এডিসনের কানের কাছে মুখ নিয়া কথা বলিতেছেন কেন—জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রীটি বলিল, এডিসন কানে খুব কম শুনিতেন।

—এত বৈদ্যুতিক জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কানে শোনার যন্ত্র আবিষ্কারের কথা তাঁর মাথায় খেলে নাই ?

এডিসনের সর্ব্ব প্রধান আবিষ্কার হইতেছে Central Station supply system for the electrical transmission of light, heat and power. বেতারে সংবাদ প্রেরণও এডিসনই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট কিনিয়া নিয়াই মার্কনি বেতার সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন।

সার জন বেন্সেট জুয়েলারি দোকানে পুরাণো আমলের ঘড়ি এবং অলঙ্কার রহিয়াছে। বাড়ীটির প্রবেশদ্বারের উপরে আছে একটি মস্ত ঘড়ি এবং চারিটি লৌহ নির্ম্মিত মূর্ত্তি—দুইটি বড় দুইটি ছোট। বড় দুটি গগ এবং মেগগ দৈত্য নামে অভিহিত। উহাদিগকে প্রাচীন লণ্ডনের প্রতীক বলা হয়। প্রতি ১৫ মিনিট পরে ঐ চারিটি মূর্ত্তি নড়িয়া উঠে এবং ঘণ্টা বাজায়। গাইড মেয়েটি ঘড়ি এবং উহার ঘণ্টা বাজানোর ঐতিহাসিক তথ্য জানাইলে বলিলাম—একটু অপেক্ষা

করা যাক, বাদ্য এবং দৃশ্য কিরূপ হয় দেখি। কয়েক মিনিট বাদেই মূর্ত্তি চারিটি নড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের হাতের হাতুড়ির আঘাতে বিভিন্ন সুরে ঘণ্টা বাজিল। ছোট মূর্ত্তির একটির নাম ফাদার টাইম, অন্যটির নাম এঞ্জেল।

লোগন্সে কাউন্টি কোর্ট হাউস বাড়ীটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য অসাধারণ। ইলিনয় প্রদেশের লিঙ্কন সহরে ১৮৪০ সালে এই বাড়ীটি তৈরি হয়। এখানে ঠিক সেই মডেলে বাড়ীটি নির্ম্মিত হইয়াছে। যৌবনে আব্রাহাম লিঙ্কন আইন ব্যবসায়ীরূপে মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে প্রাকটিস করিতেন। সেই আদালত ঘরটি অবিকল রাখা আছে। লিঙ্কন ব্যবহৃত আসবাবপত্র অনেকগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। বালক কালে লিঙ্কন পিতার সঙ্গে একটি কাপবোর্ড তৈরি করিয়াছিলেন। সেটি আছে। এই ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি চেয়ার। ওয়াশিংটনে থিয়েটার দেখার সময় একজন অভিনেতার গুলিতে লিঙ্কন নিহত হইয়াছিলেন। যে চেয়ারে তিনি বসিয়াছিলেন সেই চেয়ারটি রহিয়াছে। কি ভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তার ছবি এবং ঐ ঘটনার রিপোর্ট সহ পরদিনের সংবাদপত্রের সংখ্যাও রক্ষিত হইয়াছে।

মিউজিয়ামে ওয়াশিংটনের একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। তার তলায় লেখা আছে—

ওয়াশিংটন
যুদ্ধে প্রথম শান্তিতে প্রথম
দেশবাসীর অন্তরের মণিকোঠায় প্রথম

ওয়াশিংটন, জেফারসন এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতি আমেরিকানদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন বহু জায়গায় দেখা যায়।

গ্রীণফিল্ড গ্রাম দেখা শেষ হইলে সঙ্গী বৃদ্ধা নিয়া গেলেন নদীর ধারে। নদীর ওপারে একটি সহর দেখাইয়া বলিলেন—ঐ কানাডা, ঐটি হইতেছে কানাডার উইণ্ডসর সহর। নদীর উপরে পুল এবং তলায় টানেল আছে। এত কাছে আসিয়াও কানাডায় পা দিতে পারিলাম না। পাসপোর্টে কানাডা লেখান হয় নাই। সকলে এই স্থান হইতেই নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখিয়া আসে।

বৃদ্ধা বলিলেন—তুমি ত কলেজের প্রফেসার। তোমার ছাত্রদের বিনা দ্বিধায় বলিতে পার কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে ঠিক দক্ষিণে।

চোখ গোল করিয়া তাকাইতে বলিলেন—এইখানে নদীটা এমন ভাবে ভাঁজ হইয়াছে যে ডিট্রয়ট উত্তরে, উইণ্ডসর দক্ষিণে হইয়াছে।

তারপর বলিলেন—কানাডা আমেরিকা সীমান্ত হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম অরক্ষিত সীমান্ত। একটিও সীমান্তরক্ষী প্রহরী এই সীমান্তে নাই। আছে শুধু কয়েকটি ঘাঁটিতে কাষ্টমস অফিসার।

ডিট্রয়টে ওয়েন ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি একদিন এক সুইডিশ রেস্তোঁরায় নিয়া ডিনার খাওয়াইলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পত্নী এবং আর কয়েকটি অধ্যাপক। রেস্তোঁরায় শুধু মাছের বিভিন্ন রান্না। সারা আমেরিকা ঘুরিয়া আমাদের মেয়েদের মত খোঁপাবাঁধা আমেরিকান মহিলা এর পত্নীকে প্রথম দেখিলাম। এঁরই কাছে শুনিলাম এক ট্রেণ দুর্ঘটনায় ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সামাজিক ব্যবহার

বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত আমেরিকান যুবক এখানে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইহাদের ভিতর যে অসভ্যতা দেখিয়াছি তার সঙ্গে তুলনা হয় আমাদের আজকালকার এক শ্রেণীর তরুণের। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেই অতীতকে আমেরিকান তরুণেরা বহু পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে। সারাটা দেশ ঘুরিলাম কিন্তু একটা অসভ্য তরুণ দেখিলাম না। এটা শুধু আমেরিকার জিনিষ নয়, ইংলণ্ড এবং রাশিয়াতেও সাধারণ লোকের বিশেষ ভাবে তরুণদের সামাজিক আচরণ আশ্চর্য্য রকমের উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে অসভ্যতার মাত্রা যেন দিন দিন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করিতাম, প্রতিটি স্ত্রীপুরুষ তরুণ তরুণী যেন পাশের লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারে বদ্ধপরিকর। অফিসের সময় ট্রামে বাসে আমাদের মত ভীড় হয় কিন্তু একটু ধাক্কাধাক্কি নাই। যখন ইচ্ছা লাইন দেয় কিন্তু লাইন না দিয়াও এমন আশ্চর্য্য ভাবে ওঠে যে, কারও গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগে না। যদি একটু ছোঁয়া লাগিয়া গেল তো অমনি—ক্ষমা করুন (Pardon me)। দুর্দ্দান্ত ভীড়ে ট্রামে বা বাসে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে লোক দাঁড়ায় এবং ওঠানামা করে, কেহ কাহারও অসুবিধা করিবে না। বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, সানফ্রান্সিস্কো, চিকাগো প্রভৃতি বড় বড় সহরে দেখিয়াছি, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্ব্বিশেষে সমান ভদ্রতা।

বোষ্টন হইতে নিউইয়র্ক ট্রেনে চলিয়াছি। দুরপাল্লার রেলের টিকিটের মেয়াদ এক বছর। একেবারে ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত টিকিট করা আছে। মাঝপথে যে ষ্টেশনে ইচ্ছা নামা যায়, যতদিন খুসী থাকা যায়। এক বছরের মধ্যে যাত্রা শেষ করিলেই হইল। নিউ ইয়র্ক পৌঁছিবার আগে ট্রেণ কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি নিউইয়র্কে নামিয়া সাত দিন থাকিব ; আমার টিকিট ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত ; আমাকে কি কোন নোটিশ দিতে হইবে ?

কণ্ডাক্টার বলিলেন—কিছুই করিতে হইবে না। যতদিন খুসী থাকিয়া আবার রওনা হইলেই চলিবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এ রকম টিকিটের অপব্যবহার হয় না?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—হয় না তা নয়, তবে ধরে ফেলি। আর অল্প লোক ঠকাবে বলে সবাইকে ভোগাবো কেন?

আর আমাদের দেশে অল্প কয়েকটি লোক সহরতলীর টিকিটের অপব্যবহার করে এবং রেল কর্ম্মচারীরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম বলিয়া টিকিটের মেয়াদ করা হইয়াছে দুই ঘণ্টা। যাহারা আইন মানিতে চায় ইহাতে তাহাদেরই অসুবিধা হইয়াছে প্রচণ্ড। আমাদের নিয়ম—অল্পসংখ্যক অসাধুকে যখন ধরা যায় না তখন দেশশুদ্ধ লোককে ভোগাও।

নিউইয়র্কে নামিলাম। একটুখানি যাইতেই এক মহিলা পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—তুমি ভুল করেছ, এটা ওয়াশিংটন নয়, এটা নিউইয়র্ক, তুমি অসুবিধায় পড়বে।

মহিলাটি ট্রেণে আমার পিছনের সিটে ছিলেন। ট্রেণ কণ্ডাক্টারের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ওয়াশিংটন যাইব এইটুকু শুনিয়াছেন, সবটা কথা ধরিতে পারেন নাই। তাই আমাকে সতর্ক করিতে ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

বলিলাম—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি এখানে সাতদিন থাকিয়া তারপর ওয়াশিংটন যাইব।

মহিলা গিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন।

নিউইয়র্কে যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ওয়াল ষ্ট্রীট অনেক দূর। ভূগর্ভস্থ ট্রেণে গেলে অল্প পয়সায় এবং কম সময়ে যাইতে পারিব বলিয়া পাতালে ঢুকিলাম। ট্রেণগুলির গতিবিধি জানা থাকিলে অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে যাতায়াতের জন্য ঐগুলিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অচেনা লোকের পক্ষে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। প্লাটফর্ম্মে একজনকে ট্রেণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলাম—যাক, একটা অভদ্র লোক পাওয়া গেল, কথার উত্তর দিল না। ঠিক তখনি ভদ্রলোক বলিলেন—আমি ভাবিতেছিলাম সহজে যাওয়ার কোন্ রাস্তাটা বলি। এখান থেকে ওয়াল ষ্ট্রীটের পথ একটু জটিল। তারপর কোন্ ষ্টেশনে কোন্ ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিলেন। অর্দ্ধেক বুঝিলাম, অর্দ্ধেক বুঝিলাম না। আর একটি ভদ্রলোক পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—আমিও ঐ দিকেই যাইতেছি, আমার সঙ্গে চল। ট্রেণে উঠিয়া চুপ

করিয়া বসিয়া রহিলাম। দেখিতে চাহিলাম, ভদ্রলোক আমাকে ফেলিয়া নামিয়া যান কি না। তাঁর গন্তব্য ষ্টেশন আসিলে উঠিয়া আমাকে বলিলেন—এইবার নামিতে হইবে। উপরে উঠিয়া নিজে সঙ্গে নিয়া একটি রাস্তায় আসিয়া বলিলেন—এইবার এই দিকে যাইতে হইবে, বাম দিকে তিনটি রাস্তা ছাড়িবার পরেরটি ওয়াল ষ্ট্রীট। ধন্যবাদ দিয়া রওনা হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখি ভদ্রলোক যে দিক হইতে আমাকে নিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিকেই গেলেন, অর্থাৎ আমাকে ঠিক রাস্তা ধরাইয়া দেওয়ার জন্যই এই রাস্তায় আসিয়াছিলেন। আর আমাদের দেশে? হাওড়া ষ্টেশনে কলিকাতার বাস জানিতে চাহিলে শিবপুরের বাস দেখাইয়া দেয় এবং তার কথায় বিশ্বাস করিয়া লোককে ভুল বাসে উঠিতে দেখিলে দন্তপাটি বিকশিত করিয়া হাসে।

নিউইয়র্ক হইতে ফিলাডেলফিয়া চলিয়াছি ট্রেণে। সামনের জানলার ধারের আসনের লোক নামিয়া গেলেন। পিছন হইতে একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল--এই আসনটা কি খালি আছে?

বলিলাম—কেন, জানলার ধারে বসতে চাও?

সরল হাসি হাসিয়া ছেলেটি বলিল—হাঁ।

আসনটি খালি হইয়াছে শুনিয়া তারপর আসিয়া বসিল।

ফিলাডেলফিয়াতে নামিবার সময় বাঙ্ক হইতে সুটকেস নামাইতে অসুবিধা বোধ করিতেছি, ইহা লক্ষ্য করিয়া একটি তরুণ আগাইয়া আসিল। বলিল—Can I help you?—আমি কি সাহায্য করিতে পারি?

যেখানেই কোন জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা হইয়াছে, কেহ না কেহ লক্ষ্য করিয়াছে লোকটি কিছু খুঁজিতেছে এবং আগাইয়া আসিয়া বলিয়াছে—Can I help you? বোষ্টন সিটি হলে কাউন্সিলার হাইনের ঘর খুঁজিয়া পাইতেছি না। সঙ্গে সঙ্গে লোক—Can I help you? ঘরে পৌঁছিয়া ধন্যবাদ দিতে বলিল—এই সামান্য সাহায্যটুকুও যদি একজনকে না করি তো মানুষ হয়েছি কি করতে? পথ জানি, তবু ইচ্ছা করিয়া কোন কোন জায়গায় রাস্তার বা রেস্তোঁরার লোককে পথ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, একজনও অবজ্ঞা করে নাই, বা ভুল পথ দেখায় নাই।

ওয়াশিংটন হইতে উইলিয়ামসবার্গ চলিয়াছি বাসে। প্রায় ২০০ মাইল পথ।

পিছনে তিনটি তরুণ আলাপ করিতেছে। স্বাভাবিক স্বর। কথায় বুঝিলাম তিনজনেই ছাত্র। ধূমপান বন্ধ করিয়া কে কত টাকা বাঁচাইতেছে তার হিসাব করিতেছে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। হিউমার জ্ঞানও যথেষ্ট। আগ্রহের সঙ্গে শুনিতে লাগিলাম। ট্রেণে বাসে চীৎকার তো নাই-ই, কথা বলাটাই অস্বাভাবিক।

আর আমাদের দেশে? না বলাই ভাল।

একটা জাত সভ্য কি না তাহা তার সভ্যতার ইতিহাস পড়িয়া বোঝা যায় না, সে দেশের রাস্তার লোকের ব্যবহারই দেশের সভ্যতার পরিচয়। পাশ্চাত্য দেশেরা এই দিক দিয়া যত অগ্রসর হইতেছে আমরা ততই পিছাইয়া পড়িতেছি। আমাদের সম্বল অতীত গৌরব কাহিনী, তাহাদের পরিচয় বাস্তব সভ্যতা।

আমেরিকায় বাঙ্গালী

বিদেশে বাঙ্গালী চরিত্রের যে দিকটি দেখিলাম তাহাতে আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না। ফিলাডেলফিয়ার সহরতলী মিডিয়ায় লুইসদের বাড়ীতে প্রথম যে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম তাহাতে এক মুখার্জ্জি দম্পতীরও যাওয়ার কথা ছিল। ভারত সুহৃদ সমিতির মিস ফোলের বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ফিলাডেলফিয়া ষ্টেসনে গিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহরতলীর ট্রেণের প্রথম বগীতে যেন উঠি, সেখানে মুখার্জ্জিরা থাকিবেন। গ্লেনাভল এবং ফ্রীম্যান আমাকে সেই ট্রেণে তুলিয়া দিতে সঙ্গে আসিলেন। প্লাটফর্ম্মে কোন বাঙ্গালী বা ভারতীয় দেখিলাম না। ট্রেণ আসিলে গ্লেনভিল বলিলেন—মুখার্জ্জিরা হয়ত আগের ষ্টেসনে উঠিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়া সহরে দুইটি ষ্টেসন আছে। আমি যে ষ্টেসনে গিয়াছি মুখার্জ্জিদেরও সেই ষ্টেসনে উঠিবার কথা। প্রথম বগীতে উঠিলাম। কোন ভারতীয় দেখিলাম না। লুইসদের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মুখার্জ্জিরা কোথায়? শুনিলাম—তাঁহাদের কোন খবর নাই, তাঁরা আসেন নাই। ভাবিয়াছিলাম বাঙ্গলাদেশ হইতে লোক আসিয়াছে, ইহা তাঁহারা জানেন, কোথায় আমাকে পাওয়া যাইবে তাহাও জানেন, নিশ্চয়ই পরে খোঁজ করিবেন। কেহ কোন সন্ধান নিল না। প্রবাসী মানুষের পক্ষে দেশের লোক আসিয়াছে, এই সংবাদই যথেষ্ট, সে নিজেই যোগাযোগ করিয়া নেয়—ইহাই এতদিন জানিতাম।

নিউ ইয়র্কে আন্তর্জ্জাতিক ছাত্রাবাস দেখিতে গেলাম। ভাবিয়াছিলাম সেখানে হয়ত বাঙ্গালী ছাত্রের দেখা মিলিবে। প্রথমতঃ বাঙ্গলা কথা বলার জন্য হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম; দ্বিতীয়তঃ আমেরিকায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা কি ভাবে আছে তাহা জানিতে চাহিতেছিলাম। ছাত্রাবাসের ইনফরমেশন ডেস্কে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলিতে সেই মহিলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিকে টেলিফোন করিলেন। একটি মারাঠী ছাত্র—নাম ঘটকেরে—আসিল। তার সঙ্গে ঘুরিয়া ছাত্রাবাসের খাবার ঘর, বসার ঘর, খেলাধূলার ঘর প্রভৃতি দেখার সময় একটি শাড়ীপরা মেয়ে সামনে পড়িল। ঘটকেরে বলিল—এ শান্তিনিকেতন থেকে এসেছে, নাম —।

মেয়েটি বলিল—আপনি বাঙ্গালী ? ব্যস, তার পর দেখি সরিতে পারিলে বাঁচে। আমিও হাঁটা দিলাম। একটি ছেলে চট করিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল। ঘটকেরে বলিল—এটি বাঙ্গালী ছাত্র, নাম — মুখার্জ্জি।

পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে যোগ দিয়াছি। সেমিনার ভাঙ্গিবার পর দুই অধ্যাপক ডাঃ মালেনবাউম এবং ডাঃ শর্টবার্গ—যিনি সেমিনারে পেপার পড়িয়াছেন—দুজনে লড়াই লাগিয়া গেল কার সঙ্গে আমি লাঞ্চে যাইব। এমনি সময় একজন বাঙ্গালী আসিয়া আলাপ করিলেন। পরিচয় দিলেন—শিশির গুপ্ত। এ .আই. সি. সি ইকনমিক রিভিউ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে আলাপ ছিল কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তিনি ডিনারের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বলিলেন—পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বাঙ্গালী আছেন এবং অনেকে তাঁর পাড়াতেই থাকেন, তাঁরাও আসিবেন।

শিশির গুপ্ত গবেষণার জন্য আসিয়াছেন। সঙ্গে পত্নী এবং শিশু পুত্র আছে। একটি ফ্লাট নিয়া থাকেন। তিনি একাই ছিলেন। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, আর কেহ আসে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ব্যাপার ? তিনি বলিলেন —ওরা আপনাকে ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে বলেছে। উৎসাহ নিভিয়া গেল। হোটেলে ফিরিলাম।

আটলাণ্টায় নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেথডিষ্ট চার্চ্চের এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটিতেই গিয়াছি। নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী ডাঃ হেলেন কোলবর্ণ প্রথমেই বলিলেন—এখানে কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র আছে এবং একজন ভারতীয় অধ্যাপক আছেন। একটি ছাত্র এবং অধ্যাপক আপনার সঙ্গে পরিচয় করিতে চান। দুজনে সংবাদ পাইবামাত্র আসিল। ছাত্রটি মাদ্রাজী, অধ্যাপক উত্তর প্রদেশীয়, নাম সাকসেনা, অঙ্কের অধ্যাপক। ভারত হইতে একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে আসিতেছেন এই সংবাদ তাঁহারা রাখিয়াছেন এবং নিজেরা গরজ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন ছিল দেওয়ালী। জর্জ্জিয়া টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের হলে তাহারা দেওয়ালী উৎসব করিল। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ভারতীয় ছাত্র আসিয়াছে, আসে নাই এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র বাঙ্গালী ছাত্র। একটি পাঞ্জাবী ছাত্র আর একটিকে আনিয়া বলিল—এ কলকাতার ছেলে। কলকাতার কোথা থেকে ?—বাঙ্গলায় প্রশ্ন করিয়া জবাব পাইলাম ইংরেজীতে—আমি বাঙ্গালী নই, আমি বিয়ানি। এমোরি বিশ্-

বিদ্যালয়ে আমাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রেড্ডির জামাতা ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁর কন্যাও আছেন। মেয়েটি নিজেই আগাইয়া আসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিল।

ফিরিতে বেশ রাত হইল। ভাল রেস্তোঁরা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাছেই একটি ছোট রেস্তোঁরা। সেখানে ঢুকিলাম। এখানে আরও দু একবার আসিয়াছি। এরা জানিয়া নিয়াছে আমি ভারতীয়। সেদিন রেস্তোঁরার এক পরিচারিকা একজনকে দেখাইয়া বলিলেন—ইনি আমার স্বামী, যুদ্ধের সময় কলিকাতায় ছিলেন। সুরু হইল আলাপ। জিজ্ঞাসা করিলেন—লোয়ার সার্কুলার রোড এখনও আছে? মহিলা নাম ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন—দেশে ফিরিয়া নববর্ষের কার্ড না পাঠাইলে খুব দুঃখিত হইব। কার্ড পাঠাইয়াছিলাম।

রেস্তোঁরা হইতে বাহির হইতেই বাঙ্গলা প্রশ্ন—কি ব্যাপার? আপনি এখানে? পরিচিত লোক মনে হইল কিন্তু মনে করিতে পারিলাম না। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ নাই। আবার প্রশ্ন—এই রেস্তোঁরায় খেতে এসেছেন? বলিলাম—বড়টা বন্ধ হয়ে গেছে।

তিনি বলিলেন—আচ্ছা, চলি, কলকাতায় দেখা হবে।

কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিয়া শুনিলাম সেখানে ডাঃ চাটা নামে একজন ষ্টাটিষ্টিক্সের অধ্যাপক আছেন, তিনি একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ ফিলিঙ্গারের ঘরে ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি একটি উত্তর প্রদেশীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা। তাহারা পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি চিঠি পাঠাইবে, তার খসড়া ডাঃ ফিলিঙ্গারকে দেখাইতে আসিয়াছে। ডাঃ ফিলিঙ্গার ভারতীয় ছাত্রদের কতখানি ভালবাসেন তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। ছাত্রটি আলাপ করিল এবং বলিল তাহারা সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় আমাকে একটি রিসেপসন দিতে চায়। সেদিন সকাল হইতে বৃষ্টি চলিতেছে, বিকালের দিকে জোর বৃষ্টি সুরু হইল। সন্ধ্যায় ডাঃ ফিলিঙ্গারের বাড়ীতে ছিলাম। ছাত্রটি তাঁহাকে জানাইল—এত বৃষ্টিতে কিছু করা গেল না।

ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ লুইসকে বলিলাম—আমার পাশের গ্রামের একটি ছাত্র এখানে আছে, তাহাকে কি সংবাদ দেওয়া যায়?

—নিশ্চয়ই যায়। কি নাম?

—সরোজ ঘোষ, কেমিষ্ট্রির ছাত্র।

নববারাকপুরের সরোজ ঘোষ ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছেন ইহাই ধারণা ছিল কিন্তু তিনি গিয়াছেন ইণ্ডিয়ানা প্রদেশের পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা জানিতাম না। ডাঃ লুইস নিজেই তাঁর সেক্রেটারীর নিকট উঠিয়া আসিলেন। মহিলা ছাত্রদের নামের ছাপানো তালিকা দিলেন। দুটি বাঙ্গালী নাম দেখিলাম—এস. কে. ঘোষ এবং প্রদীপ ঘোষ। এস. কে. ঘোষ ভাষাতত্ত্বের ছাত্র, সুতরাং আমাদের সরোজ ঘোষ নহেন। তা ছাড়া তিনি পাঠ শেষ করিয়া কয়েকদিন আগে চলিয়া গিয়াছেন। ভাবিলাম প্রদীপ ঘোষকে ডাকিলে হয়ত সংবাদ পাইব। তাহাকে সংবাদ দিতে বলিলাম। সে জানাইল—আমার সঙ্গে দেখা করার তার কোন প্রয়োজন নাই। সেক্রেটারী মহিলা বলিলেন—এস. কে. ব্যানার্জ্জি নামে একটি ছাত্র কেমিষ্ট্রি বিভাগে দুই তিন মাস হইল আসিয়াছে। ভাবিলাম—তবে কি আমি সরোজ ঘোষের পদবী ভুল করিয়াছি? ভয়ে ভয়ে বলিলাম—তাহাকে আমার নাম জানাইয়া বলুন যদি তার ইচ্ছা হয় তবে আসিতে পারে। বিশ্বাস আছে ইনি আমাদের সরোজ হইলে এইটুকু সংবাদই তাঁর কাছে যথেষ্ট। জবাব আসিল—তিনি চেনেন না এবং আসিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না।

ঘরে ফেরার পথে দিল্লীর একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলিল।

চিকাগো বেদান্ত সোসাইটির বাঙ্গালী সাধুর কথা তো আগেই বলিয়াছি।

ওয়াশিংটনে বৌদ্ধবন্ধু সমিতির সেক্রেটারী শ্লেখ্‌ট একদিন মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে এক প্রবীণ বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয় হইল, নাম ভি. মুখার্জ্জি। যে কয়দিন ওয়াশিংটনে ছিলাম এঁর সাহচর্য্য বেশ ভাল লাগিয়াছিল। শিশির গুপ্তের মত ইনিও নিজের ফ্লাটে নিয়া গেলেন। একা মানুষ, বাড়ীতে খাওয়াইতে পারিলেন না। এঁর কল্যাণে একটি সুন্দর আরব রেস্তোঁরার সন্ধান পাইলাম এবং তদবধি সেখানেই খাইতাম।

শিক্ষার উৎকর্ষ ও জাতীয় সম্পদ

ন্যাশনাল এডুকেসন এসোসিয়েসনের রিসার্চ্চ ডিরেক্টর ডাঃ সামুয়েল ল্যাম্বার্টের সহিত সাক্ষাতের কথা আগে বলিয়াছি। শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষার সময় হ্রাসের যে অদ্ভুত পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এখানে দিলাম :

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদিগকে নূতন পথে নূতন পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার মনে হয়, শিক্ষকদের বেতন ১০০ বা ২০০ ডলার (৫০০ বা ১০০০ টাকা) বৃদ্ধির কথা শুনিয়া লোকে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন কি উপায়ে শিক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে অগ্রসর করিতে পারা যায় লোকে তাহাই এখন জানিতে চায়।

আমার প্রথম কথা হইতেছে এই যে, ট্যাক্সের টাকায় যে সব কাজ চলিতেছে তার অনেকগুলিই লগ্নী হিসাবে উৎকৃষ্ট। কতকগুলি এত ভাল যে, লগ্নীর সবটাই যে দেশের লোক এবং রাষ্ট্র ফেরৎ পায় তাহা নহে, খুব চড়া সুদে টাকাটা ফেরৎ আসে। আমি আদর্শ, সুখ এবং গণতন্ত্রের কথার পরিবর্ত্তে একেবারে কাঠখোট্টা কথাই বলিতেছি। আমার মতে এই সমস্ত লগ্নীর জন্য শিক্ষা হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, শিক্ষা যখন প্রয়োজন, লগ্নী এবং টাকা দিয়া যখন উহা কিনিতে হইবে তখন লোকে সব চেয়ে ভাল শিক্ষাই কিনিতে চাহিবে।

সরকারের টাকায় যে সব কাজ হইতেছে তার কতকগুলির ফল এত ভাল হইতেছে যে, তাহাতে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হইতেছে। আমি উহাদিগকে উচ্চ লভ্যাংশের লগ্নী (high dividend investment) বলিয়া অভিহিত করিতে চাই।

সরকারের টাকায় জাতীয় সম্পদ কি ভাবে বাড়ে তার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত কৃষি। কৃষিতে যে উন্নতি হইয়াছে তার একটি প্রধান কারণ শিক্ষা বিস্তার। এই শতাব্দীর আরম্ভে আমেরিকার শতকরা ৯০ জন লোক খাদ্য ও তুলা উৎপাদনে

নিযুক্ত ছিল। রাশিয়ায় এখনও এই কাজে শতকরা ৫০ জন নিযুক্ত রহিয়াছে। আমেরিকায় এখন আমরা শতকরা মাত্র ১০ জন লোকের সাহায্যে আমাদের খাদ্য ও কৃষিজ পণ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছি। ১৯৪০ হইতে ১৯৬০ এই দুই দশকে তুলা উৎপাদন হইয়াছে একর প্রতি ২৩৯ হইতে ৪৪৮ পাউণ্ড; গম ২৫·৯ হইতে ৫৩ বুশেল; চীনাবাদাম ৭৬৪ হইতে ১২৫৯ পাউণ্ড এবং তামাক ৯০৯ হইতে ১৭১৩ পাউণ্ড। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৬০ এই কয় বৎসরে কৃষি শ্রমিকের প্রতি জনে প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৯৬।

এই আশ্চর্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি কিরূপে ঘটিল? ইহার কারণ বিজ্ঞানসম্মত কৃষি এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে শিক্ষা বিস্তারে। কৃষি কলেজ এবং কৃষি পরীক্ষাগারে নূতন বীজ এবং নূতন চাষের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, নূতন যন্ত্রের ব্যবহার শেখানো হইয়াছে। কৃষি কলেজ কৃষকদের নূতন পদ্ধতি শিখাইয়াছে এবং কৃষক নেতা তৈরি করিয়া দিয়াছে। শিক্ষার ফলে নূতন আবিষ্কারের মর্ম্ম বোঝা এবং উহা কাজে লাগাইবার ক্ষমতা কৃষকেরা অর্জ্জন করিয়াছে।

তৃতীয় কারণ, কৃষি কলেজ এবং গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন। দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো কৃষকদের সঙ্গে কৃষি এজেণ্টরা টেলিফোন লাইনের মত কাজ করিয়াছে। প্রথমে অনেকেই এই কাজটি অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন সকলেই বুঝিয়াছেন, কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সমগ্র জাতি লাভবান হইয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারের টাকা লগ্নী। দেশের লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক লাভ যথেষ্ট হইয়াছে। লোকে এখন বেশীদিন বাঁচে, বেশী সময় কাজ করিতে পারে। শুধু তাই নয়, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ কমিয়া যাওয়ায় কাজে অনুপস্থিতি অনেক কমিয়াছে। ইহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে শ্রমিক প্রতি রোগে অনুপস্থিতির হার যেখানে ছিল শতকরা ১০·১, ১৯৬০-এ সেখানে উহা হইয়াছে ৫·৬। খুব কম করিয়া ধরিলেও ইহার ফলে বেশী সময় কাজ করিতে পারে বলিয়া শ্রমিক প্রতি আয় বাড়িয়াছে ৩৪০·৮৫ টাকা। সব শ্রমিক ধরিলে মোট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৫০০ কোটি টাকা। রোগ কমিয়া যাওয়ায় এই টাকা বেশী আয় হইয়াছে, অথচ ঔষধ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় সূত্রে মোট খরচ হইয়াছে ৬৩·৫ কোটি

টাকা। ঔষধ সম্পর্কে গবেষণার একটা মোটা অংশ আমরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-দের নিকট হইতে পাই। ইহা ছাড়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল স্কুল বৃদ্ধি, গবেষণা প্রভৃতিতে সরকারেরও প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। স্কুলগুলিও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। ব্যাপক ভাবে টাকা দিয়া সাধারণ লোককে যখন রোগ হইতে বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটে তখন স্কুলগুলি আগাইয়া আসে। এখন আমাদের দেশ হইতে বসন্ত রোগ নির্মূল হইয়াছে। টাইফয়েড এবং ডিপথিরিয়ার মৃত্যুহার এক লক্ষে ১৫·৩ হইতে ১৯২০ সালের পর প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে ২০৭·৩ হইতে ৩৬·৬ হইয়াছে। ইহাতে অর্থ নৈতিক লাভ কতটা হইয়াছে তাহার হিসাব অত্যন্ত কঠিন, তবে তাহা যে বহু সহস্র কোটি টাকা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানুষ তৈরিতে লগ্নী (investment in human beings) এবং শিক্ষার অর্থ নৈতিক লাভ কতটা হয় তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কারিগরি শিক্ষার দ্বারা পুনর্ব্বসতি। ১৯৬০ সালে ৮৮২৭৫ জন বিকলাঙ্গ লোক নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহারা কর্ম্মরত অবস্থায় বিকলাঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণ রূপে পরিবার বা সেবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক পটুতার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ইহারা পুনরায় উপার্জ্জনশীল হইতে পারিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২৬ শতাংশ দক্ষ অথবা আধা-দক্ষ শ্রমিক হইতে পারিয়াছে, ১৭ শতাংশ কেরাণী বা দোকানের কাজে ঢুকিয়াছে। ইহাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে টাকা খরচ হইয়াছে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে তার প্রতি ডলারে ৭ হইতে ১০ ডলার ইহারা শুধু আয়কর বাবদ গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দিতে পারিবে। পুনর্ব্বসতির পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে ১৮ হাজার জন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইত। সাহায্যের পরিমাণ ছিল বার্ষিক সাড়ে আট কোটি টাকা। ইহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে খরচ হইয়াছে ৮ কোটি টাকা। এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ কোন্ লগ্নীতে পাওয়া যায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ এবং আইনসভার প্রতিনিধিদের বুঝাইতে হইবে যে, উন্নত শিক্ষায় বেশী টাকা খরচ করিলে সেই টাকা শুধু যে ব্যক্তির কাছে ফেরৎ আসে তাহা নহে, দেশের অর্থনীতি ইহাতে সমগ্র ভাবে উন্নত হয়। উচ্চ-শিক্ষায় এক ডলার খরচ করিলে কয়েক বৎসর পরে তাহা সুদসমেত ফিরিয়া আসে ইহা প্রমাণ করাই আমাদের সমস্যা। আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা প্রমাণ

করিবার উপযুক্ত হিসাব আমাদের হস্তগত হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু তথ্য হাতে পাইয়াছি তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

গত দশ বছরে আমাদের জাতীয় আয় কি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহা সকলের জানা আছে। ১৮৭০ হইতে আমেরিকার নীট জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৩·৫ শতাংশ, তন্মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন বৃদ্ধির হার ১·৭ শতাংশ। অবশিষ্ট ১·৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয়ের অর্দ্ধেক, তবে কোথা হইতে আসিতেছে? মূলধন বলিতে আমরা যাহা বুঝি এবং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হিসাবের জন্য তার প্রতি ঘণ্টায় কাজের যে হিসাব ধরি তাহা দ্বারা এই ১·৮ শতাংশ অতিরিক্ত বৃদ্ধির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই বৃদ্ধির কারণ শিক্ষার দ্বারা শ্রমরত জনসমষ্টির কর্ম্মক্ষমতার উন্নতি—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আব্রামোভিৎস এবং কেনড্রিক উভয়ের গবেষণাতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ডাঃ শূল্জ বলিতেছেন—Human investment-এর হিসাব ধরিলে আমাদের অর্থনীতির অনেক জটিলতা ও সমস্যা সরল হইয়া যায়। একজন কৃষককে কারখানার কাজে ঢুকাইয়া দিলে তার উৎপাদন সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে কম হয়। তেমনি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান অপেক্ষা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের উৎপাদন হার কম, ইহার একমাত্র কারণ তার শিক্ষার মান কম। উপার্জ্জন ক্ষমতা শিক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কৃষি কাজ ছাড়িয়া যাহারা সদ্য সহরে আসিতেছে তাহাদের অধিকাংশই স্কুলের ভাল শিক্ষা পায় নাই। স্বাস্থ্যও খারাপ। ইহাদের উপার্জ্জন অপরের তুলনায় কম হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সহরের যে সব তরুণ কারখানায় ঢুকিতেছে তাহারা স্কুলে ১২ বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছে, পুরাণো শ্রমিকদের অধিকাংশই ৬ বৎসরের বেশী স্কুলে শিক্ষা পায় নাই।

ন্যাশনাল বুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের ডিরেক্টরদের নিকট রিপোর্টে ফাব্রিকান্ট ১৯৫৪ সালে বলিয়াছেন:

১৯৫৩ সালে আমেরিকায় একটি সাধারণ পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ৫ হাজার ডলার বা ২৫ হাজার টাকার কিছু বেশী। দেশে শিক্ষার উন্নতি যদি বর্ত্তমান হারেও চলিতে থাকে তবে আগামী ৮০ বৎসরে আমাদের পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা ১৯৫৩ সালের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় বার্ষিক ২৫ হাজার ডলার অর্থাৎ এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিবে। এখন দেশে সর্ব্বোচ্চ এক শতাংশ লোক এই টাকা রোজগার করে।

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সারা জীবনে কত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে তার হিসাব সকলেই দেখিয়াছেন। অল্পদিন হইল আমরা আধুনিক হিসাব পুরাণো হিসাবের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। হারমান মিলার ১৯৪৯ এবং ১৯৫৮ সালের তথ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের উপার্জ্জনের পার্থক্য যে শুধু মোট অঙ্কের হিসাবে বাড়িতেছে তাহা নহে, শতাংশের হারেও উহা বাড়িয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত:

১৯৪৯-এ একটি যুবক ৮ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার পর ১৮ বৎসর বয়স হইতে সারা জীবনে ১৩২,৬৮৩ ডলার, (আমাদের সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা) উপার্জ্জনের আশা করিয়াছে। ১৯৫৮ সালে সে ১৮১,৬৯৫ ডলার উপার্জ্জনের আশা করিয়াছে। এই নয় বৎসরে সারাজীবনের উপার্জ্জনের আশা ৩৬·৯ শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ১৯৪৯-এ উপার্জ্জনের আশা করিয়াছে ১৮৫,২৭৯ ডলার, ১৯৫৮-তে তাহা দাঁড়াইয়াছে ২৫৭,৫৫৭ অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি। আবার কলেজের গ্রাজুয়েট ১৯৪৯-এ যেখানে আশা করিয়াছে ২৯৬,৩৭৭, ১৯৫৮-তে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪৩৫,২৪২ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৬·৯।

ইহা হইতে প্রাথমিক ও হাইস্কুল শিক্ষা এবং হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষার ফলে উপার্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি বুঝা যাইবে। ১৯৫৮-তে হাইস্কুল পাশ ও প্রাথমিক স্কুল পাশ ছাত্রের উপার্জ্জন ক্ষমতার পার্থক্য ছিল ৭৫,৮৬২ ডলার এবং হাই স্কুল ও কলেজ গ্রাজুয়েটের পার্থক্য ছিল ১৭৭,৬৮৫ ডলার অর্থাৎ ৬৯ শতাংশ। ১৯৫৮-তে সাধারণ একটি কলেজ গ্রাজুয়েট সারাজীবনে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র অপেক্ষা ২·৪ গুণ বেশী টাকা উপার্জ্জনের আশা করিতে পারিয়াছে। অবশ্য এই আয়বৃদ্ধির আরও কারণ আছে কিন্তু শিক্ষা যে সর্ব্বপ্রধান কারণ ইহাতে এখন কোন সন্দেহ নাই।

কলেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিলে তাহা কিভাবে ফেরৎ আসে তার হিসাব ধরা যাক। একজন লোক সারাজীবনে ৪৩ বৎসর কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারে ধরিলে স্কুল ও কলেজী শিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের প্রতিদান (return on the cost of a College education) আসে বছরে ৪০০০ ডলার। কলেজী শিক্ষার ফলে একজন লোক ৪৩ বৎসর এই বাড়তি টাকা উপার্জ্জন করিতে থাকিলে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় ট্যাক্সে গবর্ণমেণ্ট বহু টাকা বেশী লাভ করেন। খুব কম করিয়া ধরিলেও এই বাড়তি ৪ হাজার ডলারের এক হাজার গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে

ঢুকিবে। বাকি ৩০০০ ডলারকে শিক্ষার লগ্নীর সুদ হিসাবে কষিলে দেখা যাইবে যে, প্রাইভেট সেক্টারে লগ্নীতে কোন ক্ষেত্রেই এত বিপুল লাভ হয় না। প্রাথমিক এবং হাই স্কুল শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে পার্থক্য হয় ১৬০০ ডলার। হাই স্কুল শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চেয়ে বেশী রোজগার করে একথা ঠিক, কিন্তু হাই স্কুলের তুলনায় কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের উপার্জ্জন অনেক বেশী হয়।

অনেকে বলিতে পারেন উচ্চশিক্ষা দ্রুত এবং বেপরোয়া বাড়াইতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত শ্রমিক বাড়তি (surplus) হইয়া যাইবে। ফলে যে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে তাহাতে ব্যক্তিগত উপার্জ্জন কমিতে থাকিবে।

আমার বিশ্বাস, এই অবস্থা শীঘ্র দেখা দিবার কোন আশঙ্কা নাই। এখনকার বেকার সমস্যা হাই স্কুল শিক্ষার নীচের স্তরে সীমাবদ্ধ। আগামী এক বা দুই দশকে এই সমস্যাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া থাকিবে। হাই স্কুলে পড়িতে পড়িতে যাহারা মাঝপথে পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহারাই শ্রমিক-মার্কেটে ভিড় জমায়। আরও অন্ততঃ দশ বৎসর আমাদের দেশে এই অবস্থা চলিতে থাকিবে এবং এই যুবকেরাই আমাদের অর্থনীতির উপর সব চেয়ে বড় বোঝা হইয়া থাকিবে।

আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি মানব জীবনের সকল কাজে গবর্ণমেণ্টকে টানিয়া আনিতে চাই না। গবর্ণমেণ্টের এমন সব প্রোগ্রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যাহার দ্বারা সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক উন্নতিতে কোন সাহায্য হয় নাই। কৃষির ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত এখনই অনেক দেওয়া যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন আমি কেন ডলার লগ্নী এবং ডলার ফেরৎ প্রাপ্তিতে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিতেছি। আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিয়াছি, কারণ উচ্চশিক্ষার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক আর যে সমস্ত লাভ হইবে তাহা ডলারে হিসাব করা যায় না। এই জন্য আমি পাকা ব্যবসায়ীর মত টাকার হিসাবটা শুধু দেখাইয়াছি।

আমাদিগকে এখন এই কয়টি পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতে হইবে :

শিক্ষক শিক্ষণের সময় বাড়াইতে হইবে এবং এই শিক্ষায় আরও গভীরতা আনিতে হইবে। এখন শিক্ষক শিক্ষণের সময় চার বৎসর। উহা বাড়াইয়া ছয় বৎসর করিলে আমরা আরও অনেক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক পাইব। শিক্ষককে শুধু

সাধারণ শিক্ষা নিলেই চলিবে না, প্রত্যেক শিক্ষককে ভাল ভাবে রসায়ন পদার্থ-বিদ্যা ও অঙ্ক জানিতে হইবে। ছয় বৎসর শিক্ষার পর শিক্ষক এম. এ. ডিগ্রী পাইবেন। এখন শিক্ষক শিক্ষণের শেষে বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষক শিক্ষণ দুই বৎসর বাড়াইয়া দিলে শিক্ষকদের দক্ষতা এখনকার তুলনায় ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ বাড়িয়া যাইবে। আমেরিকান জনসাধারণকে আমরা যদি এত ভাল শিক্ষক দিতে পারি তবে তাহারা শিক্ষকদের বার্ষিক ৬০০০ হইতে ১২০০০ ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকা বেতন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।

শিক্ষক দক্ষ হইলে ছাত্রের মোট শিক্ষার কাল ১২ হইতে ১০ বৎসরে নামাইয়া আনা যাইবে। আমাদের স্কুলে মোট ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে। এদের ১৫ বা ২০ শতাংশের শিক্ষা কেন ১০ বা ১১ বৎসরে শেষ করা যাইবে না, আমি তাহা বুঝি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষক উপযুক্ত হইলে এ কাজ মোটেই কঠিন হইবে না।

আবার একটু অঙ্ক কষি। নবম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ২৫ লক্ষ। শিক্ষক ভাল হইলে এদের ২০ শতাংশ বা ৫ লক্ষের শিক্ষা বাকি চার বছরের জায়গায় তিন বছরে শেষ করা যায়। ইহাতে এক বছরে ছাত্রপিছু ৫২৪ ডলার হিসাবে মোট ২ কোটি ৬২ লক্ষ ডলার বাঁচিয়া যাইবে। প্রথম শ্রেণী হইতে হিসাব ধরিলে বলা যায় উহার ৫ শতাংশকে ১২ বছরের শিক্ষা ১০ বছরে দেওয়া যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৭ লক্ষ। ইহার ৫ শতাংশ হইতেছে ১৮৫,০০০। এদের জন্য গড়ে ছাত্রপিছু ৪৪২ ডলার হিসাবে দুই বৎসরের টাকা বাঁচিলে মোট টাকা বাঁচিবে ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার। কয়েক বৎসর বাদে একটা খুব মোটা বার্ষিক সঞ্চয় দাঁড়াইয়া যাইবে।

এই টাকার দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্থলে এম. এ. ডিগ্রী সমেত ছয় বৎসরের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবে। এম. এ. ডিগ্রী সমেত মোট ৮০ হাজার শিক্ষক প্রয়োজন হইবে। এখন শিক্ষকদের বার্ষিক প্রারম্ভিক বেতন ৪০০০ ডলার। এম. এ. পাশ শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ৬০০০ ডলার দিতে হইলে যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইবে তাহা ঐ সঞ্চয়ের টাকাতেই কুলাইয়া যাইবে।

জাতীয় উন্নতির জন্য যতপ্রকার লগ্নী আমরা করি তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক লগ্নী হইতেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় ধর্ম্ম

আমেরিকা চূড়ান্ত বস্তুতান্ত্রিক দেশ, পার্থিব সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আমেরিকানরা আর কিছু বোঝে না, ধর্ম্মের ধার এরা ধারে না, এরা যুদ্ধকামী, যুদ্ধ ছাড়া এদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক কাঠামো টি ঁকিতে পারে না—আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই ধারণা প্রচলিত এবং আমার নিজেরও অনেকটা এই ধারণাই ছিল। গিয়া দেখিলাম ইহারা সেই স্তর অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। সমাজ এবং অর্থনীতির কাঠামো আমূল বদলাইয়া ফেলিতেছে। সামাজিক ব্যবহারের কথা আগেই বলিয়াছি। এবার বলিব উহাদের ধর্ম্ম প্রগতির কথা।

সমাজ জীবনে ধর্ম্মকে আমেরিকানরা কতটা স্থান দিয়াছে তাহা বেশ তীব্র-ভাবেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক শনিবারের সংবাদপত্রে একটা, কোন কোনটিতে একাধিক পৃষ্ঠা ভর্ত্তি থাকে গির্জ্জার সংবাদ—কোন্ গির্জ্জায় কোন্ পাদ্রী কি বিষয়ে বলিবেন তার সংবাদ। প্রতি রবিবার কোন না কোন গির্জ্জায় যাইতাম। ক্যাথলিক, ইউনিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন গির্জ্জায় গিয়াছি। গির্জ্জার হল প্রায় প্রত্যেকটিই বড়। সাত আট শত বা হাজার লোক বসার মত হল প্রায় প্রতি গির্জ্জাতেই আছে। নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি বৃহৎ গির্জ্জা আছে, উহাতে সাড়ে তিন হাজার লোক এক সঙ্গে বসিবার ব্যবস্থা আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে কেম্ব্রিজ ফার্ষ্ট ইউনি-টেরিয়ান চার্চ্চ, তার হলটিও বেশ বড়। এই গির্জ্জায় জর্জ্জ ওয়াশিংটন আসিতেন।

পাদ্রীদের সারমন বা বক্তৃতা খুব উচ্চস্তরের। ওয়াশিংটনের ফার্ষ্ট ইউনি-টেরিয়ান গির্জ্জার পাদ্রী ডাঃ ডানকান হাওলেটের যে সারমন শুনিয়াছি তাহার তুলনা খুব কম আছে। যতক্ষণ বলিতেছিলেন, তাঁর চোখ সামনের বক্তৃতার ডেস্কের দিকে বেশীর ভাগ নিবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল তিনি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিতেছেন। সারমন শেষ হইলে তাঁহার নিকট উহার একটি

অনুলিপি চাহিলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়া মাথা দেখাইয়া বলিলেন—It is up here (এটা এখন এখানে আছে)। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি তবে লিখিত সারমন পাঠ করেন নাই ?

হাসিয়া বলিলেন—না।

এদের উপাসনা পদ্ধতিতে ভক্তিমূলক সমবেত সঙ্গীত এবং সমস্বরে সমবেত প্রার্থনা প্রধান। সমবেত সঙ্গীত এবং প্রার্থনার সময় সকলে উঠিয়া দাঁড়ায়। একজন পাদ্রীর প্রার্থনা বা উপদেশ শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসে না, সকলে মিলিয়া উপাসনা এবং প্রার্থনায় যোগ দেয়। সকলের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিবার এটি একটি উপায়।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য জিনিষ দেখিলাম গির্জ্জা ভাণ্ডারে দান। বেলা ১১টা ১২টা উপাসনার সময়। মাঝখানে ১১॥টা নাগাদ offertory হয়। এই সময় ছয়জন লোক আসিয়া পাদ্রীর সামনে লাইন করিয়া দাঁড়ায়। পাদ্রী তাহাদের হাতে ছয়টি চুবড়ি দেন। এক একজন এক একটি চুবড়ি নিয়া প্রত্যেক বেঞ্চে যায় এবং সকলে উহাতে তাহাদের দানের টাকা ফেলিয়া দেয়। এক ডলারের কম দিতে খুব কম লোককে দেখিয়াছি। অনেকে দেখিতাম বাড়ী হইতে খামে করিয়া টাকাটা নিয়া আসে এবং সঙ্গের একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের হাত দিয়া খামটি চুবড়িতে দেওয়ায়। গির্জ্জায় দান একটি পবিত্র কাজ এই ধারণা শিশুমন হইতে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করে। গির্জ্জায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা তরুণ তরুণী বালক বালিকা সকল স্তরের লোক আসে। কোন গির্জ্জাতেই সপ্তাহে ৫০০ ডলার বা আড়াই হাজার টাকার কম আদায় হয় না।

আমাদের ধর্ম্ম মন্দিরে দানের কথা মনে করিলে দুঃখ হয়। বৃন্দাবনের মন্দির-গুলির যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় আর ৫০ বছর পরে ঐ সমস্ত প্রাচীন মন্দিরের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। বৃন্দাবনের একটি মন্দিরের পুরোহিতকে বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙ্গলাদেশে জমিদারী উচ্ছেদের পরেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; জমিদারেরা মন্দির রক্ষা করিতেন; জমিদারী গিয়াছে, মন্দিরও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে; শিল্পপতিরা মন্দিরের দিকে তাকায় না। সংস্কার অভাবে মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমেরিকার সভ্যতা শিল্প সভ্যতা। কিন্তু তাহারা তাহাদের মন্দির গির্জ্জাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে নাই। গির্জ্জাগুলিকে শুধু বাঁচাইয়া রাখা নয়,

উহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে তাহারা যত্নবান। গির্জ্জার পাদ্রীর কাজ যে সে করিতে পায় না, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ডিভিনিটির স্থান সর্ব্বোচ্চে। জর্জ্জিয়া প্রদেশের রাজধানী আটলাণ্টাতে টেকনিকাল এবং ডিভিনিটি ইনষ্টিটিউট পাশাপাশি অবস্থিত। একটি ট্যাক্সি ড্রাইভার ঐ দুটি দেখাইয়া বলিল—একটি আমাদের দেহের অন্নের ব্যবস্থা করে, অপরটি জোগায় আত্মার খোরাক। শিল্প সভ্যতায় ধর্ম্মের স্থান আছে, আমেরিকায় ইহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ধর্ম্মপ্রবণতাকে শিশুকাল হইতে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দেখিয়াছি। টেক্সাসে উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ব্রাবামের বাড়ীতে ছিলাম। দ্বিতীয় দিন ছিলাম মিঃ লী-র বাড়ীতে। দুই বাড়ীতেই দেখিলাম সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যেক বার খাওয়ার সময় মা বাবা ছেলে মেয়ে একসঙ্গে টেবিলে বসে। প্রথমে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান একটি ছোট প্রার্থনা করে—হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের এই খাদ্য দিয়াছ, আমরা যেন উপযুক্ত হইতে পারি ইত্যাদি, তারপর খাবারে হাত দেয়। অন্য দুই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। সেখানেও এই একই প্রকার প্রার্থনা। সহরের মেয়র লাঞ্চ দিয়াছেন, সেখানে মেয়র প্রার্থনা করিলেন। সিটি কাউন্সিল এমন কি কংগ্রেসেও প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হয়, তারপর কাজ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক কাজে ধর্ম্মের একটি আবহাওয়া সৃষ্টি এবং বজায় রাখিবার দিকে আমেরিকানরা খুব বেশী ঝুঁকিয়াছে।

সব আমেরিকান ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু যে জিনিষটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, দেশের নেতারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই দিকে জোর দিতেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিনিটি স্কুলের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তি ডাঃ পল টিলিক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম সময় পাইয়াছিলাম। উহার মার্শাল অফ দি এলামনাই (Marshal Alumnii) ডাঃ রাফকে বলিলাম—আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁকে আপনারা সর্ব্বোচ্চ ইনটেলেকচুয়াল মনে করেন আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলে খুব আনন্দিত হইব। ডাঃ পল টিলিকের সঙ্গে তিনি পরদিন সাক্ষাতের সময় ঠিক করিয়া দিলেন। এক ঘণ্টা আলাপ হইল। তার পরেই টিলিকের একটি বক্তৃতা ছিল। তিনি সেখানে তাঁর সঙ্গে যাইতে বলিলেন কিন্তু আমার পরবর্ত্তী প্রোগ্রাম নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া দুঃখিত চিত্তে উহা বাতিল করিতে হইল।

পল টিলিকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি শুনিয়া বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী সম্মান পাইয়াছিলাম।

টিলিকের সঙ্গে আলোচনায় বুঝিলাম আমেরিকা ধর্ম্মের উপর বিনা কারণে জোর দেয় নাই। নিছক অর্থ উপার্জ্জন এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবন যাপন মানুষের একমাত্র আদর্শ হইয়া উঠিলে সেই সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উহার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের বনিয়াদ ছাড়া মানুষ বা সমাজ কাহারও জীবন বিকাশ লাভ করিতে পারে না। অর্থ মানুষের সুখ আনে, কিন্তু ধর্ম্ম আনে শান্তি। কোনটারই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দুটির সমন্বয়ই প্রকৃত বাঞ্ছনীয়। আজিকার যুগের বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ Existentialism সম্বন্ধে টিলিকের আদর্শ আমেরিকানরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে। ওয়াশিংটনে বৌদ্ধধর্ম্মের বন্ধু অনেক আমেরিকান আছেন। তাহাদের নেতা শ্লেখ্ট এই মতবাদ নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও দেখিলাম সার্ত্রের যুক্তি ছিন্ন করিয়া টিলিকের অনুসরণ করিয়াছেন।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday School) আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি খুব বড় জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। রিভারটন শহরে নেলসনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। ফিলাডেলফিয়ায় রুজভেল্ট হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়া নিলেন নেলসন। রিভারটন পৌঁছিয়া সকলের আগে গেলেন পাদ্রীর বাড়ী। সেখান হইতে তাঁর পুত্র রবিন এবং কন্যা ক্যাথিকে তুলিয়া নিলেন। পাদ্রীর বাড়ীতে রবিবার সকালে নীতিশিক্ষার স্কুল বসে।

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পর সারাটা দেশের নৈতিক মান এবং ব্যক্তিগত জীবনে চরিত্রের মর্য্যাদা দারুণ কমিয়া যায়। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে চলিতে আরম্ভ করে অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ। সাধারণ মানুষের দুর্গতির চূড়ান্ত হইতে থাকে। একশত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকান সমাজে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল আমরা বর্ত্তমানে তাহারই ভিতর দিয়া চলিয়াছি। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। রোম, ইংলণ্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি বহু দেশে এরূপ অবস্থা কোন না যুগে আসিয়াছে। আমেরিকায় রেলওয়ে নির্ম্মাণ নিয়াই দুর্নীতি চরমে ওঠে। আজ সেই রেলওয়ে বাস এবং এরোপ্লেন প্রতিযোগিতার চাপে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উইলিয়াম ভ্যাণ্ডারবিল্ট রেল-সম্রাট নামে অভিহিত হইতেন। তিনি একদিন সাফ কথা বলিয়া দিলেন—জনসাধারণ আবার

কি? জনসাধারণ জাহান্নামে যাক। ১৮৭৩ সালে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল লাইন নির্ম্মাণের সময় ধরা পড়িল কংগ্রেস সভ্যেরাও ঘুষ নিয়াছেন, অনেকের নামেই বিনা পয়সায় মোটা শেয়ার বরাদ্দ হইয়াছে। রেল কর্পোরেশন দুর্নীতির তদন্ত যাহাতে সভ্যেরা চোখ বুজিয়া করেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সব লোক দুর্নীতি সহ্য করিল না। নিউ ইয়র্কের ট্যামানি অর্গানাইজেসনের নেতা টুইডকেও শেষ পর্য্যন্ত শাস্তি পাইতে হইল।

এই সময়ে একটি তর্ক বাধিয়াছিল যে অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাদ্রীদের করা উচিত হইবে কি না। প্রেসবিটারিয়ান পাদ্রী রেভারেণ্ড চার্লস্ প্যাকহার্ট বলিলেন—অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন নিয়াই সমাজ, সুতরাং সামাজিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির প্রতিবাদ পাদ্রীরা অবশ্যই করিবেন। ট্যামানি হল দুর্নীতির প্রতিবাদ অতিশয় জোরের সঙ্গে তিনি আরম্ভ করিলেন। তাঁরই ধাক্কায় ১৮৯৪ সালে উহার অবসান ঘটিল। প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টের শাসনকালে গবর্ণমেণ্টের সকল স্তর দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিলে দেশের সাধারণ লোকের কি দুর্গতি হয় অনেকেই তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিবাদের দায়িত্ব নিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন পাদ্রীদের একটি দল।

ডাঃ উইলবার ক্রাক্‌ট্‌স ১৮৯৫ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জ্জাতিক রিফর্ম্ম বুরো স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কারের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পাদ্রীরা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর সংগ্রাম —এক কথায় পিউরিটানিজ্‌ম—প্রবর্ত্তনের দিকে ঝুঁকিলেন। বলডান্স, জুয়াখেলা থিয়েটারে যাওয়া, ধূমপান এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হইল। থিয়েটার ক্লাব প্রভৃতিতে যাহারা উহাতে উৎসাহ দেয় তাহাদের প্রকাশ্যে তীব্র নিন্দা চলিতে লাগিল।

এই নিন্দা কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামিতে পর্য্যবসিত হইল না এবং এইখানেই রহিয়াছে আমেরিকান সংস্কার আন্দোলনের বিশেষত্ব। পাদ্রীরা দেখাইলেন যে ধর্ম্ম কেবল মাত্র গির্জ্জায় সীমবদ্ধ নয়, উহাকে ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন আচরণের অঙ্গীভূত করিয়া নিতে হয়। ধর্ম্মের শেষ কথা বাইবেল নহে, ধর্ম্মের প্রকৃত কথা হইতেছে যুক্তি এবং শুভবুদ্ধি। একটা কোন বিশেষ ধর্ম্ম আঁকড়িয়া থাকিলে মুক্তি আসে না, প্রতিবেশীর প্রতি উদার ভালবাসার ভিতর দিয়াই মুক্তি আসে। এই নূতন

শিক্ষা, নূতন থিওলজির কেন্দ্র হইল হার্ভার্ড এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। ইঁহারা শিখাইলেন যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূলে রহিয়াছে যুক্তি, অন্ধ বিশ্বাস যুক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেই। সেইরূপ অকল্যাণের উপর কল্যাণের জয় হইবেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর হইতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সংস্কৃত দর্শন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে যত্নবান হইয়াছিল। ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তাহারা করিয়াছে। ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে পবিত্রতা আনয়নের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বিষয়ে প্রেরণা হার্ভার্ড এবং ইয়েলের নূতন থিওলজি নেতারা পাইয়াছিলেন কি না তাহা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্দ্ধনা বিনা কারণে হয় নাই। এই গবেষণা বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু তার সুযোগ মিলিবে কি না জানি না। আমাদের হিতোপদেশে একটি শ্লোক আছে :

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং
বিনয়াৎ যাতি পাত্রত্বম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি
ধনাৎ ধর্ম্ম ততঃ সুখম্॥

বিদ্যা সংযম দান করে, সংযম করিলে যোগ্যতা আসে। যোগ্যতা থাকিলে ধনোপার্জ্জন সহজ হয়। ধন হইতে স্বাচ্ছন্দ্য আসিলে ধর্ম্মাচরণ সহজ হয় এবং ধর্ম্ম হইতে আসে সুখ। আমরা এখন বিনয় বলিতে বুঝি নম্রতা, কিন্তু শ্লোকটি যে যুগের লেখা সে যুগে উহার তাৎপর্য্য ছিল শৃঙ্খলা বা সংযম। ধন ও ধর্ম্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং উভয়ের মিলনে আসে প্রকৃত সুখ—এ তথ্য ভারতবাসী জানিত। হিতোপদেশ হইতে আমেরিকান পাদ্রীরা আমাদের শিক্ষা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন এই ধারণা অমূলক নহে। আমেরিকান পাদ্রী-দের কি অসামান্য অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা থিওলজি সেমিনারের ক্লাসে যোগ দিয়া এবং ডাঃ ডানকান হাওলেট, রেভারেণ্ড পিটারসন, ডাঃ জন বেনেট প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ পাদ্রীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের গুরুত্ব কি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে নিম্নোক্ত তথ্যে তাহা বুঝা যাইবে :

বয়স বৎসর		রবিবাসরীয় স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যার শতাংশ
২	...	৭·২
৩-১২	...	৩৮
১২-২৩	....	১৯·৫
২৪ এর বেশী	...	৩৫·৩

ইহা ১৯৫৮ সালের তথ্য। ঐ বৎসর মোট ৩,৯৫,৬৪,৯২৫ জন ছাত্রছাত্রী রবিবাসরীয় স্কুলে যাইত। উহা জনসংখ্যার ২২·৭ শতাংশ। ১৯২৬-এ ঐ অনুপাত ছিল ১৭·৯। ১৯৫৮ সালে রবিবাসরীয় স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৭৮,৮৫৭ এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ছিল ৩৬,৭৪,৭৩০।

স্কুলের বই কি রকম পড়ানো হয় তার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটি বইয়ের নাম তরুণের পরামর্শদাতা (The Young Man's Counsellor), লেখক ডানিয়েল ওয়াইজ। উহার কয়েকটি কথা:

জীবনে যদি সাফল্য লাভ করিতে হয়, মানব সমাজে ভেড়ার পালের উর্দ্ধে যদি উঠিতে হয় তাহা হইলে তরুণ চরিত্রে কয়েকটি গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ধর্ম্মের সাহায্যে ঐ সব কয়টি গুণই আয়ত্ত করা সহজ। চরিত্রের পূর্ণতা (integrity) আয়ত্ত হইলে সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবে। বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে সকলের সম্মান অর্জ্জন করিবে। পরিশ্রমী হইলে শিক্ষা ও ব্যবসার মধু আহরণ করিবে এবং মিতব্যয়ী হইলে সেই অর্জ্জিত মধু সংরক্ষণ করিতে পারিবে। উদ্যমশীল হইলে সকল বাধা সহজে অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকিলে আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে এবং উহার সাহায্যে সুযোগ আসিবামাত্র তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন উৎকৃষ্ট পাথরের ভিত্তি চাই, তেমনি ঐ গুণাবলী হইতেছে জীবনে সাফল্য লাভের ভিত্তি। যে তরুণ ঐগুলি আয়ত্ত করিতে এবং রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তার জীবনে ব্যর্থতা কখনও আসিতে পারে না।

আরও কতকগুলি বই দেখিয়াছি। তাহাতেও অনুরূপ শিক্ষা অতি অপূর্ব্ব ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে। এই সব উপদেশ মৌখিক বুঝাইয়া দেয় রবিবাসরীয় স্কুলে।

এই একটি মাত্র চেষ্টার দ্বারা আমেরিকা তার সামাজিক জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। সামাজিক ব্যবহারে কি পরিমাণ ভদ্রতা আনিয়া ফেলিয়াছে তাহা সামাজিক ব্যবহার পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

ধর্ম্ম ও যান্ত্রিক সভ্যতা

ধর্ম্ম এবং যান্ত্রিক সভ্যতার মিল হয় না ; একটিকে নিলে অপরটিকে ছাড়িতে হয়—এই ধারণা কত ভুল আধুনিক আমেরিকা তার দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্ম্মানীতে এমন কি রাশিয়াতেও ধর্ম্ম এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সমন্বয় ঘটিতেছে ইহা শুনিয়াছি। দেখিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। আমেরিকা যাওয়ার সময় ভারত সরকার মাত্র ৭৫ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে নিতে দিয়াছিলেন, সুতরাং পথে ইউরোপে নামিয়া দেশ দেখা সম্ভব ছিল না। ফিরিবার পথে ডিসেম্বরের মধ্যভাগে ইউরোপের প্রচণ্ড শীত বরফপাত ও বৃষ্টি সহ্য করিবার মত শারীরিক সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ড ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড ও জার্ম্মেনীর ভূমি স্পর্শ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল, দেশ দেখা হইল না।

যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্ম সমন্বয় আমেরিকা কতটা করিতে পারিয়াছে এবং কি ভাবে সে চেষ্টা করিতেছে তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। যন্ত্রকে তাহারা দুই ভাবে কাজে লাগাইতেছে—কর্ম্মজীবনে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে। কৃষি, শিল্প, যানবাহন, এমন কি ব্যাঙ্কিংএও যন্ত্রকে অবিশ্বাস্য ভাবে কাজে লাগাইতেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষের মস্তিষ্ক আগে যেসব কাজ করিত তার অনেকটা যন্ত্রকে দিয়া করাইয়া লইতেছে। কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার ওদেশে সহজ। জমি সমতল; খাল নদী নালা খুব কম। ট্রাক্টর চালানো সহজ। শিল্পে হাতুড়ি পেটা, ভার তোলা প্রভৃতি কায়িক শ্রমসাধ্য প্রতিটি কাজে যন্ত্র বসাইয়া দিয়াছে। ফলে নারীরা আগে যে সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিত না, আজ মনের আনন্দে তাহা করিতেছে। ডেট্রয়েটে জেনারেল মোটর কারখানায় প্রচুর নারী শ্রমিক দেখিয়াছি। কৃষি এবং শিল্পে মেকানাইজেসন আমরা জানি, তার অনেকগুলি আমাদের দেশে আমদানীও হইয়াছে।

দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রকে কতটা কাজে লাগাইয়া শ্রম লাঘব করা যায় তাহা

নূতন দেখিলাম। যতক্ষণ এরা কারখানা বা অফিসে থাকে ততক্ষণ যেন অসুর, একটি মুহূর্ত্ত ফাঁকি নাই, অথচ ইহারই মধ্যে এক মিনিট অবসর পাইলে পুরুষ ও নারী শ্রমিক হাত ধরাধরি করিয়া একটু নাচিয়া নিল। কাজ হইতে বাহিরে আসিয়া আর যেন এদের হাত ওঠে না। কিভাবে কায়িক পরিশ্রম কম করিবে সেই চিন্তাই প্রবল। দাড়ি কামাইবার সময় লোকে আগে ব্রাশ দিয়া মুখে জল দেয়, তারপর সাবান ঘষে, সাবানকে আবার ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া ফেনা করে, ক্ষুর চালায় এবং সবশেষে মুখের সাবান ধুইয়া ফেলিয়া ক্রীম লাগায়। এরা সাবানটাকে ফেনায় পরিণত করিয়া বোতলে ভরিয়া দিয়াছে। আঙ্গুলে করিয়া একটু তৈরি ফেনা বোতল হইতে বাহির করিয়া গালে লাগাইয়া ক্ষুর চালাইয়া দেয়। ব্রাশ নাই। মুখ ধোবারও প্রয়োজন নাই, তোয়ালেতে মুখ মুছিলেই হইল। উহারই মধ্যে ক্রীমও থাকে। ছাতার বোতাম টিপিয়া দিলে নিজেই তড়াক করিয়া লাফাইয়া খুলিয়া যায়। ইলেকট্রিক ক্লিপ দিয়া চুল কাটে। চুল ছাঁটিতে দশ মিনিটের বেশী লাগে না। অটোমেটিক রেস্তোঁরায় খোপে খোপে খাবার সাজানো, সামনে দাম লেখা, পাশে পয়সা ফেলার খোপ। খোপের জানালা বন্ধ। খোপে পয়সা ফেলিলে জানালা খুলিয়া যায়। খাবার প্লেট বাহির করিয়া নিলেই হইল। কিন্তু এর পরে অটোমেটিক মেসিনে সেই শূন্য খোপে নূতন প্লেট আসা একটি দেখিবার জিনিষ। বাস ষ্টেসন, রেল ষ্টেসন, এয়ার পোর্ট প্রভৃতিতে কফি, সিগারেট, চকোলেট, কোকাকোলা, ফলের রস প্রভৃতি খাওয়ার ইচ্ছা মুহূর্ত্তে পূরণ করা যায়। খোপে পয়সা ফেলিলেই হইল। এগুলিতে খোপ খালি হইলে হাতে পূরণ করিয়া দিয়া যায়। ষ্টানফোর্ড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে ডাঃ ষ্টেলি বলিলেন—এতদিন এইসব অটোমেটিক মেসিনে নির্দ্দিষ্ট পয়সা ফেলিতে হইত, এবার নূতন মেসিন বাহির হইয়াছে, তাহাতে যে কোন মুদ্রা ফেলিলেই হয়; জিনিষ এবং চেঞ্জ দুইই একসঙ্গে বাহির হইয়া আসে।

বাস এবং ট্রামে চেঞ্জ দেয়। ড্রাইভার আছে, কণ্ডাকটার নাই, টিকিট নাই। ড্রাইভারের সামনে একটি বাক্স, তাহাতে ভাড়ার পয়সা ফেলিতে হয়। ড্রাইভারের সামনে চারিটি খোপে আধ ডলার, সিকি ডলার, দশ সেণ্ট এবং এক সেণ্টের মুদ্রা সাজানো। খোপের তলায় একটি লিভার টিপিলেই মুহূর্ত্তে মুদ্রা বাহির হইয়া আসে। এক হাতে ষ্টিয়ারিং রাখিয়া অপর হাতে চেঞ্জ দিতে কিছুমাত্র অসুবিধা

নাই। ভূগর্ভস্থ ট্রেনে বুকিং কাউণ্টারে পয়সা দিলে একটি টোকেন দেয়। অটোমেটিক গেট আছে, আমাদের হাওড়া ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে ঢোকার ঘোরানো গেট। পাশের গর্ত্তে টোকেনটি ফেলিলে তবে উহা ঘুরিবে। টিকিট নাই, টিকিট চেকারও নাই। যাত্রীদের সুবিধা দেখিবার জন্য শুধু কণ্ডাকটার গার্ড থাকে। অধিকাংশ সহরেই ট্যাক্সিতে রেডিও টেলিফোন থাকে। যেখানে যাইতে বলিয়াছি সে রাস্তা জানা না থাকিলে ড্রাইভার টেলিফোন করিয়া হেড অফিস হইতে তাহা জানিয়া নেয়। কোন্ ট্যাক্সি কোথায় কখন আছে এবং কোথায় যাইতেছে তাহা টেলিফোনে হেড অফিসকে জানায়। ফলে ট্যাক্সির জন্য কেহ টেলিফোন করিলে তার কাছাকাছি যে ট্যাক্সি খালি যাইতেছে তাহাকে সেখানে পৌঁছিতে নির্দ্দেশ দেয়। কলিকাতার সমস্ত ট্যাক্সির পরিচালন ভার সমবায় সমিতির হাতে দিলে এবং ঐগুলিতে রেডিও টেলিফোন বসাইলে কলিকাতার ট্যাক্সি সমস্যা অনেক কমিয়া যায়।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য যন্ত্রকে বহু স্থানে কাজে লাগাইয়াছে। রেল এবং বাস ষ্টেসনে অনেক লোক এমন আসে যাদের সঙ্গে বাক্স থাকে কিন্তু বাক্স নিয়া ঘোরা কঠিন হয়। এই সব বাক্স রাখার সুন্দর খোপ করিয়াছে। বড় একটি আলমারীর মত জিনিষ, তাহাতে একটি সুটকেশ এবং অন্য জিনিষপত্র রাখার মত অনেকগুলি খোপ। প্রতিটি খোপের গায়ে পয়সা ফেলার গর্ত্ত এবং চাবি। পয়সা ফেলিলে চাবি বাহির হইয়া আসিবে, তারপরে খোপের দরজা খুলিয়া জিনিষপত্র রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি পকেটে নিয়া বাহির হইয়া যাও। আমাদের দেশে কোন কোন ষ্টেসনে লোক বসাইয়া এইরূপ মাল রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই ব্যবস্থা তার চেয়ে অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। দিনে রাত্রে যে কোন সময় উহা ব্যবহার করা যায়।

ডাক টিকিট কেনার জন্য পোষ্ট অফিসে না গেলেও চলে। একটা বাক্সে ডাক টিকিট থাকে। সামনে বিভিন্ন টিকিটের ছবি, পাশে পয়সা ফেলার গর্ত্ত, তলায় একটি হাতল। যে দামের টিকিট চাই তাহা পাশের গর্ত্তে ফেলিয়া হাতলটি টিপিলে একটি ভাঁজ করা পেষ্টবোর্ডের মধ্যে টিকিট বাহির হইয়া আসিবে। হোটেল, ষ্টেসন, রেস্তোঁরা প্রভৃতি বহু জায়গায় এই জিনিষ রাখা আছে। অটোমেটিক টেলিফোনের তো কথাই নাই। ট্রাঙ্ক কল পর্য্যন্ত অটোমেটিক

টেলিফোনে হয়। নিউইয়র্ক হইতে সানফ্রান্সিসকো স্বাভাবিক স্বরে কথা বলা যায়। ট্রাঙ্ককলের কানেকসন পাইতে দু তিন মিনিটও লাগে না।

যানবাহনে অটোমেটিক প্রবর্তন সুরু হইয়া গিয়াছে। চিকাগোতে শুনিলাম অটোমেটিক বাস চালু হইতেছে, উহাতে ড্রাইভার থাকিবে না। কণ্ডাকটার তো এখনই নাই। প্রথম পরীক্ষার জন্য একটি রাস্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমার দুর্ভাগ্য, অটোমেটিক বাস চালু হইবার দিনতিনেক আগে চিকাগো ছাড়িতে হইল। নিউইয়র্কে ভূগর্ভস্থ ট্রেন অটোমেটিক করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আর কয়েকটি দিন সেখানে থাকিলে এটিও দেখিতে পারিতাম।

নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিলাম অটোমেটিক টাইপরাইটার। একটি টাইপরাইটারের তলায় একটি বাক্স। ডিক্টেসন দেওয়া হইয়াছে। লম্বা একটি ফিতায় ছোট ছোট গর্ত্তে, মনোটাইপ মেসিনের মত, উহা খোদাই হইয়া গিয়াছে। টাইপরাইটারের তলায় ফিতা ফিট করিয়া দিয়াছে, হুড় হুড় করিয়া টাইপ হইয়া যাইতেছে। সে যে কি মজার যন্ত্র না দেখিলে বোঝা কঠিন।

একটি আশ্চর্য্যজনক যান্ত্রিক প্রগতির সংবাদ জানিলাম ফিলাডেলফিয়া হইতে দেশের পথে নিউইয়র্ক রওনা হইবার ঘণ্টাখানেক মাত্র আগে। নেলসন জিজ্ঞাসা করিলেন—স্মারক হিসাবে এখান হইতে কি জিনিষ নিতে চান? নেলসন, মিস ফোলের এবং আমি তিনজনে গবেষণা করিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না এমন সময় নেলসন মিস ফোলেরকে এক বড় দোকানে একটি যন্ত্রের কাছে নিয়া যাইতে বলিলেন। যন্ত্রটি ইলেকট্রনিক। কত টাকার মধ্যে জিনিষ চাই তাহার একটি লিভার টিপিয়া দিলে ঐ দামে কোন্ কোন্ ভাল জিনিষ কেনা যাইবে তার একটি তালিকা বাহির হইয়া আসিবে। দুর্ভাগ্য আমার, দোকানটা তখন বন্ধ ছিল।

ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিলাম টেক্সাসের দৈনিক সংবাদপত্র ডেনটন ক্রণিকেলে। ইলেকট্রনিক মেসিন চালিত একটি সিলিণ্ডারে ছবি এবং একটি প্লাষ্টিক প্লেট ফিট করিয়া চালাইয়া দিল। দশ মিনিটেরও কম সময়ে ছবিটা ব্লক হইয়া গেল। বেশ বড় ব্লক। দামের হিসাব নিলাম—আমাদের এক টাকারও কম পড়ে। সংবাদপত্র মুদ্রণ ইলেকট্রনিকে সুরু হইয়াছে। নিউইয়র্ক টাইমস উহা করিতেছে। শুনিলাম নিউইয়র্ক টাইমস চিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, কানসাস প্রভৃতি বহু সহর হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

টেলিপ্রিণ্টার মেশিনের মত নিউইয়র্কে টাইপ করিয়া সর্ব্বত্র এক সঙ্গে কম্পোজ হইবে এবং সমস্ত সহরে একসঙ্গে প্লেট তৈরি হইয়া যাইবে।

যন্ত্রকে এরা কাজে লাগাইয়াছে ঘরে বাহিরে কর্ম্মস্থলে সর্ব্বত্র কায়িক শ্রম লাঘবে। কিন্তু মানুষ যাহাতে অলস হইয়া না পড়ে তার জন্য চাই নৈতিক মেরুদণ্ড এবং নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক রাখিতে হইলে চাই ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সেদিকেও সমান লক্ষ্য রাখিয়াছে। অনেককে বলিয়াছি—তোমরা বল তোমাদের প্লান নাই, আমি দেখিতেছি প্লানের ঠাকুরদাদা তোমরা করিয়া বসিয়া আছ। তোমাদের প্লান চোখে দেখা যায় না, তার কোন বই নাই, কোন অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর নাই, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে তার ফল বোঝা এবং ভোগ করা যায়। আমাদের প্লান আকারে এবং ধুমধড়াক্কায় দ্রুত বাড়িতেছে এবং তার ফল হইতেছে দুর্গতি বৃদ্ধি—এ কথা অবশ্য তাদের বলি নাই।

আমেরিকান অর্থনীতি

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ জন পেরি মিলার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁর দুটি বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম আমেরিকান অর্থনীতির ধারা বদলাইয়া গিয়াছে এবং নূতন পদ্ধতির সংবাদ আমরা কমই রাখিতেছি। ডাঃ মিলারের সঙ্গে তাঁর হোটেলে গিয়া এক ঘণ্টা আলাপ করিয়াছিলাম এবং তাহার ফলে ঐ দেশের অর্থ-নীতি বুঝিতে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকা গিয়াই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলাম। বোষ্টনের পরে তাঁর কাছে যাওয়ার কথা ছিল এবং হোটেলের অসুবিধায় তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। ইহাতে শাপে বর হইয়াছিল। সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে ইয়েল যাওয়ার সুযোগ আসিলে তাহাকেই প্রকৃত লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

নিউ ইয়র্ক হইতে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। বেলা প্রায় একটায় নিউ হেভেন ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিলাম প্রায় দেড়টা। ডাঃ মিলার অপেক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে নিয়া গেলেন। অনেক সময় আলোচনা হইল। ইতিমধ্যে ফরেণ রিলেশন্স কাউন্সিলের ডিরেক্টর ফ্রাঙ্কলিন, রাশিয়ান ষ্টাডিজ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ পেনার, কালিফোর্ণিয়ার ডাঃ টেলার, ইণ্ডিয়ানার ডাঃ লুইস এবং আরও অনেকের সহিত অর্থনীতি নিয়া আলোচনা হইয়াছে। ডাঃ মিলারের সঙ্গে শেষ আলোচনা।

ইংলণ্ড যেমন এক কালে কীন্‌সের উপর নির্ভর করিয়াছিল, আমেরিকাতেও দেখিলাম তেমনি ভাবে রোষ্টোর উপর নির্ভরশীলতা। রোষ্টোর অর্থনীতির প্রধান তাৎপর্য্য হইতেছে বৈদেশিক বাণিজ্যে বেশী নির্ভর না করিয়া ঘরোয়া অর্থনীতি গঠনের উপর ঝোঁক। তাঁর অর্থ-নীতির দ্বিতীয় তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে প্রভেদ কমাইয়া আনিতে না পারিলে যেমন বিশ্ব অর্থনীতি সহজ ও

স্বাভাবিক হইবে না, তেমনি একটা দেশের উন্নত এবং অনুন্নত অংশের মধ্যে প্রভেদ দূর করিতে না পারিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হইবে না। একটি দেশের কৃষিপ্রধান অঞ্চল দরিদ্র এবং শিল্পপ্রধান অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হইলে উভয় অংশে সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিবে এবং জাতির পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে না। যে দেশে কৃষি শিল্প ব্যবসা পেশা চাকুরি প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে লোকে সমান ভাবে স্বচ্ছল জীবন যাপনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে সেই দেশেরই সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর হইবে। ইহা করিতে হইলে যাহাকে টেক-অফ (take-off) বলা হয় .সেই স্তরে পৌঁছিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন রূপ নূতন শিল্প প্রচেষ্টা করিতে নামিলে তার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তার সমস্তই ।হয় দেশে পাইতে হইবে, নচেৎ বিদেশী জিনিষ প্রয়োজন হইলে সম্মানজনক সর্ত্তে উহা কিনিয়া আনিবার সামর্থ্য থাকিবে। দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশীর নিকট ভিক্ষা এবং ভিক্ষা না মিলিলে ভেউ ভেউ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। দুই মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য নির্ভর করা নিরাপদ নহে। ঘরোয়া অর্থনীতি গড়িয়া তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই পথ দেখাইয়াছে আমেরিকা। ইউরোপের ফ্রান্স জার্ম্মেনী বেলজিয়াম প্রভৃতি এই নূতন অর্থনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছে যে নিজের দেশে পর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পজাত সম্পদ উৎপাদনের উপযুক্ত. টেকনিসিয়ান ও বিক্রয়ের উপযুক্ত যথেষ্ট লোক না থাকিলে ঘরোয়া অর্থনীতির উপর বেশী দূর নির্ভর করা যাইবে না। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, লোকসংখ্যাও প্রচুর। আমেরিকার নিজস্ব তেল এবং লোহা কম পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উহা কিনিয়া আনিবার ক্ষমতা তার আছে। টেকনিসিয়ানের অভাব যাহাতে না হয় তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা তাহারা করিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি। তাহাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছে, ফলে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং উহার বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যসাধন সম্ভব হইতেছে। ফ্রান্স, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেখিল তাহাদের দেশে

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ টেকনিসিয়ান আছে কিন্তু প্রথম ও তৃতীয়টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা পর্য্যাপ্ত নাই। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা তাহারাও তীব্র ভাবে অনুভব করিল। এই তাগিদেই কমন মার্কেট সৃষ্টি। কমন মার্কেটের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে দল বাঁধিয়া একটা বড় ঘরোয়া অর্থনৈতিক সংগঠন। এই নূতন নীতির তাৎপর্য্য সোসালিষ্ট ষ্টালিনও বুঝিয়াছিলেন এবং তার জন্য তিনিও সোসালিষ্ট দেশ-সমূহকে নিয়া কোমেকন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘরোয়া অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইলে উহার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহকে যত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করা দরকার, কমন মার্কেট কনষ্টিটিউসনে তাহা সম্ভব হইয়াছে, কোমেকনে হয় নাই। কমন মার্কেটে ঘরোয়া অর্থনীতি প্রচলনের ফলে প্রথম দিকে উহার সমৃদ্ধি দারুণ হইয়াছিল। কিন্তু এখন উন্নতির হার একটু কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ সহজবোধ্য। ধরা যাক্, একটি দেশে বছরে এক লক্ষ মোটর গাড়ী আমদানী হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গাড়ী আমদানীর উপর চড়া শুল্ক বসিল এবং দেশে গাড়ী উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হইল। ফলে প্রথম এক লক্ষ দেশী গাড়ী বাহির হইবা মাত্র বিক্রী হইয়া গেল। কিন্তু তার পরের তৈরি গাড়ী অত সহজে বিক্রী হইবে না। দেশের লোকের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে গাড়ী বৃদ্ধি সেই হারে বাড়িতে থাকিবে। কমন মার্কেট অর্থনীতি প্রথমটা ছিল লম্ফ-প্রদান স্তরে (jumping ground), এখন উহা স্থিতিস্থাপক (steady) হইয়াছে। এই steadiness বজায় রাখিতে পারিলে তবেই ঘরোয়া অর্থনীতি হিসাবে কমন মার্কেটের সার্থকতা অব্যাহত থাকিবে। বৃটিশ কমনওয়েলথ অর্থনীতিও মূলতঃ ইহাই। জাপান একা পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাকেও ঐ একই পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

কৃষি ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য অপসারণের উপর জাতায় অর্থনীতির শক্তি নির্ভর করে। গ্রামের লোকের উৎপন্ন দ্রব্য সহরবাসী সস্তায় কিনিবে এবং সহরের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামবাসী চড়া দামে ক্রয় করিতে থাকিবে, ইহা দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। এই সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান আমেরিকা বা রাশিয়া কেহই করিতে পারে নাই।

আমেরিকা কৃষিজীবী লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশে কমাইয়া আনিয়াছে; কৃষককে জমির পূর্ণ মালিকানা দিয়াছে; তাহার সর্ব্ববিধ সমস্যা সমাধানের উপায় গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাহায্যে করিয়াছে। ফলে উৎপাদন এত বাড়িয়াছে যে অত কৃষিজ পণ্যের চাহিদা নাই। গম, দুধ, ফল, ডিম, মাংস প্রভৃতি সাধারণ লোকে যাহা খাইবে ধনীরাও তার চেয়ে বিশেষ বেশী পরিমাণে টানিবে না। অপর্য্যাপ্ত জমিতে অপর্য্যাপ্ত কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দাম পড়িয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বাড়তি ফসল বাজার দরে কিনিয়া নিতে বাধ্য হইল। প্রথমটা উহা নষ্ট করা হইত। পরে সুরু হইল বিশ্বজোড়া খয়রাতি। তাহাতেও অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। ফলে কৃষিজ পণ্য, বিশেষ ভাবে খাদ্যের পাহাড় জমিতে লাগিল এবং তার জন্য কয়েক সহস্র কোটি টাকা আটকা পড়িয়া গেল। কিছুদিন আগে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কংগ্রেসে এই মর্ম্মে এক বিল আনাইয়াছিলেন যে কৃষকদের যথেচ্ছ উৎপাদিত পণ্য গবর্ণমেণ্ট আর কিনিবেন না, উৎপাদন প্লান করা হইবে এবং চাষের জমি বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। বিল পাশ হইল না। আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্রই পৃথিবীতে একমাত্র গণতন্ত্র যেখানে সরকারী বিল পার্লামেণ্টে প্রত্যাখ্যাত হইলে গমর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে হয় না।

রাশিয়ায় কৃষির ব্যর্থতার কারণ কিছুদিন আগে ক্রুশ্চভ নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—সরকারী বুরোক্রাসি দ্বারা কৃষি হয় না। ভারতে প্রমাণ হইয়াছে উহাদের দ্বারা শিল্পও হয় না।

আমেরিকান অর্থনীতির দুর্ব্বলতা উহার কৃষি, কিন্তু উহার বুনিয়াদী দৃঢ়তা এই যে আয় অপেক্ষা ব্যয় কখনো বেশী হইতে পারিবে না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দুর্ম্মূল্য হইতে পারিবে না, বেকারী থাকিবে না এবং যাতায়াতের সকল প্রকার সুযোগ থাকিবে। জীবন ধারণের ব্যয় কমিলে তবেই বাড়তি টাকা হাতে থাকিবে এবং বাড়তি টাকা যত থাকিবে বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছা ও সামর্থ্য ততই বাড়িয়া চলিবে। একমাত্র বিলাস দ্রব্য উৎপাদনেই বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব হইবে।

সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের লোকেরও মাসিক আয় সাধারণতঃ দেড়

হাজার টাকার কম নহে। সাংসারিক ব্যয় কত তাহা কয়েকটি দ্রব্যমূল্য হইতে দেখাইতেছি ঃ—

মুর্গীর ঠ্যাং—	৩৫ সেণ্ট বা ১˙৭৫ টাকা পাউণ্ড
আস্ত মুরগী—	২৯ „ „ ১˙৪৫ টাকা পাউণ্ড

[এক একটি মুর্গীর ওজন ৩॥ হইতে ৪ পাউণ্ড]

গোমাংস—	৪৯ সেণ্ট বা ২˙৪৫ টাকা পাউণ্ড

[আমাদের দেশে গোমাংস সবচেয়ে সস্তা, মুরগী সবচেয়ে বেশী দাম]

মাটন—	৩৯ সেণ্ট বা ২˙৯৫ টাকা পাউণ্ড
শূকর মাংস—	৬৯ সেণ্ট বা ৩˙৪৫ টাকা পর্য্যন্ত
টুনা মাছ —	৯॥ আউন্স টিন ৪৯ সেণ্ট
টোমাটো—	১০ সেণ্ট বা ৫০ ন. প. পাউণ্ড
আলু—	৪ পাউণ্ড ব্যাগ ২৯ সেণ্ট বা আমাদের হিসাবে ৭৩ ন. প. সের (২৫ পাউণ্ড ব্যাগ নিলে ৬৯ সেণ্ট)
কলা (খুব বড় সাইজ)	১২ সেণ্ট বা ৬০ ন. প. পাউণ্ড
১ পাউণ্ডের ২ খানা রুটি	২৯ সেণ্ট বা ১˙৪৫ টাকা
পালং শাক—	১০ আউন্স প্যাকেট ২টি ২৫ সেণ্ট বা পাঁচ সিকা
স্পেনের আমদানী চাউল	৫॥ আউন্স প্যাকেট ৩৩ সেণ্ট বা ১˙৬৫ টাকা
মার্গারিণ—	এক পাউণ্ড প্যাকেজ ২টি ৮১ সেণ্ট বা ২ টাকা পাউণ্ড
গোলমরিচ—	৪ আউন্স টিন ৪৫ সেণ্ট
আঙ্গুর—	৩ পাউণ্ড ২৯ সেণ্ট বা প্রতি পাউণ্ড আট আনার কম
কমলা লেবুর রস—	১২ আউন্স টিন ২টি ৪৫ সেণ্ট বা ২˙২০ টাকা

খাওয়া খরচ কত পড়িতে পারে ইহা হইতে তার আন্দাজ পাওয়া যাইবে। আমাদের তুলনায় তাহাদের আয় দশগুণ কিন্তু খাওয়া খরচ সামান্য বেশী।

খাওয়ার পর চাই থাকার ব্যবস্থা। প্রায় প্রত্যেক বড় সহরের পাশে সহরতলীতে নূতন সহর পত্তন হইতেছে এবং সেই সব স্থানে লোকে যাহাতে সহজে বাড়ী করিতে পারে তার অজস্র সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের উপকণ্ঠে নিউ জার্সিতে বাড়ী কিনিতে কত খরচ পড়ে ১৮ই নভেম্বর ১৯৬২ তারিখের ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার পত্রিকা হইতে তার কয়েকটি নমুনা দিলাম:

(১) একতলা বাড়ী, তিনটি শয়নকক্ষ, একটি বড় হল, গ্যারেজ, দেড় খানা বাথরুম, রান্নাঘর···দাম ১৫,৯৯০ ডলার বা প্রায় ৮০ হাজার টাকা। প্রথমে ১০ শতাংশ বা ৮ হাজার টাকা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে, বাকিটা কিস্তিতে শেষ হইবে।

(২) দোতলা বাড়ী, ৪ শয়নকক্ষ, একটি বড় হল, একটি বড় খাওয়ার ঘর, কাপড় ধোলাইয়ের ঘর, আড়াইটি বাথরুম, মেকানাইজ্‌ড রান্নাঘর···দাম ২৩,৯৯০ ডলার বা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। প্রথমে ১০ শতাংশ, বাকিটা কিস্তিতে।

(৩) একতলা বাড়ী, ৩ শয়ন কক্ষ, ১॥ বাথরুম, গ্যারেজ, মেকানাইজ্‌ড রান্নাঘর দাম ১১৯৯০ ডলার। ৩৯০ ডলার দিয়া ঢুকিতে পারিবে, বাকিটা কিস্তিতে। কিস্তির কোন নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম সীমা নাই, যে যেমন দিতে পারে উভয়পক্ষের সুবিধা দেখিয়া তেমনি চুক্তি করে। বহু কোম্পানী প্রথমে কোন থোক টাকাই নেয় না, প্রথম হইতেই কিস্তির টাকা শোধ আরম্ভ হয়। ষাট বা সত্তর হাজার টাকায় যে বাড়ী সেখানে হয় আমাদের দেশে কোন বৃহৎ সহরে তার চেয়ে বিশেষ কম খরচ পড়ে না। প্রথম কিস্তি আরম্ভ করিবার জন্য অনেক কোম্পানী তিন চার মাস সময় দেয়।

বাড়ীতে এলুমিনিয়ামের দরজা জানালা বসানো আজকাল ফ্যাসান হইয়াছে। এলুমিনিয়ামের একটি দরজা এবং ৬টি জানালার খরচ পড়ে মোট ২২॥ ডলার বা একশত টাকার একটু বেশী। তাও সবটা একসঙ্গে দিতে হয় না, চার কিস্তিতে দিলেই যথেষ্ট।

রান্নাঘর মেকানাইজ সপ্তাহে সওয়া তিন ডলার কিস্তিতে করা যায়। নূতন মডেলের নেশা সাংঘাতিক। বাথরুম ষ্টাইল পুরাণো হইয়া গিয়াছে।

উহা বদলাইতেই হইবে, নচেৎ কোন অতিথি আসিলে নিন্দা অনিবার্য্য। সমস্ত বাথরুম নূতনভাবে মোজাইক করিতে এবং আপটুডেট ফিক্সচার বসাইতে খরচ মাত্র ২৯৯ ডলার বা দেড় হাজার টাকার কম। কাজ শেষ হইবার পর ছয় মাস পর্য্যন্ত টাকা দিতে হইবে না। ছয় মাস ব্যবহারের পর টাকা শোধ করিতে হইবে। কোন কোন কোম্পানী বাথরুম, রান্নাঘর নূতনভাবে তৈরী করিবার টাকা নেয় মাসে ৫ ডলার কিস্তিতে, সাত বৎসরে টাকা শোধ হয়।

সহরতলীর বাড়ী কর্মক্ষেত্র হইতে ৩০।৪০ মাইল দূরে। যাতায়াতের বন্দোবস্ত চাই। বাস বা ট্রেণে অসুবিধা, সুতরাং নিজের গাড়ী চাই। ১৯৬২ সালের নবেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন দিয়াছে ১৯৬৩ মডেল সেভ্রোলে কিনিতে হইলে প্রথমে ২৫ ডলার বা ১২৫ টাকা দিলেই গাড়ী মিলিবে তার পর সপ্তাহে ৯.৭৫ ডলার বা ৫০ টাকার কম কিস্তি। ইহা নূতন গাড়ীর ব্যবস্থা। বছর শেষ না হইতেই সে বছরের মডেল পুরাণো হইয়া যায় এবং দাম কমিতে থাকে। ১৯৬২ সালের নবেম্বরে ১৯৬২ মডেল ফোর্ড (বৃহৎ গাড়ী) দাম কমিয়া হইল ১৫৯৫ ডলার। ব্যবহৃত গাড়ী নহে, সম্পূর্ণ নূতন গাড়ী। আট হাজার টাকারও কম। তাও দিতে কষ্ট হইবে বলিয়া সপ্তাহে ১৪.২৫ ডলার কিস্তি। দুই বৎসরে দাম শোধ হইবে। ১৯৬১ মডেল ফোর্ড বছরের শেষে দাম কমিয়া হইল ১১৯৫ ডলার বা ছয় হাজার টাকারও কম। কিস্তি সপ্তাহে ১০.২৫ ডলার।

পুরাণো গাড়ীর দামের নমুনা কয়েকটি দিলাম। এই দামগুলি ১৯৬২ সালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে গৃহীত হইয়াছে :

১৯৬১ মডেল ডজ—	১৬৯৯ ডলার
১৯৬১ মডেল ক্রাইসলার—	১৫৯৯
১৯৬০ মডেল শেভ্রলে—	১২৯৯
১৯৬০ মডেল ডজ –	৮৯৯
১৯৫৯ মডেল শেভ্রলে—	৬৯৯
১৯৫৮ ফোর্ড ভি-৮	৩৪৯
১৯৫৬ প্যাকার্ড—	২৯৯

১৯৫৫ বুইক—	১২৯
১৯৫৫ ফোর্ড ভি-৮	৯৯
১৯৫৫ পন্টিয়াক	৪৯
১৯৪৯ শেভ্রলে—	২৯

গাড়ী চড়িতে পেট্রল লাগে। দাম ২০ সেন্ট বা এক টাকা গ্যালন। আমাদের দেশে চার টাকা। গাড়ী কিনিতে কোন কষ্ট নাই। বহু কোম্পানী প্রথমে কোন টাকা নেয় না। কিস্তি সপ্তাহে বড় জোর ৫০ টাকা। তাও মাস ছয়েক পরে দিতে আরম্ভ করিলেও আপত্তি নাই। এই দেশে প্রতি পরিবারে একটি অন্ততঃ গাড়ী কেন থাকিবে না?

গাড়ী কেনা এবং চড়া খুব সোজা কিন্তু বড় সহরে গাড়ী রাখা ভয়ানক কঠিন। গাড়ী এত বাড়িয়া গিয়াছে যে রাস্তায় রাখা দুষ্কর। অধিকাংশ রাস্তাই এক মুখো করিতে হইয়াছে। বিনা পয়সায় গাড়ী রাখার জায়গা নিতান্ত কম। গাড়ী রাখার জন্য দশ বিশ তলা বাড়ী হইয়াছে, চার্জ ঘণ্টায় এক টাকার মত। রাস্তায় বহু স্থানে মিটার বসিয়াছে। এখন বাধ্য হইয়া সহরের প্রান্তে নিজের গাড়ীতে আসিয়া সেখানে গাড়ী রাখে এবং বাসে বা ভূ-গর্ভস্থ ট্রেণে সহরে ঢোকে। সহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি, বাস ট্রাম এবং বড় অনেক সহরে ভূগর্ভস্থ ট্রেণ আছে। ট্যাক্সি মোটামুটি পর্য্যাপ্ত বলা চলে। খুব বেশী অপেক্ষা করিতে হয় না। উপরে যে মূল্য-তালিকা দিলাম তাহা পুরাণো গাড়ী বিক্রয় কোম্পানীদের দাম। খবরের কাগজে ব্যক্তিগত গাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিনিলে আরও কমে পাওয়া যায়। যেমন ১৯৬০ মডেল শেভ্রলে বিক্রীর দাম ছিল ১০৯৫ ডলার। ১৯৬০ মডেলের একটি এয়ার কণ্ডিশন ক্যাডিলাক ২০ হাজার মাইল মাত্র চলিয়াছে, বিজ্ঞাপন ছিল দাম ৩১০০ ডলার।

উৎপাদনের গতি বজায় রাখিবার জন্য এরা কোন জিনিষ মেরামতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেয় না। ছাতার দাম ২ ডলার, তার মেরামত খরচা ১০ ডলার। মেরামতের দিকে লোককে নিরুৎসাহ করিবার জন্য একটি নূতন কৌশল ইহারা অবলম্বন করিয়াছে। কোন জিনিষের পার্টস যাহাতে আলাদা খুলিয়া বদলানো না যায় তার জন্য সমস্ত ভিতরটা এমন ভাবে আঁটিয়া দিতেছে যাহাতে একটা

অংশ বদলাইতে হইলে সবটা জিনিষ ভাঙ্গিতে হয়। যেমন ঘড়ির সমস্ত ভিতরটা এমন ভাবে জুড়িয়া দিতে সুরু করিতেছে যাহাতে তার কোন অংশ আলাদা খুলিয়া বদলানো না যায়। এদের শ্লোগান হইতেছে—কোন জিনিষ খারাপ হইলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, আবার একটা নূতন কিনিয়া লও।

উৎপাদনে উৎসাহ দানের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে মডেল পরিবর্ত্তন। পুরাণো মডেলের গাড়ী বা টেলিভিসন ব্যবহার করিতে দেখিলে লোকে নাক সিঁটকাইবে। রেললাইনের দুই পাশে পরিত্যক্ত যে সব গাড়ীর পাহাড় জমিয়া থাকিতে দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় গাড়ী রীতিমত চকচকে থাকিতেই বাতিল করিয়া দেয়। শুনিয়াছি গাড়ীর নম্বর প্লেট খুলিয়া নিয়া অনেকে রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যায়, পুলিশ সেই সমস্ত গাড়ী নিয়া ডাম্পে বা ধাপার মাঠে ফেলে। টেলিভিসনের গুদামে শুনিয়াছি উৎকৃষ্ট চালু জিনিষ মডেল পুরাণো হইয়া গিয়াছে বলিয়া ফেলিয়া রাখে।

একদিকে আমেরিকা যেমন প্রতিটি মানুষকে কর্ম্মে উৎসাহ এবং স্বচ্ছল জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ দিয়াছে, তেমনি ধনীর ধনবৃদ্ধি ও শোষণ-প্রবৃত্তি সঙ্কোচেরও বন্দোবস্ত করিয়াছে। ব্যবসায়ীরা বড় হইলে জোট বাঁধিয়া এক-চেটিয়া কারবার করিতে পারে এবং তাহার সুযোগ নিয়া ছোট ব্যবসাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। এই প্রবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য প্রথমে শেরমান আইন এবং পরে ক্লেটন আইন প্রণীত হয়। এরূপ কঠোরতার সহিত এই দুই আইন প্রয়োগ করা হয় যে মনোপলিষ্টরা বুঝিয়া নিয়াছে ওদিকে সুবিধা হইবে না, জনসাধারণকে শোষণের চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা সহ্য করিবে না। আর একটি জিনিষ শিল্পপতিরা বাঘের মত ভয় করে, তাহা হইতেছে গ্রাণ্ড জুরী। গত বৎসর লৌহ শিল্পপতিরা ইস্পাতের দাম টন প্রতি মাত্র তিন ডলার বা ১৫ টাকা বাড়ায়। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ধমক দেন যে মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে না। শিল্পপতিরা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ধুয়া তুলিলে প্রেসিডেণ্ট বলেন—গ্রাণ্ড জুরী বসাইয়া দিতেছি, তার সামনে আসিয়া প্রমাণ কর যে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়াছে। শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের কতক অংশ সব দেশেই গোপন রাখে এবং গ্রাণ্ড জুরী তার সন্ধান

জানিতে ও সেই গুপ্ত হিসাব টানিয়া বাহির করিতে পারে। ঐ ঘোষণার পর শিল্পপতিরা চুপ করিয়া যায়।

আয়কর মৃত্যুকর প্রভৃতির সাহায্যে ধনীর আয়ের একটি বৃহৎ অংশ কাড়িয়া নেওয়া ছাড়াও উপরোক্ত উপায়ে উহাদের অপরিমিত ধন সঞ্চয় ও শোষণ প্রবৃত্তি বন্ধ রাখা হয়।

আমেরিকান অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তি। সাধারণ ব্যক্তি ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল থাকে কি না সেই দিকে সমস্ত সময় গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখেন এবং গবর্ণমেণ্টের এই কাজে দেশের ইনটেলেকচুয়ালরা সব সময় সহায়তা করেন। সেখানে আমাদের মত কণ্ট্রোল নাই। খুচরা জিনিষের ক্রয় কম বেশী হইতেছে কি না, শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় ঠিক মত কাজ পাইতেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা নজর রাখা হয়। উহাদিগকে বলে Indicator বা অর্থ-নৈতিক অবস্থার সূচক। যদি দেখা যায় খুচরা দ্রব্য ক্রয় কমিতেছে তখন বুঝিতে হয় লোকের হাতে পয়সা কমিয়া আসিতেছে। কেন তাহাদের আয় কমিতেছে তৎক্ষণাৎ তার অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং রোগের নিদান আবিষ্কারের পর তাহার চিকিৎসা হয়। কল কারখানা ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর হুকুম জারী করিয়া অর্থ নৈতিক গলদ দূর করা যায় ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। অর্থ-নৈতিক জীবনে সামান্য বিশৃঙ্খলার সূচনা ঘটিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করে এবং কারণ আবিষ্কার করিয়া তার চিকিৎসা দ্বারা পুনরায় অর্থ নৈতিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে। লক্ষ্য সেই এক—সামান্যতম মানুষটিরও যেন লেশমাত্র আর্থিক কষ্ট না হয়। ব্যক্তিকে তাহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে না, ব্যক্তিকে সামাজিক ইউনিট হিসাবে কল্পনা করে এবং ব্যক্তি যাহাতে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় তার জন্য উহারা প্রাণপণ যত্ন করে। আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ঠিক এইরূপ ছিল। তার বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নয়। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে সামাজিক ব্যবহারে, ধর্ম্মাচরণে এবং অর্থ নৈতিক বনিয়াদ সংগঠনে ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ভারতীয় সভ্যতার শিক্ষা জীবনে রূপায়িত করিতেছে এবং উহাদের পরিত্যক্ত বস্তুতন্ত্রবাদ সোসালিজমের প্যাকেটে আমদানী করিয়া আমরা মডার্ণাইজ হইতেছি।

আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং জার্মেনী এই তিনটি দেশ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবাধ অধিকার দিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা যাহাতে পুরাণো ক্যাপিটালিজমের মত শোষণের স্তরে পৌঁছিতে না পারে, সেই সঙ্গে তার ব্যবস্থাও উহারা করিয়াছে। আগুন আছে, আগুনের দাহিকা শক্তিও আছে কিন্তু খাণ্ডবদাহনের যে ক্ষমতা তার ছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন

বিদেশ সম্পর্কে আমেরিকান নাগরিকদের জ্ঞান বৃদ্ধির কত প্রকার বন্দোবস্ত আমেরিকান ইনটেলেকচুয়ালরা করিয়াছেন তার অনেক পরিচয় দিয়াছি। আটলাণ্টা নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি নূতন জিনিষ দেখিয়াছিলাম—আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফিল্ড ষ্টাফের রিপোর্ট সার্ভিস [American Universities Field Staff Reports Service]। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করেন এবং রিপোর্টের আকারে ঐ সিরিজে তাহা প্রকাশ করেন। এঁদের অফিস নিউইয়র্কে। রিপোর্টগুলি ভাল করিয়া দেখিবার সময় ছিল না। ফিল্ড ষ্টাফ সার্ভিসের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর ফিলিপ্‌স টলবট।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিউইয়র্কে ফিল্ড ষ্টাফ আফিসে ফিলিপ্‌স টলবটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে ফিলাডেলফিয়ায় লিখিয়া দিলাম। ডেট্রয়ট হইতে ফিরিলাম ফিলাডেলফিয়া। এখানে আর বেশী কাজ ছিল না। কয়েকটা দিন হাত পা ছড়াইয়া একটু বিশ্রাম নিতে পারিলাম। ভোর না হইতে তৈরি হওয়া এবং নয়টা বাজিতেই একের পর এক সাক্ষাৎকারে ছুটিয়া যাওয়ার তাড়া আর রহিল না।

ফিলাডেলফিয়ার পর আবার নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে মাডিসন এভিনিউয়ে ফিল্ড ষ্টাফের আফিস। হোটেল টুডোর হইতে বেশী দূরে নয়। হাঁটিয়াই গেলাম। রিসেপসনের মহিলা এক প্রবীণ ভদ্রলোকের ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন। ঢুকিতেই—নমস্তে।

বলিলাম · কতদিন আমাদের দেশে ছিলেন ?

হাসিয়া জবাব দিলেন—তা মন্দ নয়, তবে খুব বেশী দিনও নয়।

টলবট ভারতে আসিয়াছিলেন জানিতাম। বলিলাম—আপনিই কি মিঃ টলবট ?

—না। টলবট প্রেসিডেন্ট কেনেডির এসিসটান্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে এখন প্রায়ই ওয়াশিংটনে থাকিতে হয়। এখন তিনি ওয়াশিংটনে।

ভদ্রলোকের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ জমাইয়া নিলেন। এখান হইতেই নিউইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জ দেখিতে টাইটলারের নিকট যাওয়ার কথা। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার উপায় ছিল না।

১৯৬১ সালে ভারত সম্পর্কে টলবট নিজে যে রিপোর্টটি লিখিয়াছেন সেটি দেখিলাম। যুগবাণীর আকারের ১৮ পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকা। তাহাতে ভারতের আধুনিকতম অর্থনীতির ও প্ল্যানের সুন্দর চিত্র আছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকিল উহার একটি ছোট্ট অংশ—আনুগত্য কার কাছে? টলবট বলিতেছেন—স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁহারা করিয়াছেন। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মনোভাবও তাঁহারা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পর ঘরোয়া সমস্যা প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রাজনীতিতে প্রাথমিক সামাজিক ইউনিটের প্রভাব পড়িতেছে। সমগ্র জাতির পরিবর্ত্তে লোকে অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম্ম সম্প্রদায়, জাতি ও পরিবারের ভিত্তিতে চিন্তা করিতে শিখিতেছে। একের পর এক গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার জন্য লড়াই করিতেছে। তিক্ত ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনেও কাজ হয় না দেখিলে দাঙ্গাহাঙ্গামার পথ ধরিতেছে। আসামী ভাষীরা বাঙ্গালীদের পিটাইয়া প্রদেশ ছাড়া করিয়াছিল ইহাও টলবট বলিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাকে ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ১৩ বৎসর পরবর্ত্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র গুজরাট পৃথকীকরণ, পঞ্জাবে ফতে সিংহের অনশন, নাগাল্যাণ্ড স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া টলবট বলিতেছেন—ভারতে একটি স্বাধীন জাতি গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহাতে চিন্তিত হইবেন ইহা বুঝিতে পারি। চার কোটি মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আবার একটি ইসলামিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া হিন্দু নেতারা বিব্রত বোধ করিতেছেন, ইহাও টলবট বলিয়াছেন। সেলিগ হ্যারিসনের ইণ্ডিয়া দি ডেঞ্জারাস ডিকেড্স [ভারত ইতিহাসের বিপজ্জনক কয়েকটি দশক]

বইটির উল্লেখ তিনিও করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ লুইসের বাড়ীতে ওই বই নিয়া বিশদ আলোচনা হইয়াছিল। ফিল্ড সার্ভিসেও এই কথাই বলিলাম যে বহু ধর্ম্ম বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন বহু জাতি বহু ভাষী দেশে ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, অঞ্চল, ভাষা, জাতি প্রভৃতির প্রভেদ থাকিবেই। তবে টলবটের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, দেশের প্রতি আনুগত্য যখন সকলের নিকট সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিবে তখনই আমাদের ঐ সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয় দেশেই এই জাতীয় অজস্র ভেদাভেদ ছিল, দুই দেশেই তাহারা উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছে এই কারণে যে দুজনেই দেশের প্রতি আনুগত্যকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে। পরাধীনতা এবং পার্টিসন ভারতবাসীর বিবেক বুদ্ধি এমন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে যে আনুগত্যের প্রশ্নের গুরুত্ব আমরা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে সে বোধ শক্তি দ্রুত আসিতেছে এবং দেশের ইনটেলেকচুয়াল সমাজ যে দিন আনুগত্যের প্রশ্নকে যথাযথ গুরুত্ব দান করিতে পারিবেন সেই দিন হইতে উহা সমাজের নিম্নতম বিবদমান স্তরেও ছড়াইয়া পড়িবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠিতে তখন আর বেশী সময় লাগিবে না। দুর্ভাগ্য আমার, টলবটের সঙ্গে ইহা নিয়া আলোচনার সুযোগ হইল না।

নিউ ইয়র্কে আর একটি অদ্ভুত আবিষ্কার হইল—Committee on the University and World Affairs (বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব ঘটনা সম্পর্কে কমিটি)। রকফেলার ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেণ্ট ডীন রাস্ক (বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বৈদেশিক সেক্রেটারী), সিনেটার ফুলব্রাইট, ভাণ্ডারবিল্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হার্ভি ব্রান্সকম্ব, কার্ণেগী কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট গার্ডনার প্রভৃতি কমিটির সভ্য। টলবট এখানেও অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা। কমিটির গুরুত্ব কতখানি ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। কমিটির কেন্দ্র ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আফিসে। এঁদের সমস্ত রিপোর্ট বিনামূল্যে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হয়। সরকারী কর্ম্মচারী ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য যে কোন লোক চিঠি লিখিলেই উহা পাঠানো হয়। আমি যে রিপোর্টটি পাইলাম তাহা হইতেছে বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা। আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অধ্যাপনা এবং গবেষণা কত উন্নত

এবং কত ব্যাপক হইয়াছে এই রিপোর্টে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকান কলেজগুলিতে ঐরূপ অধ্যাপনা এবং গবেষণা যাহাতে আরও বাড়িতে পারে, আরও গভীর হয় তার জন্যও কমিটি চেষ্টা করিয়া থাকেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে– স্বাধীন সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে জাতির চোখ। উহার সাহায্যে এক দেশ অন্য দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও মনের কথা জানিতে ও বুঝিতে পারে। ফলে স্বাধীন সমাজের দিগন্ত সুদূর প্রসারী হইয়া স্বাধীন আন্তর্জ্জাতিক সমাজ সৃষ্টি হইতে পারে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটা জিনিষে ভয়ানক ঝোঁক দিয়াছে—প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ দেশের সংস্কৃতি ভিন্ন অপর কোন সংস্কৃতির বিষয় উত্তমরূপে জানিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিতেছে। ইহাদের জ্ঞান যাহাতে পুঁথিগত না থাকিয়া যায় তার জন্য দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে বিদেশ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম দিকটা ছাত্রছাত্রীদের প্রধানতঃ ইউরোপে পাঠানো হইত কিন্তু ইউরোপের প্রতি ঝোঁক কমাইয়া দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় অধিক সংখ্যায় পাঠানো হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে অধ্যাপকদের জ্ঞান যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

কোন দেশের ইতিহাস সেই দেশের ভাষা না জানিলে উত্তমরূপে আয়ত্ত হয় না, এই ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করা হইতেছে। রাশিয়ায় রবীন্দ্র সাহিত্য রুশ ভাষায় অনুদিত হইতেছে, উহা সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরীজাত করিতেছে আমেরিকায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান ছাত্রের স্মিত মুখের পরিষ্কার বাঙ্গলা প্রশ্ন—আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, ভুলিতে পারি না।

রিপোর্টে লক্ষ্য করিলাম আমেরিকা এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যা বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে না। প্রাচীন ভারতের রীতি ছিল—শিক্ষক বিদ্যা দান করিবেন, বিদ্যা বিক্রয় করিবেন না। সমাজ শিক্ষককে প্রতিপালন করিবে, শিক্ষক কৃষি শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি কোন জীবিকার ভিতর দিয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন না। সমাজ তাঁহাকে পালন করিবে এবং তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সমাজের কল্যাণ স্মরণ রাখিয়া ছাত্রকে সামাজিক ইউনিট হিসাবে তৈরি করিয়া দিবেন। ইহাই ছিল ব্রাহ্মণের অথবা শিক্ষকের কাজ। আমেরিকানরা

আমাদের প্রাচীন শিক্ষার এই ধারাটি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষকের বেতনভুক হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই ইহা সুনিশ্চিত কিন্তু বেতনভুক হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোন দেশে শিক্ষককে চাকুরীজীবী বলিয়া অভিহিত করা হয় না, তাঁহাকে পেশাজীবী বলিয়া বলা হয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষকতার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণ, এই বস্তুটি উহারা অতি যত্নের সহিত আয়ত্ত করিতেছে। রিপোর্টটিতে আছে—বিশ্বের ও সমাজের সমস্যা উন্মুক্ত উদার দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সেই জ্ঞান সকলকে দান বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুলেরা সহযোগিতা করিতেছে, এক সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের আগমনে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এমন বহু ছাত্র আসে যাহারা ইংরেজি জানে না। তাহাদিগকে যত্নের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজি শিখাইয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকায় ৫০ হাজারের অধিক বিদেশী ছাত্র পড়িতেছে, ইহারা মোট ছাত্রসংখ্যার ১·৬ শতাংশ।

দেখিতে দেখিতে কয়টা দিন কাটিয়া গেল। সারাদিন বৃষ্টি এবং সারারাত্রি বরফপাত চলিয়াছে। প্রথম দিন বাহিরে আসিয়া দেখি সমস্ত গাড়ীগুলির মাথায় তুলার বস্তা। এ আবার কি ঢং, ভাবিয়া দু পা অগ্রসর হইতেই একটি ছোট্ট পার্ক। সমস্তটা মাটি তুলায় ঢাকা, মাঝে মাঝে উহা ভেদ করিয়া দু একটি লাল এবং হলুদে ফুল উঁকি দিতেছে। এতক্ষণে বুঝিলাম উহা তুলা নহে, তুষার। আগে শূন্য ডিগ্রীর নীচে তাপমাত্রার বাহিরে আসিলে মিনিট দশেক দাঁড়াইয়া চোখ কচলাইয়া ধাতস্থ হইতে হইত। এখন অনেকটা সহিয়া গিয়াছে।

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় এয়ারপোর্ট আফিসে যাওয়ার কথা। বেলা তিনটায় হোটেল হইতে বাহির হইতে হইবে। হোটেলের দিন আরম্ভ হয় বেলা তিনটায়। টুডোর হোটেলের পাশেই বিমান ঘাঁটির সিটি অফিস। ৫॥ টায় বাহির হইলেই যথেষ্ট। তবু তিনটায় বাহির হইয়া পড়িলাম। নহিলে আড়াই ঘণ্টার জন্য ২৪ ঘণ্টার চার্জ্জ লাগিবে।

সকাল হইতে আবহাওয়ার নমুনা দেখিয়া প্লেন ছাড়িবে কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারের মহিলা বলিলেন—সন্ধ্যা ছয়টায় বলিতে পারিব প্লেন কখন ছাড়িবে। যাওয়ার সময় লণ্ডনে শুনিয়াছিলাম

শীতকালে অর্থাৎ অক্টোবর হইতে মার্চ্চ এয়ার ইণ্ডিয়ার লণ্ডন নিউ ইয়র্ক সার্ভিস থাকে না, বি ও এ সি-তে যাইতে হয়। হইয়াছিলও তাহাই। কিন্তু এখন দেখিলাম ঘোর শীতেও নিউ ইয়র্কে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনেই চড়িতে হইবে।

সুটকেশ দুটি বুক করিয়া দিলাম।

ছয়টায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে মহিলা বলিলেন—আজ প্লেন ছাড়িবে না, কাল সকাল দশটায় ছাড়িবে। সুটকেশ দুটি একটি পাবলিক লকারে রাখিয়া হোটেলে যাইতে বলিলেন।

এক দিনের নবাবীর একটু সখ হইল। গেলাম বিশ্ববিখ্যাত অভিজাত হোটেল ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়ায়। গিয়া দেখিলাম চার্জ্জ এমন একটা কিছু মারাত্মক নয়, দৈনিক কুড়ি ডলারের ঘরই নবাবীর পক্ষে যথেষ্ট। যে কোন সহরের ভাল হোটেলের ঘর সাত আট বা দশ ডলারের কমে পাওয়া যায় না। ঘর খুব বড়। খাট প্রায় ফুটবল খেলার মাঠ। বিছানায় শুইয়া মনে হইল যেন পাতালে চলিয়াছি, গদী এত নরম। সুদৃশ্য মূল্যবান চিঠির কাগজ, খাম টেবিলে রাখা আছে। আলমারী ড্রেসিং টেবিল বাথরুম অপূর্ব্ব। এদের দৈনিক একশত ডলারের ঘর না জানি কি—ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোর না হইতে টেলিফোনে জানাইয়া দিল, এয়ার পোর্টের লাইমুজিন আসিয়াছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নামিয়া গেলাম। উঠিবার আগে ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেলের খাটে লুঙ্গি ফতুয়া শোভিত মুর্ত্তি একবার আয়নায় দেখিয়া নিলাম। বাহিরে শীত যতই হউক, ঘরে সর্ব্বত্র এমন তাপ যে পাতলা একটা চাদরও গায়ে দিতে হয় না।

লাইমুজিন সোজা ছুটিল আইড্‌ল ওয়াইল্ড বিমান ঘাঁটিতে। সহরের বিমান ঘাঁটির দিকে গেল না। সেখানে নামিয়া এয়ার ইণ্ডিয়া কাউণ্টারে বলিলাম—আমার ব্যাগ পাবলিক লকারে রাখতে বলিয়াছে, তাহাই রাখিয়াছি, এখন উহার কি হইবে?

কাউণ্টারে ছিল এক আমেরিকান যুবক। সে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিয়া দিল। সকাল সাতটায় আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়া গিয়াছি। এতক্ষণে পাকা খবর মিলিল—প্লেন ছাড়িবে সকাল সাড়ে দশটায়। আটটার পর এয়ার ইণ্ডিয়ার এক মাদ্রাজী কর্ম্মচারীতে ট্যাক্সিতে আমার ব্যাগ নিয়া আসিলেন।

সাড়ে দশটায় প্লেন ছাড়িল। আবার আটলান্টিক অতিক্রম। নিউ ইয়র্কে মেলানো ঘড়িতে তখন বেলা দুইটা, আটলান্টিকে সূর্য্য ডুবিতেছে। এবার আমরা চলিয়াছি সূর্য্যের বিপরীত দিকে। বেলা আড়াইটায় অন্ধকার হইয়া গেল।

লণ্ডন পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। পোর্টে নামিয়া চা পান হইল। গভীর রাত্রে প্যারিস এবং জেনেভা পার হইল। দুজায়গাতেই প্রবল বৃষ্টি। এই সময়টা এয়ার হোস্টেস ছিল একটি ইংরেজ তরুণী। তাহাকে বলিলাম—একটু শোয়ার ব্যবরস্থা করিতে পার? তৎক্ষণাৎ তরুণীটি দুটি হাতল খুলিয়া ফেলিয়া বিছানা করিয়া দিল। মাথার বালিশ আগাইয়া দিয়া পায়ে কম্বল চাপা দিয়া গেল।

প্রত্যুষে কাইরো। এখানে আবার পোর্টে নিয়া গেল। এয়ার পোর্টের সংলগ্ন সৌখীন দ্রব্যের দোকান। দাম দেখিলাম খুব চড়া। আমেরিকায় যে জিনিষের দাম দেখিয়াছি দুই ডলার এখানে চাহিল আট ডলার। টেবিলে কয়েকটি পত্রিকা দেখিয়া ভাল লাগিল। চাহিয়া নিলাম। বোম্বাইয়ে প্লেন হইতে নামাইয়া সকলকে নিয়া গেল এয়ারপোর্টে। সেখানে ফেলিয়া রাখিল প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক। প্লেনে উঠিয়া দেখি সমস্ত কাগজপত্র ঝাঁটাইয়া বিদায় করিয়াছে। নামিবার সময় বলিয়াছিল সব ঠিক থাকিবে।

কলিকাতায় যখন নামিলাম তখন রাত্রি হইয়াছে। দুইটি ব্যাগের একটি নামিয়াছে, অন্যটি গিয়াছে টোকিও।